মরিচঝাঁপি

নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে

(গণহত্যার এক কালো ইতিহাস)

জগদীশচন্দ্র মণ্ডল

পরিবেশক

পিপলস্ বুক সোসাইটি

Marichjhapi : Naishabder Antarale
(Marichjhapi Beyond Silence)
by Jagadis Chandra Mandal
Price : Rupees One Hundred fifty only

কপিরাইট ঃ জগদীশচন্দ্র মণ্ডল

প্রকাশ কাল ঃ বইমেলা, ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ মনীন্দ্র গুপ্ত

প্রকাশনায় ঃ সুজন পাবলিকেশন,
৭বি, লেক প্লেস, কলকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রণে ঃ বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩১/১এ, নবীনচাঁদ বড়াল লেন,
কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন —২১৯-৬৮৩৮

পরিবেশক ঃ পিপলস্ বুক সোসাইটি,
১২সি, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা মাত্র।

স্মরণে

পুলিশের গুলিতে নিহত ও নিখোঁজ মরিচঝাঁপি ও বর্ধমান জেলার কাশীপুরে দণ্ডকারণ্য ত্যাগী উদ্বাস্তু।
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশচন্দ্র মণ্ডল
রাইহরণ বাড়ৈ
অরবিন্দ মিস্ত্রী
প্রয়াত রঙ্গলাল গোলদার
প্রয়াত সাংসদ শক্তি কুমার সরকার
প্রয়াত সন্তোষকুমার মল্লিক
প্রয়াত শৈবালকুমার গুপ্ত আই. সি. এস
প্রয়াত মণি দাশগুপ্ত
প্রয়াত সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষ
প্রয়াত সাংবাদিক অজিত কুমার চক্রবর্তী
প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেন
প্রয়াত রামশঙ্কর পাণ্ডে
বিপ্লবীযুগের অগ্নিকন্যা প্রয়াত বীণা ভৌমিক (দাশ)
প্রয়াত সুষমা মৈত্র (সরকার)
প্রয়াত শোভা গঙ্গোপাধ্যায় (জনতা পার্টির এই নেত্রী বর্ধমানের কাশীপুরে দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলি চালনার তদন্ত করতে গিয়েছিলেন),
শ্রীমতী কমলা বসু
সাংবাদিক জ্যোতিময় দত্ত
সাংবাদিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার, অমিত সর্বাধিকারী, কুমার মিত্র, প্রশান্ত হালদার, বিশ্বনাথ মুখার্জী, সুকোমল দাশগুপ্ত, হিমাংশু হালদার, নিরঞ্জন হালদার, সুজন পাবলিকেশন, পিপলস্ বুক সোসাইটি।

এই লেখকের অন্যান্য বই

১।	মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড)	১৫৲
২।	মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ (২য় খণ্ড)	২০৲
৩।	বঙ্গ ভঙ্গ	৩৲
৪।	রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও আম্বেদকর	৩০৲
৫।	মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবাসাহেব আম্বেদকব	৫০৲
৬।	Poona Pact and Depressed classes	150

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মুখবন্ধ	ক—জ
২।	লেখকের কথা	ঝ—এও
৩।	প্রথম অধ্যায়— পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সমস্যা	১-৮
৪।	দ্বিতীয় অধ্যায়—পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের একটি তথ্য চিত্র	৯—২১
৫।	তৃতীয় অধ্যায়—সরকারী ব্যাবস্থাপনা ও উদ্বাস্তু আন্দোলন	২২—৪৪
৬।	চতুর্থ অধ্যায়—উপেক্ষিত যারা	৪৫—৪৮
৭।	পঞ্চম অধ্যায়—উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে আগমন	৪৯—৫০
৮।	ষষ্ঠ অধ্যায়—মরিচঝাঁপি ও সি.পি.এমের রাজনীতি	৫১—৬৮
৯।	পরিশিষ্ঠ— (১) মরিচঝাঁপিতে অবরোধের সময় — কমলা বসু	৬৯—৭৬
	(২) পূর্ব্বভারত বাস্তহারা সংসদ	৭৭—৮২
	(৩) পার্লামেণ্টের তদন্ত কমিটির নিকট মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির স্মারকলিপি	৮৩—৮৮
	৩ (ক) স্মারকলিপির সংঙ্গে প্রদত্ত নথি	৮৯—৯০
	৩ (খ) ৩১ জানুয়ারী ১৯৭৯ পুলিশের গুলিতে ও অত্যাচারে নিহত ব্যক্তির নামের তালিকা	৯১—৯২
	৩ (গ)২৪জানুয়ারী অনাহারে মৃত ব্যাক্তিদের নাম	৯৩—৯৭
	৩ (ঘ) ২৪ জানুয়ারী অবরোধের পর হতে, অন্নাভাবে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এবং বিনা চিকিৎসায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের নাম	৯৮—১০৫
	৩ (ঙ) ২৪ জানুয়ারী থেকে মহিলাদের উপর ধর্ষণ এবং পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ সহ নামের তালিকা	১০৬
	৩ (চ) চার ধর্ষিতা মহিলার অভিযোগ	১০৭—১১০
	৩ (ছ) ৩১ জানুয়ারী থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের নামের তালিকা	১১১—১১৪

৩ (জ) ৩১ জানুয়ারী যে সকল ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে বসিরহাট ও আলিপুর জেলে আটক রয়েছেন তাঁদের নামের তালিকা ১১৫
৩ (ঝ) ৩১ জানুয়ারী হতে বিভিন্ন দিনে এবং বিভিন্ন জায়গা হতে জেলে আটক ব্যক্তিদের নামের তালিকা ১১৬—১১৯
৩ (ঞ) ২৪ জানুয়ারী হতে অবরোধের পর চাউল সংগ্রহে গিয়ে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নামের তালিকা ১২০
৩ (ট) জানুয়ারী থেকে ১১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নৌকা ছিনতাই ১২১—১২৫
৩ (ঠ) ২৪ জানুয়ারী থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ছিনতাইকারী মালপত্রের তালিকা ১২৬—১৩১
৩ (ড) উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সম্পাদকের প্রতিবেদন ১৩২—১৩৩
৩ (ঢ) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকারের মিথ্যা বক্তব্যের প্রতিবাদে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সম্পাদকের প্রতিবেদন ১৩৪—১৩৭
৩ (ণ) পুলিশ কর্তৃক মরিচঝাঁপির অবরুদ্ধ উদ্বাস্তুদের করুণ আবেদন ১৩৮—১৩৯
৩ (ত) পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের প্রতি মরিচঝাঁপির অসহায় বাঙালী উদ্বাস্তুদের করুন আবেদন ১৪০—১৪৩
৩ (থ) বিরোধী দলনেতা কাশীকান্ত মৈত্রের নিকট আবেদন ১৪৪—১৪৫
৩ (দ) প্রধানমন্ত্রীকে এম. পি. দের তদন্ত রিপোর্ট ১৪৬—১৪৮
৪। দুটি চিঠি—তারকুণ্ডে বনাম নিরঞ্জন হালদার ১৫৭—১৫৮
৫। দগ্ধ মরিচঝাঁপির অঙ্গার—সম্পাদকীয় দেশ ১৫৭—১৫৮
৬। দণ্ডকারণ্যের বঞ্চনার ইতিহাস—ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার ১৫৯—১৬২
৭। মানা ট্রানজিট ক্যাম্পে যা দেখেছি—অশোকা গুপ্ত ১৬৩—১৭২
৮। দেশে দেশে গণহত্যার বিচার চাই—অধ্যাপক সুজাত ভদ্র ১৭৩—১৭৯
৯। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু —শৈবাল কুমার গুপ্ত ১৮০—১৯২

মুখবন্ধ

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসেন সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে নিজেদের উদ্যোগে পুনর্বাসনের জন্য। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসার পর বামফ্রন্টের দুই নেতা অশোক ঘোষ ও রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চাটার্জি এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর সঙ্গে কথা বলেই এসেছিলেন। মরিচঝাঁপি দ্বীপ সুন্দরবনের কুমিরমারীর দক্ষিণে। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল, প্রস্থে ৮ মাইল। দুই নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার পর একটা ঘটনা ঘটে যায়। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতারা সি-পি-আই (এম)-এ যোগদান করতে বা তাদের সমিতিকে সি-পি-আই-এমের উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ-সি-আর-সি'র শাখা করতে অস্বীকার করেন। ফলে আগের পটভূমিকা বদলে যায়। ১৯৭৮ সালে মার্চ মাসে দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু হাসনাবাদ রেল স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করে। তারা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছালে বামফ্রন্ট সরকার তাদের রেল থেকে নামিয়ে দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ নেন। বর্ধমান জেলায় কাশীপুর ক্যাম্পে মারমুখী উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ৬ জন উদ্বাস্তু খুন হয় এবং টাঙ্গির আঘাতে একজন পুলিশ মারা যায়। হাসনাবাদ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের আটকে দেওয়া হয়। তাদের সেখান থেকে কীভাবে দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে, তার বিবরণ মিলবে শক্তি সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল দাশগুপ্তের লেখায়।

ঐ সময়ের সুন্দরবনের সাংসদ শক্তি সরকার লিখেছেনঃ "এই উদ্বাস্তুরা অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙ্গালী অধিবাসীদের মতো কলকাতার ফুটপাথ বা রেল স্টেশন দখল করতে চাননি, তাঁরা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েই সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না খেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে, জোর করে অনেক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠান"। বামফ্রন্ট নেতারা "ভারত সেবাশ্রম সংঘ", "রামকৃষ্ণ মিশন", "মাদার তেরেসা" "লুথারিয়ান চার্চ"— কাউকে সেবা কাজ করতে দেননি, এমন কী শিশু ও বৃদ্ধদের দুধও দিতে দেননি। ফলে হাসনাবাদে প্রায় দেড়হাজার শিশু ও বৃদ্ধ বিনা চিকিৎসায় মারা যান। (শক্তি সরকার ঃ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু, সুন্দরবনের উন্নতি এবং বামফ্রন্ট সরকার। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত "মরিচঝাঁপি" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত । পৃঃ ৫২-৫৩)।

"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুদের থামানো হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশকে বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া গিয়েছে। সেই রকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ স্টেশনে দেখি, যারা ফেরৎ ট্রেনে ওঠার জন্য সরকারী অফিসে লাইন দিয়েছে স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তিন-চার দিন খায়নি। তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে গেল।"—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরী কথা। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত "মরিচঝাঁপি"। পৃঃ ১৭)।

বিপ্লবী এবং পরে গান্ধীবাদী পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয় দণ্ডকে ফেরৎ পাঠানো উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে কীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায়, তা দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে একটি লেখা জমা দেন যুগান্তর পত্রিকায়। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই যুগান্তরে প্রথম কিস্তি ছাপা হওয়ার পর দ্বিতীয় কিস্তি আর বের হয়নি। এই বিষয়ে যুগান্তরের বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, "ফিরে যাওয়া উদ্বাস্তুদের অবস্থা দণ্ডকারণ্যের নানা অঞ্চল ঘুরে দেখে এসে পান্নালাল দাশগুপ্ত মশাই যুগান্তরে ছাপার জন্য এক দীর্ঘ রিপোর্ট দেন। আমি প্রথম পাতায় একাংশ ছাপিয়ে ঘোষণা করি, বাকীটা আগামীকাল প্রকাশিত হবে। কারও সমালোচনা নয়, কোন তিক্ত অভিযোগ হয়, পান্নাবাবু শুধু ওদের দুর্দশার কথাই বর্ণনা করেন তাঁর রিপোর্টে। কিন্তু প্রথম কিস্তি বেরোনো মাত্র সরকারী মহলে হৈ চৈ আরম্ভ হল এবং কী দুঃখের কথা, ঘোষণা করা সত্বেও পরের দিন দ্বিতীয় কিস্তি বের করা সম্ভব হল না। আমি এই অঘটনে ভীষণ বিষন্ন হয়ে পড়ি। (সংবাদের নেপথ্যে, ১৯৮১ পৃঃ ২২৮)

কী ছিল ঐ লেখায়?

"যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে (দণ্ডকারণ্যে) ফিরে আসছে, তাদের প্রায় সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুই-ই তাঁরা পথে পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছেন। তাঁদের শোক, দুঃখ বোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় বিবশ। ফেরৎগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২/৩ জন করে অফিসার পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারকি করার জন্য। তাঁদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত শিশুদের ও বৃদ্ধদের তাঁরা ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছেন, পরবর্তী কোনো স্টেশনে তাদের সদগতি করার অপেক্ষা রাখেনি।" —পান্নালাল দাশগুপ্ত, যুগান্তর, ২৫ জুলাই, ১৯৭৮।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল দাশগুপ্ত হাসনাবাদ থেকে দণ্ডকে ফেরৎ পাঠানোর বর্ণনা দিয়েছেন। উদ্বাস্তুরা যখন কলকাতার শহীদ ময়দানে সভা করতে

এসেছে, তখন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কাশী বিশ্বনাথ সেবা প্রতিষ্ঠানকে পানীয় জল দিতে দেওয়া হয়নি। এক তরুণ কবি সুশীল পাঁজা সেই ঘটনা ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতায় ঃ

জলের ভিতর থাকে জীবন
এসবই জেনে ফিরে গ্যাছে মরিচঝাঁপির
আশ্রয়হীন তৃষ্ণার্ত জনগণ
মনোহরদাস তড়াগের পানাভর্তি
জল ঘেঁটেছিল
উনিশ শো আটাত্তরের তিলোত্তমা শহর কলকাতায়।

মরিচঝাঁপিতে

সমস্ত সরকারী বাধা অতিক্রম করে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ৩০ হাজারের মতো নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ মরিচঝাঁপি দ্বীপে পৌছান। নিজেদের শ্রম ও সামর্থে তাঁরা ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত থাকতে পারেন। এই বইটির ৬ষ্ঠ অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে আছে মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার কাহিনী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যে ভাবে বন্দীদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছিল, সেইভাবে মরিচঝাঁপির মানুষদের মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে বড় বন্যার মধ্যেও ৬,৭,৮ সেপ্টেম্বর জ্যোতিবসুর সরকার পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে উদ্বাস্তুদের নৌকোগুলি ডুবিয়ে দেয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এটাকে নৌ-যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১সেপ্টেম্বর ১৯৭৮)। ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ব্লকেড করে পাশের দ্বীপ থেকে খাদ্য ও পানীয় জল আনা বন্ধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে ৩১ জানুয়ারি প্রথম গুলি চলে মরিচঝাঁপির লোকদের পানীয় জল নেওয়া বন্ধ করার জন্য। এই উদ্বাস্তুরা ছিল খুলনা, যশোর ও ফরিদপুর জেলার কৃষক। তাঁদের বেশীরভাগ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং একাংশ পৌন্ড্রক্ষত্রিয়। তাদের সাহসিকতা ও জেদ মরিচঝাঁপিকে সুন্দরবনে উন্নয়নের একটি মডেল হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। এঁদের পিছনে জনসমর্থন কম ছিল না। প্রয়াত সন্তোষ কুমার মল্লিক, শক্তি সরকার এবং শৈবাল গুপ্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পিছনে জনসমর্থন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। স্বৈরতান্ত্রিক মুখমন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ১৯৭৯ সালের মে মাসে গণহত্যার মাধ্যমে মরিচঝাঁপিকে উদ্বাস্তু শূন্য করেন। অমিত সর্বাধিকারির লেখায় গুলির হিসাবের কারসাজির বর্ণনা আছে। গণহত্যার পরে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের কতজন জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন, নিজের পরিচয় গোপন করে পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন, সে তথ্য কেউ রাখেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজি কমিশনের টাকায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তারাও জানার চেষ্টা করেননি।

হাসনাবাদ ও মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর সরকারী নৃশংসতার ঘটনা লোকে যাতে জানতে না পারে, সেজন্য সরকার এক দিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে কাজ করতে দেননি, মরিচঝাঁপিতে অপারেশনের সময় লঞ্চ পরিবহণ বন্ধ করে সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাদের কুমিরমারী দ্বীপেও যেতে দেননি, "বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের" ধুয়ো তুলে সাংবাদিকদের চাপের মুখে রেখেছেন এবং বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপনের টাকা আটকে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সংবাদপত্রে খবর ছাপতে দেননি। সরকার ১৯৭৮ সালের ৬,৭,৮ সেপ্টেম্বর অপারেশন করার জন্য সব লঞ্চগুলি নিয়ে নেন। উদ্বাস্তুদের উপর আক্রমণের আন্দাজ করে সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত, অজিত চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং এক ফটোগ্রাফার হাসনাবাদ থেকে একটি ছোটো নৌকোয় বিপজ্জনক রায়মঙ্গল নদী দিয়ে ৭সেপ্টেম্বর মরিচঝাঁপিতে পৌঁছান। বার্তা সম্পাদকের উপর নির্দেশ থাকায় যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকা ঐ নৌ-যুদ্ধের রিপোর্ট ছাপতে পারে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হওয়ায় লোকে ঐ ঘটনা জানতে পারে। ব্লকেডের সময় কোনো খবরই আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপে না, একমাত্র স্টেটসম্যান ও কালান্তরে নির্মম হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট বের হয়। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ঘরে আগুন দেওয়ার সময়ে লঞ্চ পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর ছাপা হয় কেবল আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান ও কালান্তর পত্রিকায়। এই বিষয়ে যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, "যুগান্তর মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশার কথা বিস্তারিত ছাপতে থাকে। জ্যোর্তিময় দত্ত এই ব্যাপারে একের পর এক টাটকা খবর দেয়। কিন্তু অনির্দেশ্য সেন্সরের চাপে রিপোর্ট ছাপা বন্ধ করে দিতে হয়। বহু প্রাণের বিনিময়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যান। (সংবাদের নেপথ্যে। পৃঃ ২২৮) একজন ফ্রিলাঞ্চ সাংবাদিকের রিপোর্ট না ছেপে তাঁকে ভাতে মারার চেষ্টার জন্য জ্যোতির্ময় দত্ত কলকাতা হাইকোর্টে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরেও জ্যোতির্ময় দত্তকে ভাতে মারার চেষ্টা হয়। জ্যোতির্ময় দত্ত বাবুঘাটের অদূরে গঙ্গাবক্ষে একটি নৌকোয় 'কনটিকি' নামে একটি রেষ্টুরেণ্ট করেছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে ঐ রেষ্টুরেণ্টের লাইসেন্স মেলেনি। পরে ঝড়ে কীভাবে নৌকাটি ডুবল, সেটাও এক রহস্য।

বিচারপতি ভি. এম. তারকুণ্ডের নেতৃত্বে সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসি এক প্রতিনিধি দল মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু খবর শুনেই ঐ প্রতিনিধিদলের মরিচঝাঁপি যাওয়ার কর্মসূচী বাতিল করার অনুরোধ জানান। শ্রী তারকুণ্ডে জ্যোতি বসুর চিঠির জবাবে প্রতিনিধি দলের আগমন স্থগিত রাখেন। (পরিশিষ্টে তারকুণ্ডে বনাম নিরঞ্জন হালদার দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৫৭)

কিন্তু প্রতিনিধি দলের আগমন পাকাপাকিভাবে বাতিল করার জন্য জ্যোতি বসু ৯মে দিল্লিতে শ্রীতারকুণ্ডের বাসায় গিয়ে হাজির হন। তারপরেই মরিচঝাঁপি অপারেশন শুরু হয়। দিল্লির প্রতিনিধি দল তদন্তের জন্য মরিচঝাঁপি পৌঁছতে না পারলেও সেটা সারা পৃথিবীর খবর হত।

কুমিরমারীর গ্রামবাসীরা বরাবর মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সমর্থন করত। ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি গুলি চালনার পর তাঁরাই বিক্ষোভ দেখান। আর এস. পি. র কর্মীদের শান্ত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আর-এস-পি-র মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী কমল গুহকে পাঠান। দুই মন্ত্রী শুনে এসেছিলেন মরিচঝাঁপির জবরদখলকারীরা তফসিলী বলে তাঁদের উপর এই ব্যবহার। এঁরা বর্ণহিন্দু হলে বামফ্রন্ট সরকার অন্যরকম ব্যবহার করতেন। যাই হোক পরে জ্যোতি বসু আর-এস-পি সম্পাদক মাখন পালের মাধ্যমে কুমিরমারীর দুই আর-এস-পি নেতা প্রদীপ বিশ্বাস ও প্রফুল্ল মণ্ডলকে মহাকরণে ডেকে এনে বলেন, ওদের মরিচঝাঁপিতে থাকতে দেওয়া হবে না। আপনারা পুলিশকে বাধা দেবেন না। ওঁরা জ্যোতিবসুকে বলেছিলেন, ওরা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছে। মরিচঝাঁপিতে থাকতে দেওয়া সম্ভব না হলে ওঁদের সুন্দরবনের কোনো দ্বীপে থাকতে দিন। প্রদীপ বাবু ও প্রফুল্লবাবু আমাকে একথা বলেছিলেন। মে মাসে, অপারেশনের সময় তাঁরা ক্যানিং-এ ছিলেন। লঞ্চ বন্ধ ছিল বলে গ্রামে ফিরে উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াতে পারেননি। সাংসদ শক্তি সরকারের ত্যাগও মনে রাখার মতো। মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের সমর্থন থেকে সরিয়ে আনার জন্য সি-পি-এমের এম. পি. জ্যোতির্ময় বসু একাধিকবার শক্তি সরকারকে বলেছেন, "শক্তি, সরকারী নীতির বিরোধিতা করলে তুমি আর এম. পি. হতে পারবে না।" শক্তি সরকার মরিচঝাঁপির মানুষদের কথা ভেবে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি। তিনি যে সত্যিই মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ আম্বেদকরের অনুসারী তার প্রমাণ রেখেছেন।

উদ্বাস্তুদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ জনতা পার্টি পুরো মদত দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে না যায়, সে জন্য দিল্লিতে সি-পি-এম খুবই সক্রিয় ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং সি-পি-এম, এম. পি জ্যোতির্ময় বসু বারবার বলার পর মোরারজী দেশাই বিশ্বাস করেন যে, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য ছেড়ে যাওয়া এবং মরিচঝাঁপির সংরক্ষিত বন নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। সি-পি-এম নেতা হরিকিষণ সিং সুরজিত, এম. এস. নাম্বদ্রিপাদ এবং পি. রামমূর্তি, জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে আশ্বস্ত হয়ে ফেরেন যে, তিনি রাজ্য জনতা দলের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

এত বছর পরে কেন?

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, হাসনাবাদ ও মরিচঝাঁপিতে দণ্ডক-ফেরৎ উদ্বাস্তুদের গণহত্যা হয়েছে ১৯৭৮ ও১৯৭৯ সালে, ২৩ বছর পরে হাসনাবাদ ও মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার ঘটনা নতুন করে জানানোর কী দরকার? গণহত্যার এই কালো ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা প্রয়োজন ইতিহাসকে পুরানো ও নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। বামফ্রন্ট সরকারের চাপে ঘটনাগুলি ঘটার সময়ে সংবাদপত্র কার্যত কিছুই ছাপতে পারেনি। গোটা মরিচঝাঁপি আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে, ৪ দিনে ৩০টি লঞ্চে করে অধিবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে রেখে, অনেককে গ্রেপ্তার করে, নেতাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে সরকার গণহত্যার কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে দেননি। ১৯৭৯ সালের ১৫ আগস্ট হাঁটু জলের মধ্যে আমি যখন নেতাজী নগরে যাই, তখনও মরিচঝাঁপি ঘিরে পুলিশ মোতায়েন। নেতাজী নগরে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা আমার গহণা উদ্ধার করতে পারলে অর্ধেক তাদের দেব, এই শর্তে পুলিশ আমাকে নেতাজী নগরে নিয়ে যায় এবং পরে কুমিরমারীতে নামিয়ে দেয়। স্বভাবতই আমি ছবিও তুলতে পারিনি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে না পারায় অ্যামনেস্টি ইণ্টারন্যাশানালকে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয়নি। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ মরিচঝাঁপিতে অপারেশানের আশঙ্কা করে, সযত্নে রক্ষার জন্য আমাকে একটি বাণ্ডিল দিয়ে যান। তাতে কী আছে, আমি খুলে দেখিনি, বহুবছর তিনি না আসায় উৎসুক্যবশত বাণ্ডিলটি খুলে আমি তাজ্জব বনে যাই। তার মধ্যে দণ্ডক ফেরৎ উদ্বাস্তুর উপর নৃশংসতার সব তথ্য রয়েছে। এই বইয়ের পরিশিষ্টে সেই তথ্যগুলি ছাপানো হয়েছে (পৃঃ ৮৩—১৪৮)।

দ্বিতীয়ত, তফসিলী সম্প্রদায়ের নিজস্ব নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের করুণ পরিণতিও উদ্বাস্তু আন্দোলনের একটি ইতিহাস। দুঃখের বিষয় ইতিহাসকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তারাও নমঃশুদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পরিচালিত এই আন্দোলনের ইতিহাসের রচনার কোনো চেষ্টা করেননি। বরং চিরদিনের মত এই ইতিহাসকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। UN High Commission for Refugees -এর টাকায় এক প্রাক্তন নকশাল নেতা ডঃ রণবীর সমাদ্দার তাঁর নিজস্ব সংগঠন Calcutta Research Group এর উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনার করেছিলেন। সম্প্রতি সেমিনারের পেপারগুলি নিয়ে ঐ সংগঠনের ডঃ প্রদীপ কুমার বসু সম্পাদিত Refugees in West Bengal নামে একটি বই ছাপা হয়েছে। এ বইতে সি-পি-আই (এম) পরিচালিত ইউ-সি-আর-সিকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন

হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু আন্দোলন ও গণহত্যা একটি পাদটীকায় স্থান পেয়েছে। ডঃ রণবীর সমাদ্দারের Marginal Nations নামে বইটিও উদ্বাস্তুদের নিয়ে। সেই বইটিতেও মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার কোনো উল্লেখ নেই। লেখক জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু আন্দোলনকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বইটি উদ্বাস্তু আন্দোলনেরও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বটে।

> *"১৯৬০ দশকের শেষার্ধে মিজোরামে "সৈন্য বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন" জারি হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী নাগরিকদের উপর যে অত্যাচার চালায় তা সুপ্রীম কোর্টের মামলায় শুধু যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাই নয়, প্রায় তিরিশ বছর বাদে মিজোরামের নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনের দায়ের করা মামলায় প্রথমে গৌহাটি হাইকোর্টে পরে সুপ্রীম কোর্ট ভারত সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩০ হাজার পরিবারকে মোট প্রায় ১৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ ২০.৩.৯৫ তারিখে দেন। ভারত সরকার ১৯৯৫ সালের ১৯মে সরকারী নির্দেশনামা (8/১/৯২-MZ) মারফৎ সেই অর্থ মঞ্জুর করেছেন।" —অধ্যাপক সুজাত ভদ্র। (পৃঃ ১৭৪)*

এত বছর পরে জ্যোতি বসুর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে অনুষ্ঠিত গণহত্যার বিবরণ প্রকাশের অন্য কারণও আছে। ১৯৭৫ সালে পাশ হয় UN Declaration of the Protection of All Persons from Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. এই ঘোষণা অনুসারে "responsbility is placed on the state to provide the machinery for complaints, trials and compensation." (Torture in Greece. The First Torturers Trial, 1975. Amnesty International) রাষ্ট্রপুঞ্জের ঐ ঘোষণার ৯ ধারায় বলা হয়েছে, "wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture as defined in article-1 has been committed, the competent authorities of the state concerned shall promptly proceed to an impartial investigation even if there has been no formal complain." (Torture in Greece. P.8) International Committee of the Red Cross এই জাতীয় গণহত্যার তদন্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ আদালতে জার্মান নাৎসীদের বিচার হয়। গ্রীসে সামরিক নেতাদের বিচারের জন্য অ্যামনেস্টি ইণ্টারন্যাশনাল 'ন্যুরেমবার্গ প্রিন্সিপলস' দুটি ধারা উধৃত করে। Nuremberg Principles দুটি ধারা হচ্ছেঃ Article 3. The fact that a person acted as Head of State or as responsible official does not relieve him of responsibility for committing any of the offences defined in this code.

Article 4 : The fact that a person charged with an offence defined in this code acted pursuant to an order of his government or of a superior does not relieve him of responsibility in international law, if in the circumstances at the time, it was possible for him not to comply with that order. (ঐ Torture in Greece, P. 5.)

> *"১৯৭৮ সালে খমের রুজ শাসনকালে কম্বোডিয়ার গণহত্যার জন্য পলপট এবং তাঁর সঙ্গীদের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল টমাস হ্যামারবার্গ নিজে কম্বোডিয়াতে গিয়ে গণহত্যার মামলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। কম্বোডিয়াতে আলোচনা চলছে যে, বিচার রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারালয়ে হবে, না কম্বোডিয়ার বিচারব্যবস্থায় হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মরিচঝাঁপিতে গণহত্যা হয়েছিল ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে"।*
> *—অধ্যাপক সুজাত ভদ্র। (পৃঃ-১৭৮)*

এই ধারাগুলি অনুসারে দেশে দেশে গণহত্যার বিচার হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে চিলিতে সামরিক বাহিনীর প্রধান পিনোশেত নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করে। তারপর ক্ষমতা ছাড়ার পর তার অপরাধের বিচার শুরু হয়। ইংলণ্ডের আদালতে এবং চিলিতে অসুস্থতার মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে তিনি স্পেনে ও চিলিতে অপরাধের বিচার এড়িয়ে যান। কাজেই এতদিন পরেও মরিচঝাঁপির হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের গণহত্যার বিচারের দাবি খুবই সঙ্গত হবে।

হাসনাবাদে সে সময়ে উদ্বাস্তুদের খেতে না দিয়ে তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেই সময়ে হাসনাবাদ লঞ্চ ইউনিয়নের সম্পাদক সি-পি-আই কর্মী আমার মেজদা প্রশান্ত হালদার পরিস্থিতি বর্ণনা করে আমাকে এক হৃদয়-বিদারক চিঠি লেখেন। কম্যুনিস্ট কর্মী হিসাবে তিনি একদা খুলনা ও যশোহর জেলার যে সব নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাষীদের মধ্যে আন্দোলন করেছিলেন। তাদের অনেকেই মরিচঝাঁপিতে বাসিন্দা হয়েছেন। তিনি নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করেছেন। জগদীশ মণ্ডল আমাকে লেখা ঐ চিঠিটি পড়ে ঐ দিন থেকে মরিচঝাঁপি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, প্রয়াত সন্তোষ কুমার মল্লিক ও প্রয়াত শক্তি সরকারের অনুগামী হয়ে কাজ করেছেন। তিনি এই বইটি লিখে গণহত্যার কালো ইতিহাস হারিয়ে যেতে দেন নি। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

২০ জানুয়ারি, ২০০২

নিরঞ্জন হালদার
(আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত সহ-সম্পাদক
এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের
ভারতীয় শাখার প্রাক্তন সম্পাদক।)

আমার কথা

মরিচঝাঁপি সুন্দরবনের একটি দ্বীপ। চারিদিকে নদী। দণ্ডকারণ্য ছেড়ে আসা ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে এই দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। ভারত সরকার কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন দিতে পারেননি। অথচ ঐ উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যোগে মরিচঝাঁপিতে নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রয়াত শক্তি সরকারের বক্তব্য অনুসারে মরিচঝাঁপি পশ্চিমবঙ্গে স্ব-নির্ভর গ্রামোন্নয়নের একটি আদর্শ হতে পারত। কিন্তু এই সি. পি. এম. পরিচালিত সরকার দণ্ডক প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে তাড়ানোর জন্য ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে একমাত্র হিটলারের জার্মানিতে ইহুদী নিধন এবং ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বাংলাদেশে তথা পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যার সঙ্গে। ঐ দুটির গণহত্যার সঙ্গে মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে। অন্য দুটি ক্ষেত্রে প্রাণ-বাঁচানোর কোনো সুযোগই ছিলনা। সি. পি. এম. মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে রাজী হলে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি দ্বীপে অমনভাবে মরতে হত না, ধর্ষিতা হতে হত না।

এই বইটির বিভিন্ন অধ্যায় পরিশিষ্টগুলির মাধ্যমে মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার ইতিহাস, এই প্রথম বাঙ্গালী পাঠকেরা পড়ার সুযোগ পাবেন। অন্য দেশে গণহত্যার জন্য সরকারের প্রধানের আদালতে বিচার হয় বা বিচারের চেষ্টা হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের হাতে এমন তথ্য জানা ছিল না, যে তথ্য ব্যবহার করে তারা মরিচঝাঁপিতে গণহত্যার বিচার চাইতে পারেন। গণহত্যার বিচারে অন্যায়ভাবে মানবতা বিরোধী হুকুম পালনের জন্য অধঃস্তন সামরিক ও পুলিশ অফিসারের শাস্তি হয়। ভারতের বিচারব্যবস্থাও অপরাধীদের এই জাতীয় শাস্তি দিয়েছে। বইটিতে অপরাধী পুলিশ অফিসারদের নাম সাংবাদিকের লেখায় ছড়িয়ে আছে। মরিচঝাঁপিতে তিন সংসদের নিকট উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির স্মারকলিপি এবং গণহত্যা বিচারের আদালত সম্পর্কে অধ্যাপক সুজাত ভদ্রের প্রবন্ধটি ভারতে মানব অধিকার আন্দোলনে নতুন দিগন্ত প্রসারিত করতে পারে।

মরিচঝাঁপিতে আন্দোলনের সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা বের হয়, ছাপা হয় অনেক পুস্তিকা। সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারও "মরিচঝাঁপি" নামে একটি পুস্তিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭৯ সালের ৬ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মরিচঝাঁপি অপারেশনের তোড়জোড় শুরু হলে, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ তিন সংসদকে দেওয়া স্মারকলিপির একটি করে কপি প্রয়াত শক্তি সরকার ও নিরঞ্জন হালদারের নিকট রেখে যান। শ্রীহালদার স্মারকলিপিতে প্রদত্ত

তথ্যের ভিত্তিতে একটি বই লেখার বাসনা দীর্ঘদিন পোষণ করছিলেন। তিনি নানা কারণে লিখতে না পারায় আমাকে সব কাগজপত্র দেন উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে একটি বই লেখার জন্য। তারই ফলশ্রুতি এই বই। মরিচঝাঁপিতে সি. এফ. ডি.-র তদন্ত মিশন আসা বন্ধের ব্যাপারে জ্যোতি বসুর চক্রান্তের বিবরণ মিলবে ভি. এম. তারকুণ্ডে ও নিরঞ্জন হালদারের মধ্যে বিনিময়ে হওয়া দুটি পত্রের মধ্যে। এই দুটি চিঠি পরিশিষ্টে ছাপা হল। এই বইটি লেখার ব্যাপারে তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর সাহায্যকে আমি ছোট করতে চাই না।

একদা "যুগান্তর" বিপ্লবী গোষ্ঠীর কর্মী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলা বসু দুইবার মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলনে। একবার ব্লকেডের সময় অগ্নিকন্যা বীনা দাশের সঙ্গে। আর একবার পার্লামেণ্ট সদস্যদের সঙ্গে। ব্লকেডের সময় মরিচঝাঁপিতে যাওয়ার ঘটনা জানিয়ে তিনি সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে সেই চিঠি এই বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা হল। এজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত ভারতের নারী আন্দোলনের একটি স্তম্ভ। তিনি "অল-ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্সের" সভানেত্রীও ছিলেন। নকশালপন্থা দমনের নামে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশী সন্ত্রাসের বিবরণ সংগ্রহের জন্য অ্যামনেস্টি ইণ্টারন্যাশনালের জেনারেল সেক্রেটারি মার্টিন অ্যানালস কলকাতা এলে পুলিশের নজর এড়ানোর জন্য তিনি শৈবাল গুপ্ত —অশোকা গুপ্তর বাড়িতে ছিলেন। শ্রীশৈবাল গুপ্ত যে সময়ে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষতের চেয়ারম্যান, সেই সময়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে যান এবং তাঁরই উদ্যোগে দণ্ডকারণ্যে মেয়েদের শিক্ষার জন্য হাইস্কুল তৈরি হয়েছিল। তিনি মানা ট্রানজিট ক্যাম্প সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেই লেখাটি পরিশিষ্টে ছাপতে দেওয়ার জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (APDR) প্রাক্তন সম্পাদক ও মানব অধিকার আন্দোলনের এক নেতা অধ্যাপক সুজাত ভদ্র বিভিন্ন দেশে গণহত্যার অপরাধীদের বিচারের ঘটনা বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে ছাপা হল। এই অনুমতি দানের জন্য অধ্যাপক ভদ্রকে ধন্যবাদ।

এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমার পরিবারের সকলে আমাকে নানাভাবে সাহায্য না করলে বইটি লেখাই হত না।

এই প্রসঙ্গে বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দেওয়ার জন্য কবি মণীন্দ্র গুপ্ত, মুদ্রণে বিভূতি প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের শ্রীঅশোক কুমার রায় ও তার সহকর্মীগণ, প্রকাশক এবং পরিবেশককে আমার ধন্যবাদ।

জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল
গড়িয়া, ২৪ পরগণা (দঃ)

জানুয়ারি ১০, ২০০২

প্রথম অধ্যায়

পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকার গঠিত হলে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো পূর্ববঙ্গের তফসিলী সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তাঁরা দণ্ডকারেণ্যের মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও অন্ধ্রের বিভিন্ন জেলা এবং মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর ও গাড়চিরোলী জেলা থেকে হাসনাবাদ রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন দণ্ডকারণ্যের পাথুরে মাটিতে পুনর্বাসনের নামে জায়গা-পাওয়া উদ্বাস্তু। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এঁরা একবার পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সরকার ঐ সকল উদ্বাস্তুদের হাওড়া পর্যন্ত আসতে দেননি। দুর্গাপুর, বর্ধমান প্রভৃতি স্টেশনে পুলিশ দিয়ে তাঁদের রেলের কামরা থেকে নামিয়ে দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবাদে ১৯৭৫ সালের ২১ জুন কলকাতায় সি.পি. আই (এম) এর পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের অফিসে জ্যোতিবসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস-বিরোধী নেতাদের এক সভা হয়। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, "রাজ্যের বিরোধী নেতারা বিভিন্ন রাজ্যের এম. পি. দের নিয়ে চলতি মাসের শেষে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীখাদিলকরের কাছে এক ডেপুটেশনে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন ত্রিদিব চৌধুরী, জ্যোতি বসু, জ্যোতির্ময় বসু, ডঃ কানাই ভট্টাচার্য, ফরোয়ার্ড ব্লকের মহারাষ্ট্রের এম.পি. ধাতে, যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ।" এই প্রতিনিধি দল দাবি করবেন যে, "এখনও পূর্ববঙ্গাগত যে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি, তাদের পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।" (আন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জুন, ১৯৭৫।) ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে অভ্যন্তরীণ জুরুরি ব্যবস্থা জারি করায় উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়।

মরিচঝাঁপি দ্বীপের ঘটনা হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি, ঐ ঘটনা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের এক করুণ পরিণতি। মরিচঝাঁপির ঘটনা বুঝতে হলে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার এবং সেই সব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এবং উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের ইতিহাসও জানা দরকার। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যা ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হচ্ছে।

ভিটেমাটি থেকে সরকার বা অপর কেউ উৎখাত করলে আমরা তাকে উদ্বাস্তু বলে থাকি। লেখিকা অরুন্ধতী রায় তাঁর "দি গ্রেটার কমনগুড" বইতে ভারতের যোজনা কমিশনের সেক্রেটারি এন. সি. সাকসেনার একটি বক্তৃতার একটি তথ্য উল্লেখ করেছেন। মিঃ সাকসেনার মতে, স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রকল্প ও শহরী করণের জন্য মোট পাঁচ কোটি মানুষ উৎখাত হয়েছেন। (চার কোটি উৎখাত হয়েছেন ড্যামের জন্য)। (Arundhati Roy : The Greater Common good. P. 10) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফুইজি কমিশনারের মতে এখন সারা পৃথিবীতে দুই ধরণের উদ্বাস্তু আছে। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু এবং দেশ থেকে পালিয়ে ভিন্ন দেশে যাওয়া উদ্বাস্তু। সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দাঙ্গার বা দেশে রাজনৈতিক ওলটপালটের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যেমন, ভিয়েৎনাম ও লাওসে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ঐ দুই দেশের নাগরিকরা দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কম্বোডিয়াতে কম্যুনিস্ট খমেররুজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে লক্ষ লক্ষ নাগরিক দেশ থেকে পালিয়ে থাইল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। খমেররুজ শাসনের অবসানের পর কম্বোডিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে, থাইল্যাণ্ড থেকে কম্বোডিয়ান উদ্বাস্তুরা স্বদেশে ফিরে যান। ব্রহ্মদেশে সামরিক একনায়কত্ব শাসনে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ফলে ব্রহ্মদেশের পূর্বাঞ্চলের দেশত্যাগীরা থাইল্যাণ্ডে এবং পশ্চিমাঞ্চলের আরাকানের অধিবাসীরা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজী কমিশনার ও অন্যান্য বিদেশী সংস্থা এদের দেখাশোনার ভার নিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে একদিন এই সব ব্রহ্মদেশীয় উদ্বাস্তু দেশে ফিরে যাবেন। পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুরা দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী আরব দেশগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজী কমিশন এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পড়াশুনার জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে। এখানেও সকলেরই আশা, এই সকল উদ্বাস্তু একদিন স্বাধীন প্যালেষ্টাইনে ফিরে যাবেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট অবিভক্ত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়। তার বদলে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরিণতি হিসাবে এক দেশ থেকে আর এক দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু স্রোত শুরু হয়। অন্যান্য দেশের উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন। এই উদ্বাস্তুদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর কথা ভাবা হয়নি। এঁদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিদেশ থেকে কোন টাকা বা অন্যান্য সাহায্য আসেনি। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দিখণ্ডিত করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ আলি জিন্না মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে তাঁদের জন্য ভারতের মুসলমান প্রধান

অঞ্চলে ইসলামিক রাষ্ট্রগঠনে সচেষ্ট হন। ১৯৪৬ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের পরে পাঞ্জাবে কংগ্রেস, ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও আকালীদলের কোয়ালিশন সরকার গঠনের বিরুদ্ধে পঞ্জাবে ব্যাপক দাঙ্গা হয়। তারপর ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট পাকিস্তানের দাবিতে অবিভক্ত বাঙ্গলার কলকাতা সহ অপরাপর স্থানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কলকাতায় প্রথমে দুদিন দাঙ্গার পর হিন্দুরাও প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। তার প্রতিবাদে নোয়াখালিতে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুঠ, গৃহদাহ এবং অনেক মেয়েকে লুণ্ঠন করে নেওয়ার পর হিন্দুরা গ্রামাঞ্চলে থেকে পালিয়ে শহরে চলে আসে। তাদের অনেকে কলকাতা পর্যন্ত চলে আসে। নোয়াখালিতে দাঙ্গার প্রতিবাদে বিহারে মুসলমান-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গাকারীদের নিবৃত্ত করতে গিয়ে ভারতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ পাটনায় হিন্দু ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হন। প্রধানমন্ত্রী বিমান থেকে বোমাবর্ষণের ভয় দেখিয়েও দাঙ্গাকারীদের নিরস্ত করতে পারেননি। কলকাতা, নোয়াখালি এবং বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সারাদেশে তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অবসানের আশায় কংগ্রেস ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেয়। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীন পাকিস্তানের এবং ১৫ আগষ্ট স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের মধ্যে সন্ত্রাসজনিত ভীতির সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের পশ্চিমদিকে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বদিকে পূর্বপাকিস্তান হওয়ায় ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভারতে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়। পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের নিরপত্তার কোন উদ্যোগ নেয়নি। ভারতের নানা স্থানেও মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। তবে ভারতে সরকারের তরফে এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু একদিন পুরানো দিল্লিতে জীপ থেকে লাফ দিয়ে দাঙ্গাকারীদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের নিরস্ত করার জন্য। গান্ধীজী বিহার, কলকাতা, দিল্লি হয়ে পাঞ্জাবেও দাঙ্গা বন্ধ করতে সক্রিয় ছিলেন।

পাঞ্জাবে বিপুল সংখ্যক দাঙ্গাকারীদের ঘরে ফিরিয়ে দিতে সমর্থ হওয়ায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঐ ঘটনার জন্য গান্ধীজীকে "ওয়ান ম্যান ব্যাটিলিয়ন" আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে শহরের উপর শহর এবং গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও শিখদের বাড়ী লুঠ ও আগুন লাগানো, খুন, নারী হরণ প্রভৃতি ঘটনা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে ঐ দেশে কোন সরকারের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়নি। পাকিস্তান সরকার ট্রেনে করে হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের ভারতে পাঠাতে থাকেন এবং ঐ সকল উদ্বাস্তুরা ভারতে এসেই এ দেশের মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করে। মুসলমানদের ঘরে আগুন দেওয়া ও খুন খারাপি আরম্ভ হয়। ফলে ভারত থেকেও মুসলমান উদ্বাস্তু স্রোত পাকিস্তানে যেতে থাকে। পাকিস্তানগামী ট্রেনে তাঁদের

উপর হিন্দুরাও আক্রমণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সরকারের শাসনাধীন এই প্রকার বর্বর ও নারকীয় ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়না। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর ঘটনা এবং ঐ দেশ থেকে আগত হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের করুণ কাহিনী এত ছড়িয়ে পড়ে যে, ভারত সরকার প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দিকে নজর দিতে বাধ্য হন। ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় ফরিদাবাদ সমেত বিভিন্ন রাজ্যে তাঁদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় এবং সর্বত্র মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তখন ভারতীয় সেনা বাহিনীতে পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখদেরই আধিপত্য ছিল। সেই জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কায় তাদের দ্রুত পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বর্বরতার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঐ ভাবে কোন উদ্বাস্তু স্রোত ভারতে আসেনি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোত বারবার ভারতে আসে এবং পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার পরেও সেই ধারা ক্ষীণ হলেও আজও অব্যাহত। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুরা ভারতে আসতে বাধ্য হয় একাধিক কারণে এবং ধাপে ধাপে। তাঁরা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে এলেও একটা বিরাট অংশ ত্রিপুরা, অবিভক্ত আসাম ও অরুণাচলে গিয়ে আশ্রয় নেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দুই দেশেই উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই দেশের নেতারা কখনই এই সমস্যাটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। এই প্রসঙ্গে অবিভক্ত বাঙ্গলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দির ভারতের মুসলিম লীগের সভাপতি চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে লেখা একটা চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। শহীদ সোহরাওয়ার্দি লেখেন—"তাঁরা আশা করেছিলেন যে, দুই দেশে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘুর উপস্থিতি প্রতিবেশী দেশের শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।" তারপর তিনি লেখেন যে, "এই হোসটেজ থিয়োরি" ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। মুসলমানদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে বসবাসে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় (Choudhury Khaliquzzaman : The Pathway to Pakistan. Appendix-1) অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে মুসলিমদের সংখ্যালঘু হওয়ার সমস্যা তাঁরা আগে বিবেচনাই করেন নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পূর্ব পাকিস্থানের মুসলিম লীগ সরকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমস্যা বিবেচনা করতে রাজী হননি। ফলে হিন্দুদের পূর্ব পকিস্তান থেকে ভারতে আসা বন্ধ করার কোন উদ্যোগই সরকার নেননি।

যাইহোক ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট, পাকিস্তান গণপরিষদে গভর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নার বক্তৃতার প্রকৃত তাৎপর্য ভারতের উদারপন্থীরা বুঝতে পারেননি। মিঃ জিন্না বলেছিলেন," আজ থেকে পাকিস্তানে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান থাকবে না। সকলেই হবে পাকিস্তানী"। যিনি সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য রক্তপাতের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের বিশেষ অধিকার স্বীকার করতে রাজী হননি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ প্রতিরোধে তৎপর হলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন দিন পরেই গভর্ণর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন, বিধানসভাও বাতিল করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন মুসলিম লীগ নেতা আবদুল কোয়ায়ুম খানকে। (Dr. Aeysha Jalal : the State of Martial Rule. [Cambridge Univeresity Press. P. 43]) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু হয় হিন্দু শিখদের বাড়ি লুণ্ঠন, বাড়িতে আগুন দেওয়া এবং খুন। একই ধরণের অমানুষিকতা শুরু হয় ভারতেও। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ফলে কলকাতায় মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা একদিনেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তানে কী হয়েছিল ডঃ আয়েশা জালাল তা বর্ণনা করেছেন। "In the North Western provinces, marauding tribesmen from the surrounding areas had interpreted the departure of white rulers as a clarion call for looting and murdering non-Muslins with impunity" :

১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান ও পাঞ্জাব, দিল্লি-উত্তর প্রদেশের মধ্যে যথাক্রমে ৬০ লক্ষ করে লোক বিনিময় হয়ে যায়। এই সময়কার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৫ লক্ষ লোকের জীবন হানি হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৪৮ সালের পর ৪০ লক্ষ লোক চলে আসার পরেও ১ কোটি সংখ্যালঘু থেকে যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যালঘুর সংখ্যা হলো ৫ কোটি। যে কোনও দেশের সংখ্যালঘু সংক্রান্ত ঘটনাবলীই অপর দেশে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বহন করে বলেই দুই দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এবারে এই দুটি চুক্তির প্রতি একটু লক্ষ্য করা যাক।

১৯৪৮ সালে উভয় দেশের মধ্যে বেদনাদায়ক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিরসনের জন্য ৬ থেকে ১৪ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক আন্তঃ ডোমিনিয়ন সভা বসে। সেখানে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সংখ্যালঘুদের স্বদেশ পরিত্যাগের হিড়িক বন্ধ করাই ছিল এই চুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। প্রথম দুটি অধ্যায় ভারতে ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন নীতি ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক আনুগত্য নিজস্ব রাষ্ট্রের প্রতি বলে ঘোষণা করা হয়। দুই দেশেই প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার সুযোগ ও দায়িত্ব দেওয়া হবে বলা হয়

এবং সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। সকল প্রকার উত্তেজনামূলক প্রচার এবং ভারত ও পাকিস্তানের সংযুক্তি করণের প্রস্তাবকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে স্থির হয়। উভয়বঙ্গের জন্য ১৯৪৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটি করে প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ড ও তার অধীনে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করে জেলা সংখ্যালঘু বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব হয়। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাঁদের মনে বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠাই এই বোর্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। এদের দুর্দশার প্রতি সরকারের সত্বর দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিবিধান করা এই বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য হবে। প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ডের সভাপতি হবেন একজন মন্ত্রী ও জেলা সংখ্যালঘু বোর্ডের সভাপতি হবেন জেলা শাসক। এই বোর্ডের ৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন হবেন প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এদের নির্বাচন করবেন প্রাদেশিক আইন সভার ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যবর্গ। বাকি ২ জনকে মনোনয়ন করবেন প্রাদেশিক সরকার। উভয়বঙ্গে উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য একটি প্রাদেশিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পূর্বপাকিস্তান সরকারের দুই মুখ্যসচিব মাসে একবার করে ও প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ২ মাসে একবার করে মিলিত হয়ে চুক্তিপত্রের প্রয়োগ ব্যবস্থার উপর তত্ত্বাবধান করবেন। এই প্রয়োগ ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য একটি করে কেন্দ্রীয় তদারক সংস্থা গঠিত হবে বলে স্থির হয়। প্রয়োগের অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যায়ে একবার দিল্লিতে এবং পরের বারে করাচীতে। (দি স্টেটসম্যান, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৮।) সমসাময়িক কালে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি পত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলায় এই চুক্তির ফলে সাময়িক ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাবে লোক বিনিময় বন্ধ হয়নি।

১৯৪৮ সালের চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালে আবার পূর্ব পাকিস্তানে নতুন করে সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয় এবং তার অশুভ প্রতিক্রিয়াও পশ্চিম বাংলায় দেখা দেয়। নতুন দাঙ্গার ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে নতুন করে চিন্তা করতে হয়। এই পরিবেশে দিল্লিতে নেহরু লিয়াকৎ আলি সাক্ষাৎকার হয় ২ এপ্রিল ১৯৫০ এবং উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৮ এপ্রিল ১৯৫০ যা ''নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি'' নামে খ্যাত। (দি স্টেটসম্যান, ৯ এপ্রিল ১৯৫০) এই চুক্তিপত্রে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং এই সমস্যাটি অন্ততঃ দুই দেশের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক বিষয় বলে আবার গণ্য হয়। আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তির ধারা অনুসারে এখানেও বলা হয় যে, সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক আনুগত্য নিজস্ব রাষ্ট্রের প্রতি এবং তাঁদের দুর্দশার

প্রতিবিধানও সেখানেই চাওয়া উচিৎ। যাই হোক এই চুক্তির ফলে সংখ্যালঘুদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের চিরাচরিত আন্তর্জাতিক আইনগত অধিকার নতুন করে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান পরিত্যাগ করলেন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিপত্রে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার নিয়ে কয়েকটি নীতি গৃহীত হয়। সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন, ব্যক্তিগত মর্যাদা, সম্পত্তি, সংস্কৃতি, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধর্মীয় ও বাক্ স্বাধীনতা দিতে দুটি রাষ্ট্রই সম্মত হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেব সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে ঘোষণা করা হয়। চুক্তিপত্রে ভারতীয় সংবিধান (১৯৫০) ও পাকিস্তানের প্রস্তাবিত সংবিধানের উদ্দেশ্যবলী সংক্রান্ত নীতি বিন্যাস (১৯৪৯) সংখ্যালঘুদের যে বিশেষ পদমর্যাদার কথা বলা হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়।

এই চুক্তিতে দাঙ্গার ফলে উদ্বাস্তুদের নিজের দেশ পরিত্যাগের অধিকারকে সহজ করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। দাঙ্গা প্রতিরোধের এবং আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ পথ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। বলপ্রয়োগ দ্বারা ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে ধর্মান্তর অগ্রাহ্য করা হবে বলে স্থির হয়। সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টিকারী অথবা যুদ্ধের প্ররোচনামূলক সকল প্রকার প্রচারকার্যকে বে-আইনী ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়।

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য উপদ্রুত এলাকায় উভয়রাষ্ট্রের দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-যতদিন প্রয়োজন থাকবেন। পূর্ব পাকিস্তানে, আসামে ও পশ্চিম বাংলায় যতশীঘ্র সম্ভব একজন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়। এই তিন এলাকার জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের প্রস্তাবও করা হয়। এই কমিশনের সভাপতি হবেন একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং অপর দু'জন সদস্য গ্রহণ করা হবে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে কোনও কমিশনের সভায় যোগ দিতে পারবেন। এই সংখ্যালঘু কমিশনই চুক্তির যাবতীয় প্রয়োগ-পদ্ধতির উপর নজর রাখবেন। প্রয়োগ-পদ্ধতির উন্নতির জন্য এই কমিশনগুলির প্রস্তাব পেশ করার অধিকার থাকবে। এই সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের কাছে এবং একই সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয়ের কাছে বিবরণী পেশ করবে। ভারত ও পাকিস্তান সরকার এই প্রস্তাবগুলিকে সাধারণ ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে মত-বিরোধ হলে সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের নিকট বিষয়টি পেশ করা হবে।

জেলা ও সদরের সংখ্যালঘুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা সংখ্যালঘু কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হবে। এই যোগাযোগের মূলসূত্র হবে ১৯৪৮ সালের চুক্তির ধারা অনুসারে গঠিত সংখ্যালঘু বোর্ড। নতুন সংখ্যালঘু কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৮ সালে গঠিত প্রাদেশিক সংখ্যালঘু বোর্ডকে প্রতিস্থাপন করবে। ত্রিপুরার জন্য দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

চুক্তিপত্রের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে বলা হলো যে, যে সব বিষয়ে আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তিপত্রটি সংশোধিত হয়নি সেই সব বিষয়ে আন্তঃ ডোমিনিয়ন চুক্তি বলবৎ থাকবে।

১৯৫০ সালের চুক্তিটি সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার রক্ষার একটি ব্যাপকতম প্রয়াস। যদিও এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সমসাময়িক দুর্ঘটনার প্রাবল্য থেকে মুক্তি লাভ এবং উদ্বাস্তুদের যথাসম্ভব সাহায্য প্রদান। এই চুক্তিটির যথাযথ প্রয়োগ সংখ্যালঘু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে এ আশাও বিলীন হয়ে যায়।

পাকিস্তানের গৃহীত সংবিধানে ও সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণের পর সংখ্যালঘুদের মধ্যে নতুন এক ত্রাস শুরু হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রায় সরকারী নীতিতে পরিণত হয়।

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামিক সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তারিখের দ্বিতীয় সংবিধানে শুধুমাত্র "সাধারণতন্ত্র" কথাটি ব্যবহৃত হলেও একই ধারা সংরক্ষণ করা হয়। একমাত্র ইসলাম ধর্মীয় সংজ্ঞায় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায় এখানে চালু থাকবে। সুতরাং সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি মুখবন্ধে দেওয়া আছে, সেটি কী পরিমাণে ফলপ্রসূ হবে বলা যায় না। একমাত্র মুসলমানই রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে যে অনুচ্ছেদ গৃহীত হয়েছে অন্ততঃ সেটি সংখ্যালঘুদের পূর্ণাঙ্গ সাম্যের অধিকারের বিরোধী। যদিও ইসলাম ধর্মকে সাম্যের প্রতীক হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। তবুও পাকিস্তানের শতকরা ৮৬ ভাগ মুসলমানের সাথে সংখ্যালঘুদের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হলে, তার বিচার ও প্রতিবিধানের জন্য যতদিন না সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকে, ততদিন ধরে নিতেই হবে যে অ-মুসলমান নাগরিকদের সাম্যের অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের সংবিধানে সংখ্যালঘু নাগরিকবৃন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এই পর্যায়েও আন্তঃ ডোমিনিয়ান চুক্তি ও নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির মূলনীতি আইনগতভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর বাতিল করে দেওয়া হয়। তার দুই সপ্তাহের মধ্যে আয়ুবশাহী সামরিকতন্ত্র চালু হয়। এই সময়ে জনসাধারণের অধিকার প্রয়োগের কোনও প্রশ্নই আর ওঠে না। সুতরাং সংখ্যালঘুদের বিশেষ মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নও অবান্তর হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বই পরিচালিত গণতন্ত্রের (গাইডেড ডেমোক্র্যাসি) নামে ১৯৬২ সালের সংবিধানে ফ্রান্সের নতুন সংবিধানের তুলনায় শতগুণে বেশী রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত স্বৈরাতন্ত্র প্রবর্তন করে।

পাকিস্তানের সংবিধান ও সামরিকতন্ত্র ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালের সংখ্যালঘু চুক্তি বিরোধী। আবার কাশ্মীর গ্রাসের চক্রান্তে হতাশা থেকে মুক্তির আশায় ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নতুন করে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা শুরু হয়। এটাও ছিল চুক্তির বিরোধী।

(রাষ্ট্র বিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র। তৃতীয়বর্ষ-তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক -পৌষ, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০-পৃঃ ১৩৫)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের একটি তথ্য চিত্র

সাম্প্রদায়িক অশান্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য উপমহাদেশকে ভাগ করে স্বাধীনতা আনা হয়। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসেও আমরা দেখতে পাই, পাকিস্তান সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধদের সেই শান্তি দেয়নি।

১৯৪৭ সাল থেকে আজ ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একমাত্র পূর্ব পাকিস্তান থেকেই ৪২ লক্ষেরও বেশী মানুষ সরকারীভাবে উদ্বাস্তু নাম লিখিয়ে পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় চলে আসেন। ১৯৬৪ সালের তথ্য অনুসারে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে আরও কমপক্ষে দুই লক্ষাধিক নতুন উদ্বাস্তু ভারতে আসেন। এই জনস্রোত বন্ধ হয়নি। এখনও হাঁটাপথে, গোপনে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু চলে আসছেন ভারতে।

পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের ঐতিহাসিক তথ্য এখানে পরিবেশন করা হল।

১) পাকিস্তান আদায় করার জন্য মুসলিমলীগ ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে (Direct Action) কলকাতায় হিন্দু নিধন আরম্ভ করে। দুইদিন হিন্দু বিরোধী দাঙ্গারপর হিন্দুরাও পাল্টা আঘাত শুরু করে। তারপর মুসলিম লীগের গুন্ডারা নোয়াখালিতে একতরফা ভাবে প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করে (সরকারী হিসাবে)। গুন্ডারা গ্রামবাসীদের ধরে গো-হত্যা করিয়ে সেই মাংস তাদের খেতে বাধ্য করে। ঘরে আগুন দেওয়ায় কয়েকশো মানুষ পুড়ে মরে। বহু মেয়েকে জোর করে বিয়ে করে অথবা নিয়ে পালিয়ে যায়। ফলে হাজার হাজার উৎপীড়িত সংখ্যালঘু হিন্দু ভারতে আসতে থাকেন। শুরু হয় প্রথম উদ্বাস্তু স্রোত। ঐ বছর সরকারী হিসাব মত ১৪ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ("উপেক্ষিত" ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার-অনুশীলন বার্তা)।

গান্ধীজী ২৯ অক্টোবর ১৯৪৬ কলকাতা হয়ে নোয়াখালির অভিশপ্ত বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ পূর্ববাংলার নোয়াখালি থেকে চির বিদায় নিয়ে, প্রধানতঃ বিহারে দাঙ্গা দুর্গতদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতে চলে আসেন। গান্ধীজী আবার নোয়াখালিতে ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর নাতি কানু গান্ধী

সমেত অন্যান্যদের নোয়াখালিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য থাকতে নির্দেশ দেন। যাই হোক নোয়াখালিতে গান্ধীজীর শান্তি অভিযানের ফলে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ অবশ্য সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে স্থায়ী নিরাপত্তা আসেনি।

(২) ১৯৪৭ সালের ২০ ফ্রেব্রুয়ারি, কমন্স সভায় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট এট্‌লী ঘোষণা করেন—

"ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষে দুটি সরকারকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার (Dominion status) দিতে চাওয়া হয়েছে।" তিনটি দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ও শিখ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে। সুতরাং অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের অনেক পূর্বেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য সচেষ্ট হবে। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। দেশ ভাগ অনিবার্য, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন, হিন্দু মানসিকতা নিয়ে হিন্দু কংগ্রেসীরা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল, কলকাতার সিংহী পার্কে কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখার কার্যকরী কমিটির সভায় বাংলা ভাগের প্রস্তাব পাশ হয়। এই সভায় বিশেষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী; কে. সি. নিয়োগী; ডঃ পি. এন. ব্যানার্জী; ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়; নলিনী রঞ্জন সরকার; কুমার দেবেন্দ্রনাথ খান; মাখনলাল সেন; অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ।

Partition of Bengal only to Save Hindus

"Let us declare to-day thus as the Muslim League presists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate Province under a strong National Government-said Mr. N. C. Chatterjee, President of the Bengal Provincial Hindu Conference, Presiding over the session. (Amrita Bazar Patrika, 5 April, 1947)

Solution only in Partition, Communalism in Bengal. Dr. Mookherjee's clarien call for Vigorous Campaign.

"I can conceive of no other solution of the Communal Problem in Bengal than to divide the Province and let the two major communities residing herein like in peace and freedom" —said Dr. Shyama Prosad Mookherjee, addressing Bengal Hindu Mahasabha Conference at Tarakeswar. (Amrita Bazar Patrika, 6 April, 1947)

৩ জুন, কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী পুনরায় ঘোষণা করেন, "বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদকে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। একটি মুসলমান

গরিষ্ট জেলাগুলিকে নিয়ে এবং দ্বিতীয়টি বাকী অংশ নিয়ে গঠিত হবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "১৯৪৪ সালে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক শ্রী পি.সি. যোশী এক পুস্তিকায় ভারত বিভাগ সহ বাংলা বিভাগের সুপারিশ করেন। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ আগস্ট, ১৯৫৯)

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে পাকিস্তানের দাবি স্থান পায়।

বাংলা ভাগের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগ আলোচনার মাধ্যমে একমত হতে না পারায় স্থির হয় ২০ জুন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বিভক্ত হয়ে ভোটা-ভুটির দ্বারা এই অচল অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। সেই ভোটা-ভুটিতে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাগ সমর্থন করেন - সেই সব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন —

(১) ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী — হিন্দু মহাসভা।

(২) মহারাজাধিরাজ স্যার উদয়চাঁদ মহাতব - স্বতন্ত্র।

(৩) মুকুন্দ বিহারী মল্লিক.....স্বতন্ত্র।

(৪) কিরণ শঙ্কর রায় — কংগ্রেস অ্যাসেম্‌ব্লি পার্টির নেতা।

(৫) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত — কংগ্রেস অ্যাসেম্‌ব্লি পার্টির উপনেতা।

(৬) নেলী সেনগুপ্তা — কংগ্রেস।

(৭) পি. আর. ঠাকুর — ঐ।

(৮) রতনলাল ব্রাহ্মন — কম্যুনিস্ট।

(৯) বিধান সভায় সি.পি.আই. নেতা জ্যোতি বসু — কম্যুনিস্ট।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ — **"কম্যুনিস্ট দলের ভূমিকা"** দেশদ্রোহিতা

"১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে মুস্‌লিম লীগের সহিত হাত মিলাইয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া দেশের সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। ("ভারতীয় জনসঙ্ঘ —পশ্চিমবঙ্গ শাখা, পুস্তিকা, এপ্রিল ১৯৬০ পৃঃ ৫)

গান্ধীজী বলেছিলেন — "India will be divided on my dead body", আমার মৃতদেহের উপর ভারত বিভক্ত হবে — বলে ঘোষণা করেছিলেন।

গান্ধীজীকে যখন দেশভাগের বিরুদ্ধে অনশন করতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি বলেন —"কাহারও নির্দেশে তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করতে পারেন না। এইরূপ অনশনব্রত তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে ও এইরূপ অনশন গ্রহণ করা অবজ্ঞনীয়।

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, অনশনব্রত গ্রহণ করা চলে না। একমাত্র নিজের অন্তরাত্মা হতে আদেশ পাইলেই তিনি উহা গ্রহণ করিবেন। ক্রোধ পাগলামীর নামান্তর। তিনি দেশ সেবক। সেই সঙ্গে কংগ্রেসেরও সেবক। কংগ্রেসের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিলেই কি তাঁকে অনশন করিতে হবে। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া উচিৎ নয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জানুযারি, ১৯৪৮)।

গান্ধীজী একথা বলে নিজের নিঃসঙ্গতা, অসহয়তা চাপা দিতে চেয়েছিলেন। আচার্য জে. বি. কৃপালনী তাঁর "গান্ধী অ্যান্ড হিজ থট" বইতে লিখেছেন, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের সময় থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীজী থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর "লাস্ট ডে'জ উইথ গান্ধী" বইতে লিখেছেন যে, গান্ধী দেশভাগের বিরোধিতা করলে, গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে বলেন, "কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আমার সঙ্গে, আপনার সঙ্গে নেই।" জবাবে গান্ধীজী বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে ওয়াকিং কমিটি থাকতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্গে আছে দেশের লোক।" (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান্ধীজী প্রসঙ্গে। শারদীয়া যুগের ডাক, ১৪০৮। পৃঃ ৩১)।

কিন্তু গান্ধীজী জানতেন, সংগঠন হাতে না থাকলে জনগণের কাছে পৌঁছানো যায় না।

পরে তিনি জাহাঙ্গীর প্যাটেলকে বলেছিলেন, আমি যখন বিহারে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমাকে অন্ধকারে রেখে নেহরু, প্যাটেল, মাউন্টব্যাটেন ও জিন্না দেশ ভাগ করেছেন।

যাইহোক গান্ধীজী পুনরায় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বলেন —

"The question of Hindus, who could not stay in their own homes in Pakistan through fear, vague or real. They could not, if their trade or movements were restricted and they were, treated as aliens in their own Province. It was undoubtedly the duty of the Provinces in the union to receive, such refugees with open arms and give them all reasonable facilities. They should be able to feel that they had not come to a strange land.

The whole of India was the home of every Indian, who considered himself and behaved as such, no matter to what faith he belonged. The condition for the newcomer was as he had said in Hardwar, that he must be a sugar was to milk. He must aim to adding sweetness and richness to the life around him." (Hindusthan Times. 11 July 1947.)

দেশ ভাগের দিন নোয়াখালির মানুষদের মধ্যে থাকার জন্য গান্ধীজী পূর্ব বাংলা যাওয়ার পথে পশ্চিম ভারত থেকে ১২ আগষ্ট ১৯৪৭, কলকাতা পৌঁছান। ইতিমধ্যে কলকাতায় হিন্দুরা দাঙ্গা শুরু করে। নোয়াখালি থেকে কানু গান্ধী কলকাতায় গান্ধীজীর নিকট বার্তা পাঠান ঃ "আপনি আগে কলকাতার দাঙ্গা থামান। কলকাতায় দাঙ্গা হলে আপনি এখানকার মানুষদের বাঁচাতে পারবেন না।" গান্ধীজী নোয়াখালি যাওয়ার কর্মসূচী বাতিল করে কলকাতায় দাঙ্গা থামানোর জন্য থেকে যান। তিনি বেলেঘাটার এক মুসলমান বাড়িতে ওঠেন এবং দাঙ্গা থামাতে সাহায্য করার জন্য সোশালিস্ট নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এবং সোশালিস্ট নেত্রী অরুণা আসফ আলিকে কলকাতায় থেকে যেতে বলেন। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ গান্ধীজী ও অবিভক্ত বাংলার শেষ মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে অনশন করেন। ঐদিন সকালে ডঃ লোহিয়া ও অরুণ আসফ আলি রাজাবাজার থেকে ১০ হাজার হিন্দু মুসলমানের মিলিত শান্তি শোভাযাত্রা নিয়ে বেলেঘাটা আসেন।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্টের পর কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মিলিত শোভাযাত্রা এই প্রথম। দেশ ভাগের আগের দিন পর্যন্ত মৈয়মনসিং জেলার শাসক আই-সি-এস, অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, "গান্ধীজী অনশন করে কলকাতায় দাঙ্গা থামাতে না পারলে, পূর্ব বাংলার হিন্দুরা সাবাড় হয়ে যেত।"

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, কলকাতায় বোমার আঘাতে দুটি মুসলমান ছেলে মারা গেলে গান্ধীজী বেলেঘাটার বাড়িতে ৭৩ ঘণ্টা অনশন করেন। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ গান্ধীজী কলকাতা ছেড়ে পশ্চিম ভারতে চলে যান।

ভাগাভাগি পর্ব শেষ। সৃষ্টি হল দুটি বাংলা-পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকে আবার শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তু আগমন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত চাকুরিয়াজীবী মানুষের পরিবার পরিজন ভারতে চলে আসতে লাগলেন। ১৯৪৭ সালে ২,৫৮,০০০ জন উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসেন। (সরকারী হিসাবের বাইরে রেকর্ড করা হয় নি এমন হাজার হাজার উদ্বাস্তু প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করছেন)।

১৯৪৭সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মহম্মদ আলি জিন্নাহ করাচীতে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে শপথ নেন। লাখনৌর নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। এঁরা ছিলেন ভারতের অধিবাসী। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সেনাবাহিনীর বিভাজন চলছিল বলে ইংরেজ জেনারেল অকিনলেক ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই লাহোর ও পাকিস্তান পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু ও শিখদের বাড়ি লুটপাট, ঘরে আগুন লাগানো, খুন

ও নারীহরণ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিনদিন পরে গভর্ণর জেনারেল জিন্না উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধানসভা বাতিল করে আবদুল কোয়ায়ুম খানকে ঐ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কোয়ায়ুম খান, উপজাতিদের প্রথমে হিন্দুদের বিরুদ্ধে, পরে কাশ্মীর আক্রমণে লেলিয়ে দেন। ভারত থেকে গিয়ে পাকিস্তানের উপর চেপে বসা জিন্নাহ, লিয়াকত আলি খান, পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং ভারত থেকে যাওয়া অফিসারেরা পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ বিরোধী দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করেননি; করলেও কতটা সফল হতেন, বলা শক্ত। ট্রেন ভর্তি রক্তাক্ত ও স্বজন হারানো পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলায় এবং তারা ভারতে এসে পাকিস্তানগামী ট্রেন-ভর্তি দেশত্যাগী মুসলমানদের আক্রমণ করতে থাকায় গোটা পাকিস্তানে যেমন সংখ্যালঘুদের উপর বর্ব্বরতার মাত্রা ছাপিয়ে যায়, তেমনি পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি এলাকায় মুসলমানদের উপর নৃশংস আক্রমণ চলতে থাকে। পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুশূন্য হয় এবং পূর্ব পাঞ্জাব কার্যত মুসলমান শূন্য হয়। উদ্বাস্তু স্রোতের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে ও ভারতে দাঙ্গা থামাতে সরকারী প্রশাসন ব্যর্থ হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন যেমন দাঙ্গা থামাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, পাকিস্তানে তেমন কোনো উদ্যোগও দেখা যায়নি। গান্ধীজী পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ গান্ধীজীকে পাকিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেতে দিতে রাজী হন ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজী খুন হওয়ার এক সপ্তাহ আগে। যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধের আশায় কংগ্রেস দেশ ভাগ মেনে নিয়েছিল, দেখা গেল, সে আশা ছিল মরীচিকা। মুসলিম লীগ পাকিস্তান চেয়েছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি।

(৩) ১৯৪৮ সালে, হায়দ্রাবাদে 'পুলিশ' অভিযানকে কেন্দ্র করে আবার পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠে। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ১৯৪৮ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির হঠকারী রণদিভে লাইন। পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালক ছিল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। খুলনা জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক কুমার মিত্র পাকিস্তানে কৃষক আন্দোলন করে জেলে গিয়েছেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার আন্দোলন করেছেন। পরে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, রণদিভের হঠকারী লাইনের আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ফলে কম্যুনিস্ট পার্টি আন্দোলন করত, এমন এলাকার নমঃশূদ্র কৃষকেরা ভারতে এসে রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। (কুমার মিত্র ঃ যুগান্তরের পথিক, কলকাতা-১৯৯৭, পৃঃ ১৪০)। পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট কর্মীদের বেশীরভাগ কর্মী ছিলেন হিন্দু। কৃষক সমিতির আন্দোলন ছিল প্রধানত হিন্দু (নমঃশূদ্র)

কৃষকদের মধ্যে। যশোর-খুলনা জেলার এক কম্যুনিস্ট কর্মী প্রশান্ত হালদার লিখেছেন; "ময়মন সিং জেলার টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজংদের নিয়ে প্রথম আন্দোলন শুরু করে কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক সভা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কম্যুনিস্ট পার্টি রণদিভে লাইন অনুসারে টংক প্রথার বিরুদ্ধে তৃতীয় পর্যায়ের আন্দোলন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে করে। সশস্ত্র হাজংরা পুলিশও খুন করে। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে কম্যুনিস্টদের শক্ত কৃষক সংগঠন ভাল চোখে দেখেনি। তারা কম্যুনিস্ট কৃষক সংগঠন নিঃশেষে ভেঙ্গে দেবার চিন্তা করে। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের দমননীতির ফলে হাজংরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। রনদিভের হঠকারী সিদ্ধান্ত লীগ সরকারের সুযোগ করে দিয়েছিল। টংক প্রথার অবসান হয়। কিন্তু সেই সুবিধা একমাত্র মুসলমান কৃষকেরা ভোগ করে।" (প্রশান্ত হালদার ঃ হাজং বিদ্রোহ - কম্যুনিস্টদের ভূমিকা। বাংলা ঃ বৈশাখ ১৪০৮, টাকি।)

কম্যুনিস্ট নেতা মণীন্দ্র নারায়ণ সিংহ। তিনি মনি সিং নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি আত্মগোপন করে দেশে থাকলেও বহু কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মী ভারতে চলে আসেন। এই ধাক্কায় চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসাব মত ৫,৯০,০০০ জন উদ্বাস্তু। ডঃ অশোক মিত্র, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, প্রশান্ত শূরের মতো বহু হিন্দু কম্যুনিস্ট নেতা পালিয়ে, পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ সালে যশোর নির্বাচন কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট প্রার্থী "কৃষ্ণবিনোদ রায়, বরিশালের অমিয় দাশগুপ্তের মতো অনেক নেতা মুচলেকা দিয়ে পাকিস্তান জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।" (কুমার মিত্র ঃ যুগান্তরের পথিক) বেশীরভাগ নেতা উদ্বাস্তু কলোনিতে আশ্রয় নেন। কম্যুনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তু আন্দোলনে অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মী পান। আর পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা রাজনৈতিক কর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন।

(৪) ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চলে ছিন্নমূল মানুষের ঢল। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর খুলনায় যে দাঙ্গার সূচনা হয়, তা ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও অন্যান্য জেলায়। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে পৌঁছালেন সরকারী হিসাব মত ১১,৮২,০০০ জন উদ্বাস্তু। নিজেদের নাম উদ্বাস্তু হিসাবে লেখাননি এমন বহু লোকের হিসাব এতে নেই। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় থেকে ঐ এক বৎসরে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় সরকারী হিসাব মত ১৫ লক্ষ্য ৮২ হাজার উদ্বাস্তু এসেছিলেন। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল, সম্পাদিত হলো নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কিত নীতির বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী ৮ এপ্রিল মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু কালক্রমে এই চুক্তির অপমৃত্যু ঘটে। ব্যাপক হারে পূর্ববঙ্গের

হিন্দুরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। সেই সময় এদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির নেতৃস্থানীয় কেউ বাদ যাননি।

১১ এপ্রিল, তদানীন্তন ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন—

'ক্ষতিগ্রস্তদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহায়তা করার বিষয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ, সমাগত উদ্বাস্তুদের সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস।'

তিনি আরও বলেন "ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবেন —এই পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনকালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য ভাণ্ডার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে। যারা ভারতে স্থায়ীভাবে থাকতে চান—তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল পরিকল্পনা করবেন, সে গুলি অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করার জন্য আমি তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি।" (আনন্দবাজার, ১২ এপ্রিল ১৯৫০)।

২৫ জুন, যুক্ত পুনর্বাসন বোর্ডের উদ্বোধন কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটিকে জাতীয় সমস্যারূপে গণ্য করার আবেদন জানানঃ

"ভারতে আগত যে সকল উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক নন, তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পুনর্বাসন সমস্যাটিকে জাতীয় সমস্যা বলিয়া গণ্য করতে হবে।"

এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে সর্বশক্তি ও সঙ্গতি একীভূত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যদি তারা তাদের সকল প্রয়াস সুসমন্বিত না করেন তা হলে সরকারের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন—"উদ্বাস্তুদের সাহায্য কেন্দ্রসমূহে অধিককাল কর্মহীন রাখা হবে না। তাদের পুনর্বাসনের কার্যে বিলম্ব হবার আশঙ্কা থাকলে তাদের কোন না কোন কাজে নিয়োগ করা হবে। তারা যাতে জীবিকার্জনের নতুন পন্থা গ্রহণ করতে পারে তদুদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র উদ্বাস্তুদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খোলা, বর্তমানে ভারতে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন ১৯৫০)।

দিল্লি চুক্তি উদ্বাস্তু আগমনকে প্রতিহত করতে পারেনি। অবশ্য কয়েক মাসের জন্য আগমন একটু কমেছিল।

(৫) ১৯৫১ সালে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে আবার জ্বলে উঠল, শুরু হল পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংখ্যালঘু নির্যাতন। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববঙ্গের

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাবের জন্য সরকারী হিসাব অনুসারে চলে এলেন ১,৪০,০০০জন।

(৬) ভারত ও পাকিস্তান সরকারদ্বয় দু'দেশের মধ্যে অবাধ যাতায়াত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের পর পাসপোর্ট প্রথা চালু করার কথা ঘোষণা করেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়। ভারতের দরজা বুঝি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু নিগ্রহ ও খাদ্যাভাবের যন্ত্রণা। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল এই তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন অতিশয় বৃদ্ধিপায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা সরকারী হিসাব মত ৩ লক্ষ ১৬ হাজার। আর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা এই তিন রাজ্যে মোট আসেন সরকারী হিসাব মত ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার উদ্বাস্তু। বাধ্য হয়ে সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের জন্য বহু কাম্প স্থাপন করেন।

(৭) পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক অশান্তি, ভাষা আন্দোলন এবং সংখ্যালঘুর উপর বিবিধ পীড়নের ঘটনাবলীতে আবার উদ্বাস্তু আগমনের হার বৃদ্ধি পেল ১৯৫৫-৫৬ সালে। পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পূর্ববঙ্গে সরকারী ভাষা ঘোষণা করলেন এবং পাকিস্তানে ইসলামীয় সংবিধান গৃহীত হল।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়েছিলেন। প্রগতিশীল মুসলমান জনসাধারণ ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সরকারী যোগ সাজসে সংখ্যালঘু পীড়ন শুরু হওয়ার ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার উদ্বাস্তু।

(৮) ভারত সরকার এই উদ্বাস্তু স্রোত প্রতিহত করার জন্য এবার বদ্ধপরিকর হলেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার এক অন্ধকূপে আটক পড়ে গেলেন ভারত সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়। ১৯৫৬ সালের মে মাসে ঢাকায় দুই দেশের মন্ত্রী বৈঠকে এই উদ্বাস্তু আগমন প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত পাকা হলো। পাকিস্তান সরকারের উপর সংখ্যালঘুদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার উদ্বাস্তু নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর করলেন। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে শর্তাবলী আরোপিত হল। এরপর ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে দার্জিলিং-এ মন্ত্রী সম্মেলনে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হয় শ্রী মেহের চাঁদ খান্নার নেতৃত্বে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থনে।

সাহায্য চাইনা, আসতে দাও

এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকারের কাছে সুপারিশ করা হল ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চের পর, যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসবেন, তাঁদের আর কোন উদ্বাস্তু সাহায্য বা পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করলেন। উদ্বাস্তু আগমনের হার একেবারে কমে গেল মাইগ্রেশনের নিয়মাবলীর মারপ্যাঁচে। কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে কি সংখ্যালঘুরা আসেন নি? এসেছেন বহু কষ্টে এবং ভারতে পুনর্বাসনের বা সাহায্য চাইবেন না এই প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করে।

ঐ সময় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের সাহায্যে ভারতে প্রবেশ করেছিল। আর ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা অফিসে ৬২ হাজার মাইগ্রেশন দরখাস্ত (তিন লক্ষাধিক উদ্বাস্তু) বিবেচনাধীন পড়েছিল।

ভারত সরকারের এই কঠোর উদ্বাস্তু আগমন নিয়ন্ত্রণনীতি সত্ত্বেও সরকারী হিসাব মত ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সমেত (জাল সার্টিফিকেট সহ) মোট ৪ লক্ষ ৩২ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এঁদের অনেকেই সরকারের নিকট থেকে কোন সাহায্য পাননি।

আসেন কি তাঁরা মুক্তির আশায়?

১৯৫৯-৬৩ সাল, এই পাঁচ বছরে ভারতে পূর্বপাকিস্তান থেকে কি উদ্বাস্তু আসেনি? হাজার হাজার এসেছেন। মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট নিয়ে এবং না নিয়েও এসেছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা সরকারী হিসাবে নেই। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর ও বৈদেশিক দপ্তরের অনুমতি ছাড়া সোজাভাবে ভারতে আসতে পারেন নি। উদ্বাস্তু হিসাবে ভারতে কোন সাহায্য চাইব না—এই লিখিত স্বীকারোক্তি না দিলে ভারতে প্রবেশের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া যেত না। শুধু কি তাই? ভারতীয় কোন নাগরিক যতক্ষণ না তার আত্মীয়দের ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, ততক্ষণ এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। এই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জটিলতা, উদ্বাস্তু আগমনের স্রোত ক্ষীণ করে দিয়েছিল।

(৯) ১৯৬২ সালের এপ্রিল ও মে মাসে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, পাবনা, নোয়াখালি জেলায় ব্যাপক দাঙ্গা হয়। সংখ্যালঘুদের বহু প্রাণহানি ঘটে। ভয়ার্ত পলায়নকারী উদ্বাস্তুদের সীমান্তে গুলিবিদ্ধ পর্যন্ত করা হয়। এই সময় সরকারী হিসাব মত, রাজসাহী

জেলায় সাঁওতাল ও অন্য আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ায় প্রায় ১১ হাজার সাঁওতাল ও রাজবংশী মালদহে আশ্রয় নিয়েছিল। বে-সরকারী হিসাবমত এবার আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক।

(১০) ১৯৬০-৬৩ সালের পূর্ব পাকিস্তানে বহুবার সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বহুলোক হতাহত হয়েছে। রাজসাহী ও যশোহর জেলায় ১৯৬০ সালে বিবিধ ঘটনা ঘটে। ১৯৬১ সালে ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, রাজশাহী, পাবনা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে দাঙ্গা হয়। অন্ততঃ ৫০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার ঐ সময় ভারতে আসার জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার নমঃশূদ্ররা ভীষণ ভাবে উৎপীড়িত হয়, কয়েক শত লোকের জীবন হানি ঘটে, বহু সংখ্যক উৎপীড়িত মানুষ শেষ পর্যন্ত বে-আইনীভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন। তাঁদের অনেককে পুলিশ আটকও করেছিল।

সরকারের স্বীকৃতি

প্রসঙ্গতঃ ১৯৬২ -৬৩ সালে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্টের স্বীকৃতি তুলে ধরতে পারি। এই রিপোর্টে সংক্ষেপে বলা হয়—"inspite of stringent policy of the Goverment of India on grant of migration certificates, the migrant traffic from Pakistan to India continued unabated", কাজেই দেখা গেল ১৯৫৮ সালের ৩১মার্চ-এর পর থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা সরকার না রাখলেও তার সংখ্যা খুব কম নয়—বেশীর ভাগই কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য বে-আইনীভাবে ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বে-সরকারী হিসাব মত ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্যূন তিন লক্ষাধিক উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছে।

(১১) ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবার এলো প্রচণ্ড ধাক্কা। কাশ্মীরের শ্রীনগরের মসজিদ থেকে পয়গম্বরের কেশ হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে কাশ্মীরে বিক্ষোভ হয়।

এই কেশ হারানোকে কেন্দ্র করে খুলনার মুসলিম লীগ নেতা ও পাকিস্তানের মন্ত্রী আবদুস সবুর খান খুলনা শহরে হিন্দুদের উপর আক্রমণের উস্কানি দেন। খুলনায় দাঙ্গার সংবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ এবং পরে কলকাতায় সংখ্যালঘুদের বস্তিগুলিতে আগুন লাগানো, হাবড়ার গ্রামগুলিতে মুসলমানদের বাড়ি লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে খুলনা, যশোহর এবং পরে ঢাকা, ফরিদপুর, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক হারে হিন্দু, আদিবাসী, বৌদ্ধ বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। মৈমনসিং থেকে হাজং আদিবাসী এবং

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বৌদ্ধ চাকমারা দলে দলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বহু প্রাণহানি, নারীহরণ, সম্পত্তি লুঠের ঘটনা ঘটেছে। চারদিকে মাইগ্রেশন শিথিল করার দাবি উঠল—শেষ পর্যন্ত কিছুটা শিথিল হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগী এখনও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারেননি। পাকিস্তানী নিপীড়ন ও পথরোধ এবং ভারত সরকারের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার কঠোরতা উপেক্ষা করেই ইতিমধ্যে দুই লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন এক লক্ষ এবং আসামে ৭৫ হাজার ও ত্রিপুরায় ২৫ হাজার। দুর্বার জলস্রোতের ন্যায় ভারতে উদ্বাস্তু দল হাঁটাপথে, ট্রেনে এবং গোপনে আসছে। (যুগান্তর, ৭ এপ্রিল ১৯৬৪)

পরিকল্পিতভাবে বারবার দাঙ্গা বাঁধিয়ে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কয়েক কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানকে পূর্ব পাকিস্তানের পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়। জমির লোভে মুসলমান কৃষকদের সহজেই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া গেল।

স্বাধীনতার পরেও বাঙ্গলাদেশের শাসক গোষ্ঠী শত্রু সম্পত্তি আইন চালু রেখে বাঙ্গলাদেশে ইসলামকে সরকারী ধর্ম ঘোষণা করে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানদের উপাসনালয় ধ্বংস করে অ-মুসলমানদের অবাঞ্ছিত, উপেক্ষিত নাগরিক বানিয়ে নানা রকম অত্যাচার চালিয়ে তাদের পূর্ববঙ্গে বাস করা অসম্ভব করে তোলে।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর থেকে "হজরত বাল" দাঙ্গার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দশ লক্ষ অ-মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই নবাগত নমঃশূদ্র ও আদিবাসী উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকারের কাছে ছিল অবাঞ্ছিত, উপেক্ষিত। কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁদের জোর করে পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রাম স্টেশন থেকে ট্রেনে করে সোজা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের নিকট দণ্ডকারণ্যের মানা ট্রানজিট উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি ও ভাইরাস ইনফেকসনে হাজার হাজার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর মানা শিবিরে মৃত্যু ঘটে। পথে অনাহারে, রোগে কত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর মৃত্যু হলো, তার হিসাব কেউ দিতে পারবেন না। ("উপেক্ষিত" ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার, অনুশীলন বার্তা)।

Namasudra and Tribal Pockets Eliminated

In some of the districts of East Pakistan, like Dacca, Faridpur, Barisal, Khulna, Sylhet, Rajshahi, Dinajpur, etc. the traditional militant Hindu Namasudra Community and the Tribals formed large pockets of concentrated population. Although courageous by tradition this Hindu Namasudra Community never indulged in any kind of unsocial activity but their historical records of

valour and dauntless spirit proved to be great curse for them after partitition. During the days of Pre-Partition communal traoubles nobody dared to touch the hairs of the Namasudra Community or the Tribals but after Pakistan rule was imposed, systematic official opperssive measures were adopted to demoralise and disperse their major bulk of population and then 'tame' the rest to make their continuance in East Pakistan 'harmless' for the new state. (Whither Minorities in East Pakistan by Samar Guha. P. 33)

তৃতীয় অধ্যায়

সরকারী ব্যাবস্থাপনা ও উদ্বাস্তু আন্দোলন

সরকার পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের জন্য বহু ক্যাম্প স্থাপন করেন। সেই সময় পশ্চিম বাংলা সহ সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসী শাসন চলছিল। এইসকল উদ্বাস্তুদের পশ্চিম বাংলায় সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবিতে সেদিনের বিরোধী দলের নেতা বর্তমান পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সহ বর্তমান বামপন্থী দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসনের প্রস্তাবে বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ক্যাম্পের কৃষক উদ্বাস্তুদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৫১-৫২ সালে কয়েকটি জাহাজে উদ্বাস্তুরা আন্দামানে যাওয়ার পর কম্যুনিস্ট পার্টি প্রভাবিত ইউ.সি.আর.সি. আন্দোলন করে উদ্বাস্তুদের আর কালাপানি পার হতে দেননি।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা তাদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ পুরণের নিমিত্ত ছোট ছোট সংগঠন গড়ে তোলে। পূর্বপাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি রণদিভে লাইন অনুসারে পাকিস্তান সরকার উচ্ছেদের আন্দোলন শুরু করায় কম্যুনিস্ট কর্মী ও নেতারা এবং কম্যুনিস্ট প্রভাবিত কৃষক আন্দোলন সরকারী নীতির শিকার হয়। কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলে পাটি তাঁদের জবরদখল করা কলোনিগুলিতে পার্টি-কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে। বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনিতে কম্যুনিস্ট প্রভাবিত সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে কম্যুনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত হয় সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (United Central Refugee Council ইউ.সি.আর.সি.)। ইউ.সি.আর.সি. প্রধানতঃ জবরদখল কলোনীতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রজা সোসালিস্ট পার্টির (পি. এস. পি) নেতৃত্বে গঠিত হয় "সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদ", ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে আর. এস. পি গঠন করে "পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটি"। এই সংগঠনের প্রভাব ছিল জবরদখল কলোনিগুলিতে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর-সি-পি-আইয়ের নেতৃত্বে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করত বাস্তুহারা কল্যাণ পরিষদ। এই সংগঠনের প্রভাব ছিল প্রধানত নদীয়া জেলার ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের মধ্যে। শ্রীমতী লীলা রায়ের নেতৃত্বে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক নিজস্ব উদ্বাস্তু সংগঠনের মাধ্যমে সক্রিয় ছিল।

আন্দোলন এগিয়ে চলল—কিন্তু শক্তিশালী রূপ নেয় না। কারণ ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক। তারা উদ্বাস্তু আন্দোলনে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা দাবি করেন। কিন্তু কর্মকর্তাসহ সংগঠনের নেতারা সে ব্যাপারে গররাজী। তাই আন্দোলনেও ধীরগতি। অগত্যা বাধ্য হয়ে নেতারা তাঁদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৯৫৮ সালের ১১ ও ১২ জানুয়ারি, কলকাতার উপকণ্ঠে বাগজোলা ক্যাম্পে "সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদের" উদ্যোগে একটি ক্যাম্প উদ্বাস্তু সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সম্মেলনে যোগেন্দ্রনাথের উপস্থিতি কামনা করে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুরা কর্মকর্তাদের উপর চাঁপ সৃষ্টি করেন। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি মহাদেব ভট্টাচার্য এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হেমন্ত কুমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি, যোগেন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে প্রকাশ্য সম্মেলনে ভাষণ দেন।

সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদে যোগেন্দ্রনাথ যোগদান করায় ইউ.সি.আর.সি-র তরফে প্রচার করা হয় যে—

শ্রীমগুল উদ্বাস্তুদের ঘাড়ে পা দিয়ে আবার একটা নতুন সুযোগের সন্ধানে নামিয়াছেন। .....ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ডাকিলেই কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ লাগাইয়া তিনি কংগ্রেসে যাইবেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন—এ কেউটে সাপ সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের প্লাটফর্মে নিজের সুযোগের জন্য ভিড়িয়াছেন। (লোকসেবক, ২৯ এপ্রিল ১৯৫৮)।

বাগজোলা সম্মেলনে স্থির হয়, যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সংসদের সহিত একযোগে উদ্বাস্তু আন্দোলন করবেন। ক্রমে আন্দোলন এগিয়ে চলতে চলতে এক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময় স্থির হয়, উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে এবং উদ্বাস্তুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের সরকারী নীতির পরিবর্তনের জন্য সত্যাগ্রহ সহ কারাবরণ করা হবে। সেই মত ১৯৫৮ সালের ১৭মার্চ, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং ১৮ মার্চ যোগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে উদ্বাস্তুরা ১৪৪ধারা ভঙ্গ করে কারাবরণ করেন। সেই সময় জেলে থাকা কালে যোগেন্দ্রনাথ অপর নেতাদের আচরণ ও মনোভাবে হীনমন্যতার যে পরিচয় পাইলেন এবং সত্যাগ্রহ তিন সপ্তাহ চলার পরে পি. এস. পি নেতা শিবনাথ ব্যানার্জী ও দেবেন সেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সহিত আপোষ ব্যবস্থার নিমিত্ত যে সকল দাবিসনদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ সহ উদ্বাস্তু যুবকগণ ও বিভিন্ন ক্যাম্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন নেতাদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্বাস্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করা। এই আন্দোলন রোধ করার জন্য কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন ক্যাম্পে

নির্মমভাবে গুলি চালায়। ফলে অনেক জীবন অকালে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে। অগত্যা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে উদ্বাস্তুরা যোগেন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্র উদ্বাস্তু সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব দেন।

উক্ত বাগজোলা সম্মেলনে যোগেন্দ্রনাথের যোগদান বিষয়ে দেবজ্যোতি বর্মন সম্পাদিত "যুগবানী" সাপ্তাহিক পত্রিকার নব পর্য্যায় ঊনবিংশ খণ্ড, পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

উদ্বাস্তু রাজনীতি

বাঙ্গলার উদ্বাস্তু রাজনীতিও বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।.....ইতিমধ্যে বামপন্থী তিন বড় হিস্যাদারের লড়াই উদ্বাস্তু ক্ষেত্রেও শুরু হইয়া গিয়াছে। যোগেন মণ্ডলের আবির্ভাব উদ্বাস্তু রাজনীতিতে এক বড় ঘটনা। বর্তমানে ক্যাম্পের উদ্বাস্তু অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশের বেশী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের উপর যোগেন মণ্ডলের প্রভাব অসামান্য। ক্যাম্পের বাহিরে প্রায় ২০ লক্ষ নমঃশূদ্র বাঙ্গলায় আসিয়াছে। ইহারাও মণ্ডল মহাশয়কে অন্ধভাবে মানে। উদ্বাস্তু সমিতির মধ্যে দুইটি প্রধান—পি. এস. পির সারা বাঙ্গলা বাস্তুহারা সম্মেলন এবং কম্যুনিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের ইউ. সি. আর. সি.। যোগেন মণ্ডল সারা বাঙ্গলা বাস্তুহারা সম্মেলনে যোগ দেওয়ায় উহারা সত্যাগ্রহ করিতে পারিয়াছে। সত্যাগ্রহের খাদ্য (Fodder) ইনিই জোগাইয়াছেন। এখন ইহার সঙ্গে পি. এস. পি. নেতাদের গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। যোগেন মণ্ডল সারা বাঙ্গলা বাস্তুহারা সংসদ ছাড়িয়াছেন।.....

এবার তৃতীয় উদ্বাস্তু সমিতি গঠনের প্লান হইতেছে। তার ওয়াকিং প্রেসিডেন্ট হইবেন যোগেন মণ্ডল।..... প্রেসিডেন্ট পদের জন্য একটি ভাল নাম খোঁজা হইতেছে এবং রটানো শুরু হইয়াছে নির্মল চট্টোপাধ্যায় (N.C. Chatterjee) প্রেসিডেন্ট হইবেন। নির্মল চট্টোপাধ্যায় এই জাতীয় রাজনীতিতে নামিবেন বলিয়া আমাদের তো বিশ্বাস হয় না। (যুগবানী, ৩১ মে, ১৯৫৮)।

৯ জুলাই, ১৯৫৮ সাল কলিকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটি হলে, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এড্‌ভোকেট ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে, "পূর্ব-ভারত বাস্তুহারা সংসদ" নামে একটি স্বতন্ত্র উদ্বাস্তু সংস্থা গঠিত হয়। ব্যারিষ্টার ও হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (N.C. Chatterjee) উক্ত সংস্থার প্রথম সভাপতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কার্যকরী সভাপতি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মনোরঞ্জন বসু উক্তসংস্থার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে জনতা পার্টির এম. এল. এ. অধ্যাপক হরিপদ ভারতী সহ জনসংঘ নেতারা উক্ত

সংস্থায় যোগদান করে একযোগে উদ্বাস্তু আন্দোলন শুরু করেন।

ইউ. সি. আর. সি.-র তরফে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট ১১ আগষ্ট যে দাবিসনদ পেশ করা হয় তাতে বলা হয়,—

".....সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৬২.৫ বর্গমাইল জায়গায় ৬,৮৭৫টি এবং মাছের ভেড়ী থেকে ১২ হাজার একরে ৩,৩০০টি উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে।"

অপর দিকে সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন তার দাবি-সনদে বলেন—

"দণ্ডকারণ্যের বরাদ্দ অর্থে সুন্দরবনের সমস্যা ও গঙ্গা ব্যারেজ সফল করা সম্ভব।" সরকার বলিয়া থাকেন অর্থের অভাবের জন্য পরিকল্পনা সম্ভব নয়। আমাদের অভিমত দণ্ডকারণ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে এই দুটি পরিকল্পনার রূপায়ন সম্ভব। গঙ্গাব্যারেজ সফল হলে ৩০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী ১২ লক্ষ সুন্দরবনবাসীর বাঁচিবার পথ সুগম হইবে।

১৯৫৮ সালের, ২৮ সেপ্টেম্বর, যাদবপুর বাপুজী নগর কলোনীতে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের যে সম্মেলন হয়, তাতে ঘোষণা করা হয়—"পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুনর্বাসনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকিতে উদ্বাস্তুদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে ও পশ্চিমবাংলার বাহিরে পুনর্বাসনের জন্য পাঠাইবার কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সম্মেলন সরকারের এইরূপ প্রচেষ্টা সর্ব্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিবার সিদ্ধান্ত করিতেছে।

এই সম্মেলন আরও মনে করে যে,.....সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ ও অপর উদ্বাস্তু সংগঠনের পক্ষ হইতে পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে, সেই গুলি কার্যকর করা হইলে পশ্চিমবাংলার মধ্যেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের পথে বিপুল অগ্রগতি হইবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার অযৌক্তিকভাবে এই সকল পরিকল্পনা কার্যকর করিতে অস্বীকার করিতেছেন। ইহার ফলে উদ্বাস্তুদের জীবনে এবং সমস্যা সংকুল পশ্চিমবাংলার জাতীয় জীবনে দুঃখ ও সংকট বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্বাস্তুদের দুর্ব্বিসহ অবস্থা লাঘব করিবার জন্য পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য সরকারের বর্তমান নীতি পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলন মনে করে যে, প্রবল গণ আন্দোলন ভিন্ন সরকারী নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে সরকার যদি তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি ঘোষণা না করেন, তাহা হইলে চরম পত্র দিয়া আগামী ১৪ নভেম্বর হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

এই সম্মেলন আরও সিদ্ধান্ত করিতেছে যে,

(১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ অর্থ এবং উদ্বাস্তুদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুনর্বাসনের দাবিতে সর্বস্তরের দেশবাসীর স্বাক্ষর অভিযান।

(২) বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং উদ্বাস্তু গণতান্ত্রিক জনতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

১৩ অক্টোবর, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তার ভাষণে বলেন—

"Reclamation of the Sundarbans Land also presents of difficult task. Raising of embankment is the least part of it. The problem is one of growing crops on the reclaimed saline soil after an area is enclosed by raising embankment it requires at least two years to wash away the salinity of the soil and make the land fit for growing crops profitable."

২১ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে ইউ. সি. আর. সি.-র সম্পাদক জি.সি.ব্যানার্জী পূর্বভারত বাস্তুহারা সংসদের সম্পাদককে এক পত্রে ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু আন্দোলন যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত করিবার আহ্বান জানান। সেই মত পরবর্তী আন্দোলনগুলি অনেক ক্ষেত্রে একযোগে পরিচালিত হয়। ঐ বৎসর ২৮ ও ২৯ নভেম্বর ১৯৫৮ মহাসমারোহে পূর্বভারত বাস্তুহারা সংসদের উদ্যেগে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে এক ঐতিহাসিক ক্যাম্প উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ২৯ নভেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং উদ্বোধন করেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে ৪ নং প্রস্তাবে বলা হয়—"এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য জমির অভাবহেতু উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বাসনের জন্য বাঙ্গলার বাহিরে ও দন্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে হইতেছে, সরকারের এই যুক্তি ও ঘোষণা জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার একটা অপকৌশল মাত্র। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের গত ১৪ অক্টোবর তারিখের বিবৃতিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, সোনারপুর বাগজোলা পরিকল্পনায় ৯/১০ হাজার উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারের পুনর্বাসনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল বিরোধিতায় তাহা সম্ভব হইল না। ডাঃ রায় আরও বলিয়াছেন যে, ল্যান্ড রেকর্ড দপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ তদন্তে প্রকাশ যে, হাওড়া ও হুগলীতে কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪,৩০৭ একর এবং ২২,৬৩৯ একর। সম্মেলনের মতে প্রতি পরিবারকে ৩ একর করিয়া জমি দিলে হাওড়া ও হুগলীর মোট ২৬,৯৪৬ একর জমিতে ৮,৯৮২টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি অনুসারে সোনারপুর -বাগজোলা পরিকল্পনায় এবং হাওড়া ও হুগলী জেলাতে ১৮ হাজার

পরিবারের পুনর্বাসন হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া থানার নাঙ্গলার বিলে প্রায় ২৬ হাজার বিঘা নীচু পতিত জমি, ব্যারাকপুর মহকুমার বর্ত্তির বিলে বহু সহস্র বিঘা নীচু জমি, ধাপা মানসুর মৌজায় প্রায় ৩৩ বর্গ মাইল পতিত জমি, যাত্রাগাছী ঘুনী মৌজায় ৮৫০০ বিঘা জমি, ক্যানিং থানার হেড়োভাঙ্গা, ঝড়খালী মৌজায় বহু সহস্র বিঘা জমি, হিরন্ময়পুর মৌজায় ৫ হাজার বিঘা পতিত জমি। **সন্দেশখালি থানার মরিচঝাঁপি মৌজায় সরকারের প্রায় ৫০ হাজার বিঘা পতিত জমি** এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় বহু অজস্র বিঘা জমি ও মুর্শিদাবাদ হইতে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কালান্তরের মাঠ প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমি তো পড়িয়াই আছে।" (পরিশিষ্ট-২)

আজ হইতে ৪০ বৎসর পূর্বে "মরিচঝাঁপির" এই জমির উল্লেখ ও সন্ধান দেন সর্বাগ্রে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, তথা পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদ।

১৯৫৯ সালের ২২ ডিসেম্বর, যোগেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে মনুমেন্ট ময়দানে এক বিরাট উদ্বাস্তু সম্মেলন হয়। সভা শেষে বিরাট মিছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্নার বাসগৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকায় পুলিশ থিয়েটার রোড ও সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে মিছিলের গতিরোধ করে। তখন পুলিশ বেষ্টনীর সামনে মন্ত্রী খান্নার "কুশ পুত্তলিকা" দাহ করা হয়। অতঃপর ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল খান্নার অফিসে গিয়ে ডেপুটি সেক্রেটারির হাতে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় অ-বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র "স্বাধীনতা"-য় এই বিক্ষোভ সমাবেশের যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

বাস্তুহারাদের সভা ও মিছিল
শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার কুশপুত্তলিকা দাহ
(স্বাধীনতার রিপোর্ট)

কলিকাতা, ২২ ডিসেম্বর,

আজ ময়দান হইতে কয়েক সহস্র উদ্বাস্তুর এক শোভাযাত্রা কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীখান্নার পদত্যাগের দাবিতে তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলে থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে চৌরঙ্গীর উপর পুলিশ কর্তৃক গতিরুদ্ধ হয়। উদ্বাস্তুগণ তখন সেখানে শ্রীখান্নার কুশপুত্তলিকা দাহ করেন এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, শ্রীহরিদাস মিত্র প্রমুখের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল একটি স্মারকলিপি সহ শ্রীখান্নার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার একান্ত সচিবের নিকট স্মারকলিপিটি দিয়ে তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করেন।

মিছিলের পূর্বে ময়দানে আহুত এক উদ্বাস্তু সভায় শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার উদ্বাস্তু

স্বার্থ-বিরোধী নীতির নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাঁহার অপসারণ দাবিতে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৭ সালে উদ্বাস্তুদিগের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ করিয়া পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই রাজ্যের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দাবি করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জী, শ্রীহরিদাস মিত্র, এম.এল.এ., অধ্যাপক হরিপদ ভারতী (জনসংঘ) প্রমুখ। (স্বাধীনতা, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯)

উক্ত সম্মেলন সম্পর্কে পি.এস.পি-র মুখপত্র লোকসেবকে ছাপা হয় ঃ কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমেহের চাঁদ খান্নার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও উদ্বাস্তু বিরোধী নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর উদ্বাস্তু ও জনসাধারণ কিভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহা অদ্য ২২ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ১০ সহস্র উদ্বাস্তু ও জনতার জনসভা ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন ও পূর্ব-ভারত বাস্তুহারা সংসদের যুক্ত উদ্যোগে অদ্য বেলা ৩ ঘটিকায় বিরাট উদ্বাস্তু সমাবেশ হয়। সভাশেষে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা পুনর্বাসন মন্ত্রীর আবাসের পথে গিয়া তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

সভায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সভাপতিত্ব করেন। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী হরিদাস মিত্র, এম.এল.এ. প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন। পি.এস.পি. নেতা শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক পি.এস.পি. নেতা শ্রী ধীরেন্দ্র ভৌমিক, জনসংঘ নেতা শ্রী সত্যেন বসু, শ্রীহরিপদ ভারতী, পূর্ব-ভারত বাস্তুহারা সংসদের সম্পাদক শ্রী মনোরঞ্জন বসু, শ্রী সুধাংশু গাঙ্গুলী প্রমুখ বক্তাগণ সভায় বক্তৃতা করেন। (লোক সেবক, ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯)

উদ্বাস্তুদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ কতটা গ্রহণযোগ্য এবং যোগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের প্রতি তাদের কত আস্থা, তার সত্যতা স্বীকার করলেন কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, পি.এস.পি. সহ সকল বামপন্থী সংগঠন। তাই সমাবেশে যোগদানের কথা "স্বাধীনতা" বলেছে কয়েক সহস্র। লোক-সেবক বলেছে ১০ সহস্র।

১৯৬১ সালের ১৬ জুন, বিভিন্ন ক্যাম্পে পুনর্বাসনের দাবিতে অনশন আরম্ভ হয়। ২৬ জুন, বাগজোলা ক্যাম্পে অনশনকারীদের উপর তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনী গুলি চালায়। গুলিতে ৪ জন নিহত সহ অনেকে আহত হন।

জুলাই মাসে যোগেন্দ্রনাথ বাগজোলা ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত সহ নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে পত্র দেন।

পুনর্বাসনের জন্য যোগেন্দ্রনাথ তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সরকারের

ভ্রান্তনীতি, খামখেয়ালী ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন কোন স্থানেই সম্ভব হয় না। পশ্চিমবঙ্গে তো নয়, অপর সকল পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পে আজও হাজার হাজার উদ্বাস্তু অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করছেন।

উদ্বাস্তু সমস্যার মূলে আছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ভ্রান্তনীতি।

বাংলা ভাগের পর থেকে ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে। কিন্তু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের পর এই অবাধ যাতায়াত বন্ধ হয় এবং পাশপোর্ট প্রথা চালু হয়। এই ঘোষণার সাথে সাথে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট নিয়ে পূর্ববঙ্গ হতে উদ্বাস্তুগণ পশ্চিমবঙ্গে আসার সুযোগ পায়। এই সময়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ হিন্দু মাইগ্রেসন সার্টিফিকেট নিয়ে পূর্ববঙ্গ হতে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। সরকারী হিসাবে ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমণের কথা ঘোষিত হলেও বে-সরকারী সংখ্যা তা অপেক্ষা আরও বেশী হবে। কারণ প্রথম অবস্থায় যে সকল উচ্চবর্ণের অবস্থাসম্পন্ন হিন্দু চলে আসেন, তাদের এই ৫০ লক্ষের মধ্যে ধরা হয়নি। এই ৫০ লক্ষের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু তথা নমঃশূদ্র প্রধান। যারা আর্থিক দিক হতে দুর্বল বলে সরকারের উপর নির্ভরশীল। ক্যাম্প কলোনিতে আশ্রয়প্রাপ্তরাই মুখ্য। এই সকল ক্যাম্প ও কলোনিগুলি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে সরকারের খাস জমি ও জমিদারদের পরিত্যক্ত জমিতেই গড়ে ওঠে। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঐ সকল কলোনিগুলিতে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দেওয়ায় ছোট ছোট সভা-সমিতি ও সংস্থার মাধ্যমে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে। এই ধরণের এক কলোনির সমস্যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' নামে উপন্যাসের বিষয়।

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আনীত প্রায় ২ হাজারেরও অধিক কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি ও ভরসা দিয়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে কলকাতার সন্নিকটে বাগজোলা পুনর্বাসন কেন্দ্র নামে ১১টি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা হয় এবং সরকার ঐ অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলের জমিগুলি তখন অথৈ জলে নিমজ্জিত ছিল। বহুকাল যাবৎ সেখানে কোন চাষাবাদ হত না। দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্বাস্তুদের রক্ত জল করা কঠোর পরিশ্রমের ফলে ঐ অঞ্চলে বাগজোলা খাল নামে প্রায় সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন এবং একটি রাস্তা নির্মাণ করে। এই খাল খননের ফলেই ঐ এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার একর অনাবাদী ও জলমগ্ন জমি চাষের উপযোগী হয়। সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে উন্নয়নকৃত ঐ জমিতে বাগজোলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের

উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসন লাভের দাবি ও আশা আকাঙ্খা নিতান্তই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু সরকারের উদাসীনতায়, সরকার যথাসময়ে এই জমিগুলির দখল না নেওয়ায় স্থানীয় বড় বড় জোতদারগুলি ঐসব জমির মালিকানা ও মধ্যস্বত্ব দাবি করবার সুযোগ পায়।

"বাগজোলার জমি উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন" বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠনের দাবি সম্বলিত যুগান্তরের একটি সংবাদ উধৃত করে প্রকৃত ঘটনা আপনাদের গোচরে আনার চেষ্টা করলাম।

সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ উক্ত সংস্থার অপরাপর অনেকের বিবৃতি বলিয়া কথিত ঃ-

"গত ২৬ জুন, রবিবার, সকালে আট ঘটিকা থেকে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত গুলংগুড়ি, ম্যাংরা, সাত্রাগাছি, গুনি, হাতিয়াড়া, কৃষ্ণপুর অঞ্চলের ও বাগজোলার জবর দখলকারী উদ্বাস্তুদের উপর যে সশস্ত্র ও বর্বোরোচিত আক্রমণ হয়েছিল তার নিন্দা করবার ভাষা আমাদের নেই।"

"এইখানকার উদ্বাস্তুদের সমস্যা সরকার যেমন দীর্ঘদিন বুলিয়ে রেখেছেন, তেমনি স্থানীয় জোতদারগন ও কম্যুনিস্ট পার্টি এই সমস্যা সমাধানে তীব্র প্রতিবন্ধকতা করে আসছে। ২৬ তারিখের সুপরিকল্পিত আক্রমণ (৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সহ ৩ জন উদ্বাস্তু ও ১ জন গ্রামবাসী নিহত) স্থানীয় জোতদার ও কম্যুনিস্টদের বহুদিনের উদ্বাস্তু উচ্ছেদ পরিকল্পনার ক্রম পরিণতি। বাগজোলা উদ্বাস্তু শিবির ট্রানজিট বা ওয়ার্কসাইড ক্যাম্প নহে। ইহা পুনর্বাসন শিবির। ১৯৫৪ সালে এই শিবির স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলে উদ্বাস্তুগণকে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ২,২২৪টি উদ্বাস্তু পরিবারকে এইখানে আনা হয়। জমির উদ্ধার সাধনের জন্য উদ্বাস্তুরা ৪ মাইল লম্বা খাল খনন করে। এই অঞ্চলের জমি পতিত ও অনাবাদী ছিল। উদ্বাস্তুদের কায়িক পরিশ্রমে ও সরকারী প্রচেষ্টায় এই জমির উদ্ধার সাধন করা হয়। ১৯৫৫ সালে সরকার একুইজিসন করে উদ্বাস্তুদের জন্য এই জমি গেজেট করে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে জমিগুলি উদ্বাস্তুদের নামে নামে ভাগ করে দেয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম ভাগে সরকার প্রথম কিস্তিতে ৭০৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলে স্থানীয় কম্যুনিস্ট নেতা আবু তাহেরের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক লোক জমির উপর সত্যাগ্রহ করতে আসে। সরকার এই সময় শক্ত হলেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সরকারী আন্তরিকতা থাকলে কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোকের অপচেষ্টাকে সরকার স্তব্ধ করতে পারতেন। (যুগান্তর, ২ জুলাই, ১৯৬০)

১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষ শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে মন্ত্রী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। উক্ত

রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের উপযোগী জমি এ রাজ্যে না থাকায় কমিটি সুপারিশ করে যে "উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জাতীয় সমস্যা জাতীয় পদ্ধতিতে সমাধানের জন্য প্রত্যেক রাজ্যকেই তাদের রাজ্যের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হবে।"

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঃ পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটির সভাপতি ডঃ মেঘনাদ সাহার বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকারের বিরুদ্ধে জমি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশনের অভিযোগ।

কলকাতা, ১৮ই নভেম্বর, পূর্ববঙ্গ রিলিফ কমিটির সভাপতি ডঃ মেঘনাদ সাহা আজ এখানে বলেন যে, কী পরিমাণ জমি পাওয়া যাইতে পারে তৎ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন।

পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের পল্লী-অঞ্চলে পুনর্বাসন সম্পর্কে কমিটি কর্তৃক রচিত এক বিবৃতিতে ডঃ সাহা এক হিসাব দিয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ছয় লক্ষ একর কৃষিযোগ্য ও ত্রিশ লক্ষ একর পতিত জমি, আসামে ১৮ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমি এবং ত্রিপুরায় প্রায় ১৫ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য জমি আছে।

তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দলিলপত্র হতে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই হিসাব রচিত। তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের উদ্বৃত্ত জমি লৌহসিন্দুকে আটকাইয়া রাখার অসম্ভব কাজ করার চেষ্টা বলিয়া অভিযোগ করেন।

বিবৃতিতে কমিটি এই উপসংহারেই উপনীত হন যে, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের বাংলা ভাষাভাষী জেলা কাছাড় ও গোয়ালপাড়ায় পল্লী অঞ্চল হতে ভারতীয় ইউনিয়নে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যথেষ্ট জমি আছে।

পল্লী অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য অসমের অসমীয়া ভাষাভাষী জেলায় প্রচুর জমি আছে। কিন্তু অসম সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্যে ইচ্ছা করিয়া বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। পল্লী এলাকার উদ্বাস্তুগণকে বিহার, ওড়িশা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা অত্যন্ত অন্যায়।

পূর্বাঞ্চলে পল্লী এলাকার যত সংখ্যক উদ্বাস্তুকে কৃষিযোগ্য জমি দিতে হবে, উহার আনুমানিক সংখ্যা স্মারকলিপিতে নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে — পশ্চিমবঙ্গে ১৫ লক্ষ, অসমে (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) আড়াই লক্ষ, কাছাড়ে (সুরমা উপত্যকা) আড়াই লক্ষ এবং ত্রিপুরায় দুই লক্ষ। এই সব উদ্বাস্তুর পল্লী অঞ্চলে বসতের জন্য ১৫ লক্ষ হতে ২০ লক্ষ একর জমির প্রয়োজন বলিয়া স্মারকলিপিতে অনুমান করা হয়।

জমি দখল সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া বিবৃতিতে বলা হয় ঃ জমি সংগ্রহ ব্যাপারে

যে আইনগত অসুবিধা আছে, তাহা আমরা অবগত এবং এই জন্যই আমরা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫০ সালে পরলোকগত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট দেশরক্ষার ভিত্তিতে জমি সংগ্রহের সুপারিশ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। বর্তমান আইন অনুসারে সরকারী উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁরা সংবিধানের ৩১ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সংশোধনটি এ পর্যন্ত অচল হইয়া রহিয়াছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সরকার যদি যথার্থই আগ্রহান্বিত হন তা হলে অবিলম্বে সংশোধনটি চালু হওয়া উচিত।

বাঙলার বাহিরে উদ্বাস্তুদের বসতির কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয় যে, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যে পল্লীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় উদ্বাস্তুদের উপর দোষারোপ করা ছাড়া এই ব্যর্থতার মূল কারণ সম্পর্কে কখনও অনুসন্ধান করেন না। (যুগান্তর, ২০ নভেম্বর, ১৯৫৫)

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব বিরোধী দলই কোন না কোন কারণ দেখিয়ে ভিন্ন রাজ্যে বাঙ্গলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের এই নীতিতে আপত্তি করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালের ৭, ৮ এবং ৯ ডিসেম্বর, রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে "সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের" চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি পর্যালোচনা করলেই প্রকৃত চিত্রটা পরিলক্ষিত হবে। উক্ত সম্মেলনে এই রাজ্যের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব রাখা হয়। আবার ইউ.সি.আর.সি-র মতে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তু পাঠানোর সরকারী প্রয়াস হল" উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর আক্রমণ। মন্ত্রী কমিটি কর্তৃক ভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসনের প্রস্তাব সম্পর্কে ইউ.সি.আর.সি. সিদ্ধান্ত করেন ঃ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ব্যর্থ এই সরকার উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের বিভক্ত ও বিছিন্ন করবার উদ্দেশ্যেই তাদের উপর এই আক্রমণ এনেছেন। (চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব ও দাবি সনদ। পৃঃ ২.)

এই সম্মেলন মনে করে, "পশ্চিমবাংলার মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সুযোগ বর্তমান থাকতে উদ্বাস্তুদের বাংলার বাইরে পাঠাবার কোন যুক্তিই নেই।" (ঐ, পৃঃ ৩)

এই সম্মেলন আর মনে করে যে, "উদ্বাস্তুগণ যেরূপ পরিবেশের সাথে পরিচিত মোটামুটি সেইরূপ পরিবেশের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে যুক্তভাবে নিতে হবে। (ঐ. পৃঃ২)

সম্মেলনে আর এক প্রস্তাবে বলা হয়, "সুন্দরবন অঞ্চলের জলমগ্ন জমি উদ্ধারের সম্ভাবনা বিচারের জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতে হবে। দন্ডকারণ্য পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে।" (ঐ. পৃঃ ৬)

ইউ. সি. আর. সি. — কর্তৃক ১১ আগষ্ট ১৯৫৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেওয়া স্মারকলিপিতে (এ্যান অলটারনেটিভ প্রোপোজাল ইন ওয়েষ্টবেঙ্গল) দেখা যায় ঃ দুই হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সুন্দরবনের হেড়োডাঙ্গা অঞ্চলে এগার হাজার একর জমি উদ্ধারের কর্মসূচী ১৯৫৭ সালের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করলেও ঐ বছরের ১২ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ লোকসভায় শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তীর প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, "কোন প্রকল্পকেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি। সুন্দরবনের একটা অংশের জমি সংস্কারের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন।"

In the Sunderbans area at Herobhanga, a Land Reclamation Scheme is in operation. About 11,000 acres of Land may be reclaimed through this scheme and about 2,000 families may be rehabilitated through it. The initial information of the possibility of this scheme were provided by us a few years back. Later on it was properly formulated and planned by the Govt. of West Bengal and since 1957, this scheme has been given effect. The importance of this scheme lies in the fact that its success will open up new possibilities of many similar scheme in the sunderbans area. But what is happening with the scheme? It is learnt that the scheme has not yet received the approval and the financial sanction from the Govt. of India. But in the meantime many schemes of far inferior type have found their approval and financial sanction outside West Bengal. What does it indicate? The indications are clear from the interest the Central Minister for Rehabilitation takes in such schemes in West Bengal. In his reply to the question of Mrs. Renu Chakrabarty in the Parliament on 12.12.57 in connection with this scheme he said, no scheme has so far been sanctioned. A proposal for reclaiming a part of the Sundarbans is being examined." Even now the Govt. of India have found no time to complete its examination and provide necessary sanction, because lots of other schemes requiring immediate disposal outside West Bengal have perhaps diverted their attention." (ঐ. পৃঃ ১৭)

দাবি সনদে বলা হয়. জীবিকা সংস্থানের প্রশ্নকে পুরো ভাগে রেখে উদ্বাস্তুদের মোটামুটি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্বাস্তুগণ যে পরিবেশের সাথে পরিচিত, পশ্চিমবাংলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবেশ তারই

অনুরূপ। এই অঞ্চলে পুনর্বাসন পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের সম্ভাবনা তাই সর্বাপেক্ষা বেশী। অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এবং উদ্বাস্তুদের শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সদ্ব্যবহার করে এই অঞ্চলে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে উন্মুক্ত করা সম্ভব।" (ঐ. পৃঃ ৫)

পশ্চিমবাংলার পুনর্বাসন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করার প্রথম নম্বর কর্মসূচীতে বলা হয় ঃ "পশ্চিমবাংলার মধ্যে পতিত জমি দ্রুত উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসনের জন্য ২৪ পরগণা জিলার মেছোঘেরীগুলির ১ লক্ষ একর জমি এখনও উন্নয়ন করতে হবে। এই সকল জমি উদ্বাস্তু ও স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। সুন্দরবন অঞ্চলের জলমগ্ন জমি উদ্ধারের সম্ভাবনা বিচারের জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতে হবে।" (ঐ. পৃঃ ৬)

পশ্চিম বাংলায় চাষযোগ্য পতিত জমি সংগ্রহের তালিকায় বলা হয়, "সুন্দরবনের সমুদ্রগর্ভ থেকে জলমগ্ন জমি উদ্ধার দ্বারা ঃ ইঞ্জিনিয়ার কে. বি. রায়ের মতে ৩ হাজার বর্গ মাইল উনিশ লক্ষ একর জমিতে পুনর্বাসন সম্ভব। (ঐ. পৃঃ ১০)

সুন্দরবনের বন ও অকৃষিযোগ্য পতিত জমি এবং কৃষিযোগ্য জমির সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় ১৯৪৪-৪৫ সালে। ইউ.সি.আর.সি. স্মারকলিপিতে বলা হয় ঃ "সুন্দরবনে ১৯৪৪-৪৫ সালে নির্দিষ্ট অকৃষিযোগ্য পতিত জমিকে এখন আর ওই শ্রেণীর জমি বলে গণ্য করা যায় না। প্রয়োজনীয় বাঁধ দিয়ে প্রচুর এলাকা কৃষিযোগ্য জমিতে পরিণত করা যায়। সরকার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুন্দরবনে এগার হাজার একর জমির সংস্কার আরম্ভ করেছেন। একই ভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে চল্লিশ হাজার একর জমি সংস্কার করা সম্ভব।(Again, large area of Land in the Sunderbans area classified as uncultivable waste in the year 1944-45 cannot be placed in that category now. Large areas of Land may be made cultivable by construction of suitable embankments. In fact, a scheme has already been undertaken by the Govt. in the Sunderbans area for development of about 11,000 acres of Land at an approximate cost of Rs. 50 lakhs. Another 40,000 acres of Land may be developed in that area in a similar way within a comparatively short period of 2 to 3 years. Moreover, about 30,000 acres of Land which was turned into fisheries by inundation of paddy land in the district of 24 Parganas was not also regarded as cultivable Waste. These lands may be made readily cultivable. An idea about these lands may be had from the Memorandum of 24 Parganas District Kishan Sabha,

submitted to the Govt. a few years ago. A legislation has been passed recently to reclaim these lands with a view to give land to the original owners. Some land will be available for distribution among refugees even after restoring passession of Land to the original owners.) (ঐ. পৃঃ ২৭-২৮)

সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও জমি সংস্কার করে পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ আশি হাজার একর জমি পাওয়া সম্ভব বলে ইউ. সি. অর. সি. যে তালিকা দেয়, তাতেও "সুন্দরবনের জলমগ্ন জমি উদ্ধারের মাধ্যমে ৫০ হাজার একর জমি পাওয়ার কথা বলা আছে। (ঐ. পৃঃ ২৯)

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু উদ্বাস্তুকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাঠানোর পর অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধিতায় আর পাঠানো যায়নি। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের সকলকেই ১৯৬১ সালে দন্ডকারণ্যে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডোল বন্ধ করে দিলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে অনশন করেন। ১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই, শ্রীজ্যোতি বসু অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের দন্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ-করার জন্য তদানীন্তন রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে চিঠি লেখেন। নিম্নে উক্ত চিঠির বঙ্গানুবাদ।

প্রিয় শ্রীসেন,

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের এক মাসেরও বেশী সময় যাবৎ অনশন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে, দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সরকারী প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বাস্তুরা খুবই অনাগ্রহী। সত্যিকথা বলতে কি ডোল বন্ধ করে দেওয়ার পর অশেষ অসুবিধা এবং অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করলেও উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্য যেতে আরম্ভ করেনি। উদ্বাস্তুরা প্রায় প্রতিটি ক্যাম্পে প্রতিবাদ হিসাবে এক মাসেরও বেশী অনশন ধর্মঘট করেছে। আরও অসুবিধা ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করলেও ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের মনোভাব বদলাবে বলে মনে হয় না। এই জাতীয় কাজের ফল মারাত্মক হতে পারে। ওদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলে, এই উদ্বাস্তুদের পক্ষে নিজেদের উপর নির্ভর করে সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাওয়া খুবই কঠিন হবে এবং এরা রাজ্যের বোঝা হয়ে থাকবে। অবস্থার আরও অবনতি রোধের জন্য ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারী নীতি পুনর্বিবেচনার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রাখা এই মুহূর্তে প্রাথমিক সমস্যা নয়। এদের অবিলম্বে পুনর্বাসন দেওয়া এবং পুনর্বাসন না

হওয়া পর্যন্ত ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রাখাই এখন বিচার্য বিষয়। সরকারের নিকট ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি কঠিন মনে হলেও শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের নিকট গ্রহণযোগ্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা কঠিন বলে আমরা মনে করি না। যেমন, সোনারপুর এলাকার বিভিন্ন শিবিরের উদ্বাস্তুদের হেড়োভাঙ্গা দ্বিতীয় প্রকল্পে পুনর্বাসন সম্ভব। আসরফাবাদ এলাকার শিবিরগুলির উদ্বাস্তুদের সরকারী দখলে আসা পরিত্যক্ত পুনর্বাসন কলোনির জমিতে এবং উদ্বাস্তু পরিবার সমুহের পেশাগত পরিবর্তন মেনে নিলে অশোকনগরে পুনর্বাসন সম্ভব। কুপারস ক্যাম্প তুলে দেওয়া যেতে পারে, যদি সরকার ওটাকে পরিবর্তিত আকারে একটা টাউনশিপ হিসাবে গড়ে তুলতে চান। বর্ধমান জেলার গোপালপুর ও কাকসা শিবিরের উদ্বাস্তুদের একটা অংশকে দুর্গাপুর শিল্প এলাকায় এবং আর একটা অংশকে অন্যত্র জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন শিবিরের উদ্বাস্তুদের গড়বেতা প্রকল্পে পুনর্বাসন দেওয়া যেতে পারে। এই ধরণের উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। পুনর্বাসনের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া বায়নানামা পরিকল্পনা অনুসারে এবং পেশাগত পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়ে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিবিরবাসী সব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের খরচের চেয়ে অনেক কম টাকায় এটা সম্ভব হবে। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুর সংখ্যা আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন পেয়েছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারবার বলছেন যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য এক তিলও জমি নেই, তথাপি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় থাকলে অবশিষ্ট উদ্বাস্তুরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে। এই জাতীয় নীতি গৃহীত হলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে এমন উৎসাহ সঞ্চার হবে যে, তা পুনর্বাসনের ব্যাপারে সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

আমাদের পক্ষ থেকে একথা অনেকবার বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনে আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি চালু হলেও অনেক পরিবার দন্ডকারণ্যে যেতে পারেন এবং আমরা তাঁদের যাওয়ার ব্যাপার কোনো বাধা সৃষ্টি করতে চাই না।

আগের প্যারাগুলিতে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য এই বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুযোগ আছে। আমি অল্পদিনের জন্য বিদেশে যাচ্ছি এবং ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে আমার অনুরোধ আপনি ইউ. সি. আর, সি.-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ জ্যোতি বসু

(নিরঞ্জন হালদার লিখিত, নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি'। পৃঃ ৩৪-৩৫। "সি-পি-এমের উদ্বাস্তু নীতিঃ আগে এবং পরে।" আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২৬ মে, ১৯৭৯।)

মূলচিঠি

(Latter of Shri Jyoti Basu to the State Rehabilitation Minister on the rehabilitation of camp refugees.)

July 13, 1961.

Sri P. C. Sen
Minister, Refugee, Relief & Rehabilitation,
Government of West Bengal

Dear Sri Sen,

Prolonged hunger-strike by the refugees lasting for more than a month in almost all camps in West Bengal has proved beyond doubt strong reluctance on the part of the refugees to accept the proposal of the Goverment regarding their rehabilitation in Dandakaranya. As a matter of fact there has been no movement of refugees to Dandakaranya though they have been put to serious hardships and untold sufferings due to stoppage of doles. For more than a month refugees in almost all the camps have been on hunger-strike to voice their protest. It is unlikely that there will be a change in attitude of camp refugees if they are subjected to further hardships and sufferings. Such experiment is also fraught with serious consequences. Left to their own fate these camps families will hardly be able to rehabilitate themselves properly and will be a burden on the State. I, therefore, urge upon you to reconsider the policy of the Goverment in respect of rehabilitation of camp refugees to prevent further deterioration in the situation.

The primary issues involved now is not continuation of doles to camp refugees for an unlimited period but their early rehabilitation and restoration of doles till that is achieved. We

do not think that the rehabilitation of camp refugees in a manner acceptable to them is so very difficult as is often being suggested by the Government. For example, the families now in Sonarpur group of camps may be easily fitted in Herobhanga Second Scheme. Families now in Asrafabad group of camps may also be absorbed in the camp site which is an abandoned rehabilitation colony, the land of which is already in possession of the Goverment and in Ashoknagar colony if the families are given facility of changing their category. Coopers Camp can be liquidated in its present site if the government implements the present scheme of converting that into a township with some modification. Families now in Gopalpur and Kaksa camps in the District of Burdwan may also be partially absorbed in Durgapur Industrial area and partially in land else where. Families now in the camps in the district of Midnapur may be rehabilitated in Garbeta Scheme. Such illustration may be multiplied. If the refugees are given due facility for rehabilitation through bainanama scheme as well as change of occupational category in addition to the measures suggested above the rehabilitation of all families is now in camps may be completed within a very reasonable period and with much less cost than in places outside West Bengal. The number of such families is now almost half of what it was earlier and many have found rehabilitation in West Bengal although it was stated by the Government that West Bengal has reached a saturation point. I feel, therefore, that the rest may be found rehabilitation here provided there is willingness on the part of the Govt. The enthusiasm that will be generated among the refugees if such a policy is accepted will be no mean an asset for their proper rehabilitation. It is needless to dwell upon the necessity of restoration and continuation of doles during the period prior to their rehabilitation.

It has been made clear from our side times without number that despite the policy set out above for rehabilitation in West Bengal, there may be families who may be willing to go to Dandakaranya and we do not object to their going.

My views on the problem has been briefly outlined in the previous paragraphs. I believe that there is a scope for discussion on the matter for finding a proper solution to it. I am, however, going aborad for a short period, I shall try to meet you later when I come back. But in the meantime I request you to have discussion with the representatives of U.C.R.C., who will seek interview with you.

Yours sincerly
Sd. Jyoti Basu

১৯৬১ সালের এই খোলা চিঠির লেখক রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। আর চিঠি লিখেছিলেন তদানীন্তন রাজ্যের পুনর্বাসনমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে। এই চিঠি লেখার চার বছর আগে ডঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডঃ পবিত্র মোহন রায়, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিদাস মিত্র প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের ১৭মার্চ থেকে ৩৫ দিন ব্যাপী উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে লাগাতার সত্যাগ্রহ করেন। পরে ইউ. সি. আর. সি-ও এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না এবং বাংলার বাইরে যেতে অনিচ্ছুক যে সব উদ্বাস্তুর ডোল বন্ধ করা হয়েছে, তা আবার চালু করা হবে। অল্প খরচে এ রাজ্যেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপার ইউ. সি. আর. সি-র বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বীকার করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে বাধ্য হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীসেনের কিছুই করা সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হলে বিভিন্ন উদ্বাস্তু ক্যাম্পে হিন্দুদের দুরবস্থার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

শ্রীনেহরু জবাবে বলেন, "যদি মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কলকাতার পথে পথে দাঙ্গাও শুরু হয়, তাঁহা হলেও আমরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি বন্ধ করিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। (আন্দবাজার পত্রিকা ঃ ২২ অক্টোবর ১৯৫৯)

এই অবস্থায় বর্তমান লোকসভায় সি. পি. এম. দলের উপনেতা ও তদানীন্তন অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব ইস্ট পাকিস্তান ডিস্‌প্লেসড্ পারসনস্'-এর জেনারেল সেক্রেটারি সমর মুখার্জি এম. এল. এ. ১৯৬১ সালের ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি পাঠান সেই চিঠির বঙ্গানুবাদ নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত "মরিচঝাঁপি"

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এখানে সেই চিঠির বঙ্গানুবাদ ছাপা হল।

রেফারেন্স নং ২৪/৬১ ২৭শে জুলাই, ১৯৬১

প্রেরক শ্রীসমর মুখার্জি, এম. এল. এ
জেনারেল সেক্রেটারি, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল
অব ইষ্ট পাকিস্তান ডিস্‌প্লেসড্ পারসনস্,
৯৩/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

প্রাপক ঃ শ্রীজওহরলাল নেহরু
ভারতের প্রধান মন্ত্রী
নিউ দিল্লি।

বিষয় ঃ ক্যাম্পে বসবাসকারী ইষ্টবেঙ্গল রিফিউজিদের পুনর্বাসন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি শিবিরে কিছু উদ্বাস্তু দীর্ঘদিন যাবৎ অনশন করায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার কালাবনী ও সারাসাঙ্কা ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা গত ৬ জুন থেকে দুটি ব্যাচে অনশন শুরু করে। তারপর এই অনশন প্রতিটি ক্যাম্পে শুরু হয় এবং বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাম্পে একশোর মত উদ্বাস্তু অনশন করছে।

(২) অন্য শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের সমস্যা জটিল হলেও আমরা তাদের সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শিবিরবাসী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে বিলম্ব করা সম্ভব নয় বলেই এখানে তাদের সমস্যাই আলোচনা করতে চাই।

(৩) নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর প্রতিবাদে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে। তাদের উপর নোটিস জারি করা হয়েছে যে, দণ্ডকারণ্যে না গেলে তাদের ৩০ দিনের মধ্যে শিবির ত্যাগ করতে হবে, বরাবরের জন্য ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু এবং শিবির তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা বিলম্বিত করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, এ জাতীয় প্রচারের কোন ভিত্তি নাই। বরং বর্তমান আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সব প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করেছেন বা যে সব প্রকল্পের প্রস্তাব করেছেন, সেগুলির দ্রুত রূপায়ণ এবং বায়নানামা ও পেশাগত সংজ্ঞা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের দ্রুত পুনর্বাসন দাবি।

(৪) উদ্বাস্তুদের এইসব দাবি কেবল বাস্তবসম্মত নয়, অল্প সময়ের মধ্যে রূপায়নও সম্ভব এবং ভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসনের খরচের চেয়ে অনেক কম টাকা লাগবে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই এ কথা প্রমাণ হবে।

(৫) একথা পরিষ্কার জানানো দরকার যে, আমাদের প্রস্তাবিত নীতি গৃহীত

হলেও অনেক পরিবার দণ্ডকারণ্যে যেতে চাইতে পারে। এতে আপত্তি করার কিছু নাই। এ কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান আন্দোলন সামগ্রিকভাবে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের বিরুদ্ধে নয়। উদ্বাস্তুদের ইচ্ছানুসারে পশ্চিমবঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্বেও তাদের জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো উদ্বাস্তুকেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো হবে না।

(৬) জোর জবরদস্তির মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর পদ্ধতি যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ, নোটিস পাওয়া পরিবার সমূহের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ দণ্ডকারণ্যে গিয়েছে। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের বর্তমান নীতি নিয়ে আরও পরীক্ষা করতে গেলে সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান ও মানবতার খাতিরে গোটা সমস্যাটিকে পুনর্বিবেচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

(৭) অবস্থা আরও খারাপ হলে কিছু উদ্বাস্তুর জীবন নষ্ট হবে এবং তারা আরও অনেকে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করবে। এসব এড়ানো ও সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য এ বিষয়ে অবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ সমর মুখার্জী

Letter of Shri Samar Mukherji to the Prime Minister on the rehabilitation of camp refugees.

Ref : No. 24/61 27th July, 1961

From : Shri Samar Mukherji, M.L.A.,
General Secretary, All India Council
of East Pakistan Displaced Persons,
93/1A, Bepin Beheri Ganguli Street,
CALCUTTA-12

To : Shri Jawharlal Nehru,
Prime Minister of India,
NEW DELHI

Sub : Rehabilitaton of East Bengal Refuges
now in Camp.

Sir,

A grave situation has developed due to continued hunger strike by groups of refugees in almost all the camps in West Bengal. The hunger strike was first started by two batches of refugees of Kalabani and Sarasanka camps in the district of Midnapore on 6th June last. Since then it has spread to almost all the camps and at persent there are about 100 refugees on hunger-strike in different camps.

2. We do not propose to deal with the various problems of other sections of refugees which are nonetheless acute. We like to restrict us here only to the problems of camp refugees because their solution brooks no further delay.

3. The hunger strike by the Camp refugees was started as a mark of protest against the measures of the Government to send them to Dandakaranya against their will and under compulsion by service of notice on them with the option of going to Dandakaranya or to quit the camp within a period of 30 days. It is far from truth that the purpose of the present movement is to continue payment of doles eternally and to delay the liquidation of camps. On the contray, the main aspect of the present movement is for the demand of their quick rehabilitation in different schemes started or proposed in West Bengal by the Government and through bainanama scheme together with the facility of changing their occupatonal category.

4. Such demands by refugees are not only realistic but also can be implemented within a very reasonable period and at a cost lower than that for schemes outside West Bengal. This will be borne out by the following illustrations. There are about 1000 families now in Sonarpur group of camps. All these families may be rehabilitated in Herobhanga 2nd scheme which was announced by the Govt. long ago but has not yet been implemented for reasons best know to them. About 600 families of Asrafabad Camp may be rehabilitated at the present site of the Camp which is the site of an unsuccessful rehabilitation Colony as well as in the nearby Ashokenagar Colony where a large number of plots are lying vacant. Coopers

Camp may be liquidated in its present site if the Goverment implements the proposed scheme of converting the camp into a township with some modification. Families now in Gopalpur and Kaksa Camps in the district of Burdwan may be absorbed in Durgapore Industrial area. Families now in the camps of Midnapur District may be rehabilitated in Carbeta Scheme where it was proposed to accommodate 1500 familes. But only 350 families have been sent there uptill now. It will not be out of place to mention that in reply to a memorandum submitted in 1958 the West Bengal Government said that about 13,000 families may be settled on fallow lands in Garbata. Such illustrations may be multiplied without any difficulty. We can dare say that if the refugees are given due facility for rehabilitation through bainanama Scheme together with the facility for change of category in addition to the measures stated above their rehabilitation in a manner acceptable to them will not prove so diffcult as is often suggested by the Govornment. It should also be mentioned here that the West Bengal Government stated in 1959 that of the 39,000 bainanamas executed by the camp refugees 21 thousand Would be implemented. But not more than 50% of those have been implemented. These along with other measures were suggested to the state Government long ago. If these were adopted in time the camps would have been liquidated long ago and the present undesirable situation would noither have arisen nor the question of rehabilitation of camp refugees in Dandakaranya.

5. It should also be made clear that despite such a policy there might be families who may like to go to Dandakaranya. There can be no objection to that. It will thus be clear that the present movement has nothing to do with opposition to Dandakaranya project as a whole. The movement only opposes sending refugees to Dandakaranya ageinst their will when there is sufficient scope for their rehabilitation in West Bengal in a manner desired by them. It should also be mentioned here that the Chief Minister of West Bengal as well as the Governor of the State gave assurances in categorical terms that no refugee will be sent outside West Bengal against his will.

6. It will be seen that the coercive methods adopted by the Government for sending refugees to Dandakaranya have failed in as much as only 5% of families served with notices have gone to Dandakaranya. A stalemate has reached in respect of rehabilitation of camp refugees. Any further experiment with such a policy is fraught with serious consequences. Left to their own fate these camp families will be hardly able to rehabilitate themselves properly and will ultimately be a burden on the meagre resources of the State. A rethinking of the whole question has, therefore, been necessary both for the proper solution of the problem and on human considerations.

7. It is high time that you should intervene immediately into the matter to prevent further deterioration in the situation which will result in loss of life of a few refugees and untold sufferings to many others as well as for a satisfactory solution of the problem.

Yours faithfully
Sd. Samar Mukherjee

চতুর্থ অধ্যায়
উপেক্ষিত যারা

"পূর্ব বাংলার হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে বিহারী মুসলমানদের চাপে নিজেদের ঘর বাড়ি ফেলে ভিড় করলেন পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায়। গান্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী (প্রফুল্ল ঘোষ) নিজে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে এসেও অবস্থার গুরুত্ব বুঝতেই পারলেন না। ভুল করে নেহেরুজীকে বোঝালেন পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু করতে হবে না। ক্যাম্পে রেখে দিলে তারা আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবেন।" (দণ্ডকারণ্যের দুঃখের ইতিহাস, ডাঃ শঙ্কর ঘোষদস্তিদার, অনুশলীন বার্তা)।

"ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোন মুখ্যমন্ত্রী বা বড় নেতা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জন্য কিছুই করেন নি।"

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে লক্ষ লক্ষ অমুসলমান নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের আশায় পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকার এই নবাগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন না। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ছাড়াই ভারত সরকারের সহায়তায় তাদের অন্যায় ভাবে জোর করে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রেলস্টেশন থেকে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মানা উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সকল উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই দলিত, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়।

মধ্য প্রদেশের রায়পুরের কাছে মানা ছিল যুদ্ধের পরিত্যক্ত একটি বিমান ক্ষেত্র। এখানে বাসস্থান, পানীয়জলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কোনরকমে ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাজার হাজার অসহায়, অসুস্থ উদ্বাস্তুকে ডোল দিয়ে মানা শিবিরে আটকে রাখা হলো। অপুষ্টি ও ভাইরাস ইনফেকশনে মানায় শত শত উদ্বাস্তুর মৃত্যু ঘটলো।

জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার সময় পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের বলা হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে গেলে চাষের জমিতে পুনর্বাসন পাবে। অথচ মানা থেকে জমিতে পুনর্বাসন দেবার নাম করে তাদের অনেককেই পাঠানো হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রকল্পে সাধারণ অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে।

মধ্যপ্রদেশের বাইলাডিলা লোহার খনিতে তখন সবে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। জনবসতিহীন অনুর্বর পাহাড়ে দিন মজুর পাওয়া কঠিন ছিল। তাই ভারত সরকারের আদেশে ১৯৬৪ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের মানা শিবির থেকে

পাঠানো হলো বাইলাডিলার লোহার খনিতে দিন মজুর হিসাবে পাথর ভাঙ্গতে।

উদ্বাস্তু কৃষকরা জমিতে পুনর্বাসন চাইলো, পাথর ভাঙ্গতে অস্বীকার করলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত বাঁধলো। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে চাইলেন, তাদের জোর করে আটকে রেখে পাথর ভাঙ্গতে বাধ্য করা হলো।

যে অমানবিক অবস্থায় তাদের রাখা হয়েছিল তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, বাইলাডিলার পাথুরে জমিতে যোগাযোগ বিহীন জঙ্গলের মধ্যে লোকালয় থেকে অনেক দূরে চিকিৎসা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ছাড়াই তাদের ছোট ছোট তাঁবুতে প্রায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কৃষি জমিতে পুনর্বাসন দেবার নাম করে নিয়ে এসে তাদের বলা হলো পাথর ভাঙ্গতে, যা তারা জীবনে কোনদিন করেন নি।

সরকারী কর্মচারীরা বোঝে না বাংলা আর পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা জানে না হিন্দি। পূর্ব পুরুষের ধর্ম বাঁচাতে গিয়ে তাঁরা যে এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়বেন তা পূর্ব পাকিস্তানের নমঃশূদ্র চাষীরা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাই তারা কর্তৃপক্ষের সব বাধা উপেক্ষা করে মুক্তির আশায় আবার পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যেতে লাগলেন।

মালকানগিরি থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দক্ষিণে গভীর জঙ্গলের মধ্যে শবরী নদীর পূর্ব পারে পড়িয়া। চারদিকে ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের দুর্ভেদ্য ঘন বন ঘেরা। এখান থেকে দুশো মাইল না গেলে কোন শহর পাবেন না। তিনশো মাইল দুরে রেল স্টেশন।

১৯৬৪ মে মাসের প্রথম দিকে জনবসতিহীন জঙ্গলের মধ্যে দশ মাইল লম্বা পাঁচ মাইল চওড়া স্থানে ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে পড়িয়ায় চারটি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। তার মাত্র কদিন পর ৮ মে মানা থেকে দশ হাজার পরিশ্রান্ত, অসুস্থ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের জগদলপুর শুক্‌মা হয়ে শবরী নদী পার করে এই পড়িয়া ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো।

ভাইরাস ইনফেকশন মহামারী আকারে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। পথে ও ক্যাম্পে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটলো। এখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে উদ্বাস্তুরা ভয় পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন।

দণ্ডকারণ্যে শ্রমিক পাওয়া খুব কঠিন ছিল। ইংরাজরা জোর করে আদিবাসীদের ধরে কুলি হিসাবে বাইরে চালান দিত। কোরাপুটে তাদের কুলি চালান দেবার অফিস ছিল। তাই আদিবাসীরা ভয়ে সভ্য মানুষের কাছে আসতেন না। দণ্ডকারণ্য প্রজেকটের বিভিন্ন ক্যাম্পে, গ্রামে অনেক নিঃস্ব অভাবী বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আসায় দণ্ডকারণ্যের অনেক স্থানেই সাধারণ শ্রমিক পাওয়া সহজ হলো।

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু কলোনী থেকে অনেক দূরে কোরাপুট শহরের কাছে ভিজিয়ানা গ্রাম রাস্তায় পাহাড়ে ঘেরা বনের মধ্যে সোনাবেদায় বিমান তৈরির কারখানা হবে বলে ঠিক হলো, উন্নয়ন কাজের জন্য সাধারণ শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠলো, তাই ওড়িশা সরকারের অনুরোধে ভারত সরকারের নির্দেশে সাধারণ দিন মজুরের

হিসাবে পাথর ভাঙ্গতে, বন পরিষ্কার করতে, রাস্তা বানাতে, অন্যান্য সাধারণ কাজ করতে মানা উদ্বাস্তু শিবির থেকে নবাগত পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সোনাবেদা ক্যাম্পে পাঠানো হলো।

সোনাবেদায় উদ্বাস্তুরা বুঝলেন তাদের বঞ্চনা করা হয়েছে। দণ্ডকারণ্যে কৃষি জমিতে পুনর্বাসন দেবার নাম করে অন্যান্য উদ্বাস্তুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন মজুরের কাজ করতে তাদের এখানে আনা হয়েছে। একবার এই অন্যায় মেনে নিলে তারা আর কোন দিন কৃষি জমিতে পুনর্বাসন পাবেন না। তারা পাথর ভাঙ্গতে অস্বীকার করলেন, কলকাতায় দেওয়া আশ্বাস মত কৃষি জমিতে পুনর্বাসন চাইলেন। অসহায় উদ্বাস্তুরা কোন দিক থেকে কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না, কারও কাছ থেকে সামান্য একটু সহানুভূতিও তারা পেলেন না।

বাধ্য হয়ে সোনাবেদার ক্যাম্পগুলো খালি করে ১৯৬৪ সালের ২৮ মে, সোনাবেদা ক্যাম্প ছেড়ে উদ্বাস্তুরা ভিজিয়ানাগ্রাম স্টেশনে পৌঁছে হাওড়া যাবার ট্রেন আসতেই সোনাবেদার পলাতক উদ্বাস্তুরা ট্রেনে উঠে পশ্চিমবঙ্গের দিকে রওনা দিলেন। ("অবাঞ্ছিত উদ্বাস্তু" ডাঃ শঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, অনুশীলন বার্তা)।

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পায় নি

ডা. শঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

"পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বামপন্থীরা বাধা দিয়েছিলেন। ক্ষমতা হাতে পাবার পর তাদের উপদেশ মত যারা দণ্ডকারণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন তাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার মরিচঝাঁপি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব উদ্বাস্তুরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল তা পশ্চিমবঙ্গে কোন নেতা বা দল জানার চেষ্টাও করেনি।

অত্যন্ত দুঃখের কথা মানা (রায়পুর) উদ্বাস্তু শিবির থেকে পূর্ব বাংলার অসহায়, নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের কত জনকে কোথায় পাঠানো হয়েছিল তার ঠিক হিসাব বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতে পারবে না।

মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য বহুস্থানে উদ্বাস্তুদের পাঠান হয়েছিল। তারা সেখানে কেমন আছে, তা জানার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নেতা বা দল সেই সব স্থানে কোন দিন যাননি।

অত্যন্ত পরিতাপের কথা দণ্ডকারণ্য ছাড়া আর কোথাও বসবাসকারী পূর্ব

পাকিস্তানের বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি। এই সব বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা যাতে ভারতীয় নাগরিকত্ব পায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন চেষ্টাই করেনি। অনেক চেষ্টা করেও অনেক পুনর্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তুরা প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট আদায় করতে পারেনি। (বিপ্লবী বাংলা)

(নিবন্ধ লেখক ডাঃ শঙ্কর ঘোষ দন্ডিদার দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ও অন্যান্য শরনার্থী শিবিরে অনেক বৎসর চিকিৎসক ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এই নিবন্ধ লেখা)।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে আগমন

১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মানার বিভিন্ন শিবিরের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হয় না। সেই সকল উদ্বাস্তুদের সহিত ইউ. সি. আর. সি-র মাধ্যমে সি. পি. এম. এবং মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারাই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মানার শহীদভাটা উদ্বাস্তু শিবিরে সি. আর. পি-র গুলিতে তিনজন প্রাণ দেয়। আহত হয় ১২ জন, ইউ. সি. আর. সি-র সাধারণ সম্পাদক সমর মুখার্জী (এম. পি.) ইউ. সি. আর. সি-র নেতা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, ৬ এবং ৭ নভেম্বর, মানা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সমর মুখার্জী প্রমুখ আরও দুটি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে নিয়ে পৃথক সভা করেন। কুড়ি হাজার মানুষের উপস্থিতিতে একটা কেন্দ্রীয় জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, তাছাড়া সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল এবং কালীপদ বসু বক্তৃতা করেন। প্রধান বক্তা সমর মুখার্জী উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। ইউ. সি. আর. সি. নেতাদের মানা ক্যাম্প সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে, সমর মুখার্জী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী খাদিলকরকে এক পত্র লেখেন। পত্রে বলা হয়, পুনর্বাসন প্রশ্নটি আমরা সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা পুনর্বাসনে প্রস্তুত। কিন্তু জমির গুণাগুণ, সেচ ব্যবস্থার সুবিধা, আবহাওয়া সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষেই তাঁরা সন্দিগ্ধ। কারণ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পুনর্বাসনের এসব সুবিধা মেলেনি। ফলে পুনর্বাসনের পর উদ্বাস্তুরা ব্যাপকহারে চলে এসেছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁরা চান না। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসন পাওয়ার তাদের একান্ত ইচ্ছা। (পথ সংকেত, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃঃ ৭৩)

শ্রীজ্যোতি বসু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী ভিলাইতে সভা করতে যান। তিনি খবর দিয়ে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার, রাইহরণ বাড়ৈ, কালী বসু প্রমুখ নেতাদের ভিলাইতে আনিয়ে বলেন—সি.পি. এম ক্ষমতার এলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাবেন। সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি অবশ্যই পুরণ করব। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে কুরুদ ক্যাম্পে গুলি চলে। সি. আর. পি. এক রাত্রে শিবির থেকে এক যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে একাধিক ব্যক্তির বলাৎকারের পর ভোরে ফেরৎ দিয়ে যায়। উদ্বাস্তুরা দলবদ্ধভাবে পশ্চিম বাংলা তথা কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ২৬ জুন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় তাঁদের শ্লোগান ছাপা হয়। "চল কলকাতা, চল সুন্দরবন।" রায়পুরে পাওয়া এক হ্যাণ্ডবিলে লেখা ছিল," মানা

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রতিনিধি দল মে মাসে হাসনাবাদ থেকে লন্‌চে করে গোসাবা থানার মরিচচকে যান। ১২৫ বর্গ মাইল বিরাট চরের বিপরীত দিকে একশো বছরের পুরানো একটা গ্রাম আছে। সেখানকার মানুষ তাদের বলেছেন, এখানে ৫ ফুটের বেশী উঁচু জোয়ার আসে না। আমরা যদি ৫ফুট উঁচু বাধ দিয়ে নোনা জল ঠেকিয়ে ১০০ বছর ধরে চাষ করতে পারি তোমরা পারবেনা কেন? .... ওখানে মাছ ধরারও সুযোগ আছে। এখানেই ১৬ হাজার পরিবার অর্থাৎ মানার সব লোকের পুনর্বাসন সম্ভব। এই সুন্দরবনের দত্ত পাসুরেও আরও ৩০ হাজারের পুনর্বাসন সম্ভব। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ জুন ১৯৭৫)

এদিকে কলকাতার খবর, রাজ্যের বিরোধী নেতারা বিভিন্ন রাজ্যের এম. পি. দের নিয়ে চলতি মাসের শেষে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাদিলকরের কাছে একটা ডেপুটেশনে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধি দলে ত্রিদিব চৌধুরী, জ্যোতি বসু, জ্যোতির্ময় বসু, সমর গুহ, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী ও মহারাষ্ট্রের ফরোওয়ার্ড ব্লকের এম. পি. শ্রীধৌতে থাকছেন।

এই প্রতিনিধি দল দাবি করবেন যে, এখনও পূর্ববঙ্গাগত যে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা হয়নি, তাদের পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২জুন ১৯৭৫)

"১৯৭৫ সালে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার মধ্যপ্রদেশ সরকারকে অনুরোধ করেন, উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসন অসম্ভব।"

"দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুরা সেদিন বলেছিল "নেতা বললেও এখন শুনবো না। বাংলায় আমরা যাবোই। এখানে সি. আর. পি-র হাতে মরার থেকে না হয় সুন্দরবনে বাঘের পেটেই যাব। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন ১৯৭৫)

১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে সি. পি. এম. নেতা সমর মুখার্জী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী খাদিলকরকে লিখেছিলেন—"পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসন পাওয়ার তাদের একান্ত ইচ্ছা।"

ক্রমে সেই নীতির পরিবর্তন হতে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মরিচঝাঁপি ও সি. পি. এমের রাজনীতি

১৯৭৭ সালের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি ইউ. সি. আর. সি-র শাখায় পরিণত হতে চায়নি। উপরন্তু উদ্বাস্তু নেতারা সি.পি.এম.-এ যোগদানে রাজী হয়নি। কারণ তাঁদের মতে উদ্বাস্তু সমস্যা জাতীয় সমস্যা। ফলে উদ্বাস্তুরা কোন একটা বিশেষ দলের লেজুড় হলে, উদ্বাস্তু সমস্যা দলের সমস্যায় পরিণত হতে পারে। (পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি মরিচঝাঁপির বাঙালী উদ্বাস্তুর করুণ আবেদন—রাইহরণ বাড়ৈ) পরিশিষ্ট-৩ নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত মরিচঝাঁপি। পৃঃ ৪২)। ১৯৭৫ সালের ২১ জুন কলিকাতায় জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "তাদের (উদ্বাস্তুদের) পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।" কিন্তু ১৯৭৮ সালে সেই জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসেই উল্টো গান গাইতে শুরু করেন। (নিরঞ্জন হালদার ঃ সি-পি-এমের উদ্বাস্তু নীতি আগে ও পরে। ঐ মরিচঝাঁপি। পৃঃ ৩৩-৪৩)। ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে দণ্ডকারণ্য বিশেষ করে ওড়িশার মালকানগিরি এলাকা থেকে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন রেল স্টেশন পুলিশ পাহারা এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাবড়া, বারাসাত, বালি ব্রিজ হয়ে তারা হাসনাবাদ পৌছান। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা যখন লাখ খানেকের মত হল, তখন সি.পি.এম নেতারা কেবল ওদের ফেরৎ পাঠাতেই ব্যস্ত হলেন না, উদ্বাস্তুদের চক্রান্ত করে পশ্চিমবঙ্গে আনা হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করেন। সেবা সংস্থাগুলিকে সেবামুলক কাজ বা রিলিফ না দিতে দিয়ে কিছু উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। বামফ্রন্ট সরকার বলতে লাগলেন পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার চাপ এত বেশী, যে এখানে দণ্ডকারণ্যের একজন উদ্বাস্তুরও পুনর্বাসন সম্ভব নয়। সি. পি. এম-র পক্ষ থেকে বলা হয়, তাঁরা আগে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ের অবস্থা আর এখনকার অবস্থা এক নয়। তাই জ্যোতি বসু যে কোন মূল্যে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠানই ঠিক করেন। উদ্বাস্তুরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অন্যত্র থাকতে চাননি। ইউ. সি. আর. সি এবং সি. পি. এম. বারবার সুন্দরবনের যে সব এলাকায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি করে এসেছিলেন, সেই সব এলাকায়

যেখানে এখনোও লোক বসানো হয়নি —তাঁরা সেইখানেই বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "মরিচঝাঁপি" এই রকমই একটা জায়গা।

১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল, দশ-হাজার উদ্বাস্তু পরিবার কুমিরমারী পার হয়ে 'মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেয়। এই সকল উদ্বাস্তুদের একমাত্র দাবি, আমরা সরকারের নিকট কোন প্রকার সাহায্য চাইনা। শুধু আমাদের দাবি, আমাদের মরিচঝাঁপিতে ভারতের নাগরিক হিসাবে থাকতে দাও। কিন্তু এই সব অবাধ্য বিশ্বাসঘাতক উদ্বাস্তুদের কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গে স্থান হবে না। এদের অপরাধ সি. পি. এম নেতাদের উদ্দেশ্য বাদ সেধেছে এই সব অবাধ্য উদ্বাস্তুর দল। তাই এরা গণতন্ত্র ধ্বংসকারী, এরা বিশ্বাসঘাতক, এরা স্বড়যন্ত্রকারী। কী সেই উদ্দেশ্য?

ত্রিপুরা ও আসামের বিধানসভা নির্বাচনের পর সি.পি.এম. নেতৃত্ব ভেবেছিল, অন্যান্য রাজ্যের বাঙালীদের সাহায্যে ঐ সব রাজ্যে তাঁরা তাঁদের দলীয় সংগঠন গড়ে তুলবেন। সম্ভবত দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ভোটে মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা বিধান সভায় সি.পি.এম. কয়েকটি আসন দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি ইউ. সি. আর. সি.-তে বা সি.পি.এম-এ যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তাতেই এই সর্বহারা নেতাদের গোসা হয়। সর্বহারা-নীতি হয়ে উঠলো তাদের পরিচালনায় সর্বনাশা বা বিনাশকারী।

সি.পি.এম. যখন পশ্চিমবঙ্গে ভয় দেখিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সরকার চালাচ্ছে, তখন সি.পি.এম. নেতারা তাঁদের ইচ্ছা-অগ্রাহ্যকারীদের পশ্চিমবঙ্গে কোথাও দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে দেবে কেন?

মরিচঝাঁপিতে সেজন্য তাঁরা উদ্বাস্তুদের থাকতে দেবেনা। সুন্দরবনের লোকদের যখন ভয় দেখিয়ে সি.পি.এম. তাঁদের দলে টানতে চেষ্টা করছে, সে সময় সি.পি.এম.-এর চোখরাঙ্গানী-অগ্রাহ্য করা উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে থাকতে দিলে, এলাকার লক্ষ লক্ষ লোক সি. পি. এম. বিরোধিতার সাহস ফিরে পাবে। এ ছাড়া যখন সি.পি.এম. প্রচার চালছে যে, তাঁরাই একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের বন্ধু, তাঁরাই পারে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গবাসী লোকদের ভাগ্য নির্ধারক। এই মত প্রচারের সময় সরকারী সাহায্য ও বিনা আনুকুল্যে মরিচঝাঁপিতে একদল লোক স্বাবলম্বী হচ্ছে দেখলে সুন্দরবনের মানুষ কি সি.পি.এম.-এর প্রতি অনুগত থাকবে? এ প্রসঙ্গে এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও মনে রাখা দরকার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্দেশখালির ১৪টি গ্রামে-পঞ্চায়েতের ১২টিতে আর. এস. পি-র এক চেটিয়া কর্তৃত্ব। মরিচঝাঁপির পাশের দ্বীপ কুমিরমারী গ্রাম-পঞ্চায়েতে উদ্বাস্তুদের থাকতে দিলে সি.পি.এম. এই এলাকায় আগামী এক দশক পর্যন্ত কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা। যাঁরা সি.পি.এম. শাসনে গ্রাম বাংলা বিশেষ করে সুন্দরবনের এই এলাকার পরিস্থিতি জানেন না, তাঁরা মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বসবাসের

ব্যাপারে আপত্তির প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সি. পি. আই (এম) এর রাজ্য কমিটী রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান "দণ্ডকারণ্যের যে সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তাদের প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে দিন।" কমিটির তিন দিন অধিবেশনের পর দলের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন, "ওইসব উদ্বাস্তুদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা। ২ জুলাই, ১৯৭৮)। কী ধরণের বলপ্রয়োগ হয়েছে, শ্রীশৈবাল গুপ্ত তার কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন ঃ "তাঁরা যে নিজেরা কোনো সাহায্য করেননি শুধু তাই নয়। ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি সে সব বেসরকারী সংস্থা সাহায্য বিতরণ করেছিল, তাদেরও চলে যেতে বাধ্য করলেন। সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুরা মাছ ধরে বা কাঠের জিনিস তৈরি করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে জীবিকার সংস্থান করছিল, তাও বন্ধ করলেন। ভেড়ি কেটে পুলিশ ও বনবিভাগের লঞ্চ লেলিয়ে মাছের নৌকো ভেঙ্গে দিয়ে। তাতে যে প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, সে সম্বন্ধে তারা নির্বিকার। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেইসব লঞ্চ চালিয়ে উদ্বাস্তুদের রসদ জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই করা ২০০টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল।" (শৈবাল গুপ্ত ঃ মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা? নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত মরিচঝাঁপি। পৃঃ ২৬-২৭।)

বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দ্বীপ ব্লকেড করেন। পানীয় জল, খাদ্য, ওষুধ, পাউরুটি তৈরির কারখানা, বিড়ি কারখানার মালপত্র সবই কুমিরমারী ও অন্যদ্বীপ থেকে যেত। মরিচঝাঁপি দ্বীপে কুমিরমারী থেকে খাদ্য ও পানীয় জল বন্ধ করে সরকার উদ্বাস্তুদের অনাহারে এবং অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ছাপা হয়েছে পরিশিষ্ট-৩ (খ থেকে দ)। ব্লকেডের সময় কী ভাবে অগ্নিযুগের বীণা দাশ ও কমলা বসু মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন, তার বিবরণ ছাপা হয়েছে কমলা বসুর রচনায় (পরিশিষ্ট-১)

মরিচঝাঁপির ব্লকেডের সময় কংগ্রেসের শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুনীতি চট্টরাজ, অরুণ মৈত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ১০/১২ জনের একটি দল মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা যেতে পারেন নি। সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ডিরেক্টর শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের ঐ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যুগান্তর পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট ছাপা হয় যুগান্তর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় (২০ ফাল্গুন ১৩৮৪)। নিচে রিপোর্টটা হুবহু ছাপা হল ঃ

মরিচঝাপির উদ্বাস্তুরা এখন ১ নম্বর মহলে

ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেকটর শ্রী কল্যাণ চক্রবর্ত্তী, মরিচঝাপিতে গমনোদ্যত শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, শ্রী সুনীতি চট্টরাজ, অরুণ মৈত্র, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ১০/১২ জনের একটি দলের কাছে, উপরিলিখিত শিরোনামায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্য নয়। ঝিলে কম্পার্টমেন্টের ১ নং হতে ৬ নং পর্য্যন্ত (দত্ত অফিস) উদ্বাস্তুরা যে ঘরগুলি তৈরী করেছিলেন তার সংখ্যা কোনক্রমেই ১০০০ হাজারের কম নয়। তা ছাড়া ঘরগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ঘরগুলির অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে ১০০/১৫০ হাত, প্রস্তে ১২/১৪ হাত ঘরগুলি শুধু ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি পুড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার, লাঠি পেটা, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ লুঠতরাজের মাধ্যমে ১০/১৫ দিন ধরে অনবরত সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শন করেও উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি। এখনও উদ্বাস্তুরা তাদের নিজ নিজ প্লটে ভেড়ি ও মাছের ঘেরী রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত আছেন। উদ্বাস্তুরা সুদীর্ঘ দিন ধরে গায়ের রক্ত জল করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এত সহজে তাদের প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আজ প্রায় ৯/১০ মাস ধরে বর্ষা বাদলের মাঝদিয়ে সর্প ও ব্যঘ্র সঙ্কুল জঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। যে জায়গা এখন তাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়, এত সহজে সে স্থান তারা ত্যাগ করতে পারেনা। শ্রী চক্রবর্তী দেওয়ানি কার্য্যবিধি হিসাবে বেদখল করাবার জন্য উদ্বাস্তুদের সব কম্পার্টমেন্ট থেকে উচ্ছেদ করে ১ নং মহলে জড় করবার ফন্দি, বেদখল করার কুমতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্বাস্তুরা এখন সব কম্পার্টমেন্টেই বসবাস করছে। দখলি-স্বত্ব অধিকার সংরক্ষণের জন্য উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ কাজ কর্ম স্বাভাবিক ভাবে করে যাচ্ছে। ধ্বংস প্রাপ্ত ৫৫০ ঘর বাদে বাকি ঘরে এখনও উদ্বাস্তুরা তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে না পারলেও তারা স্থান ত্যাগ করে আসতে কেহই রাজী নন। ঘর মেরামত, নূতন ঘর স্থাপন, ভেড়ী ও বাঁধ তৈরী কাজে নিযুক্ত থেকে সব বিষয়ে দেখাশুনা করে চলছে। শুধু তদন্ত ব্যতিরেকে সঠিক তত্ত্ব নিরুপণ করা সম্ভব নয়, তা ছাড়া বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার পক্ষ সত্য কথা বলতে আদৌ অভ্যস্ত নয়। প্রমাণস্বরূপ ১০০০ এক হাজারের জায়গায় ৫৫০ খানি ঘরের কথা, পোড়াবার কথা বাদ দিয়ে শুধু ভেঙ্গে দেওয়ার কথা স্বীকার করা হচ্ছে। লুঠতরাজ, সোনা দানা পিতল কাসা নগদ টাকা ছিনতাই, সুটকেস, ট্রাঙ্ক, বাক্স ভেঙ্গে চুরমার করে ভাল জামা কাপড় সুট প্যান্ট অপহরণ, যুবতী মেয়েদের শীলতা হানি, তাদের সাথে অপমানসূচক ব্যবহারের কথা চক্রবর্তী আদৌ স্বীকার করেন নি। অথচ শ্রীচক্রবর্তী এই সব করুণ-নাটকের মূখ্য নায়ক। তিনি মানুষের চেয়ে বাঘকে বেশী ভালবাসেন। আদালতে অভিযোগসূত্রে সুন্দরবনে স্থানীয় নিরীহ মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার করেও

কল্যাণবাবুর পুনর্চাকরী বহাল, উদ্বাস্তু ভাগ্যাকাশে রাহুগ্রহের উদয় ছাড়া আর কী হতে পারে।

মরিচঝাঁপি এলাকা তো মূল সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে দুইটি বড় বড় নদী, ঝিলে ও গাড়াল নদীর সংযোগ ছাড়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তিনদিকেই নদীর অপর পারেই ঘন লোক বসতি, শুধুমাত্র একদিকেই ঝিলে নদীর অপর পারে খোলা জায়গা মরিচঝাঁপি বন সম্পদ রহিত সম্পূর্ণ মনুষ্যবাস উপোযোগী স্থান। কল্যাণবাবুই উদ্বাস্তুদের বাঁচাতে পারতেন যদি কোন না কোন বিবেক সম্পন্ন হৃদয়ের সাথে তার পরিচয় থাকতো, অথবা উদ্বাস্তুরা যদি তপশীলভুক্ত জাতি না হয়ে বর্ণহিন্দু শ্রেণী হয়ে আসতো।

স্বাধীনতার বলি এই সব নিরীহ-নিরন্ন মানুষের ঘর দোর ভেঙ্গে দেওয়া, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া, তাদের উপর লাঠিমারা, গ্রেপ্তার করা এবং নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ চালান, যে কতখানি হেয় হৃদয়হীন নীচবংশ সম্ভুত মানুষের পক্ষে সম্ভব, কল্যাণবাবু হয়তো নিজে এ কথা ভেবে দেখেননি। ক্ষয় ক্ষতির অঙ্কটাকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার কাছাকাছি দাড়িয়েছে, সে কথাও উপলব্ধি করতে পারেন নি। এর সঙ্গে খাল কাটা বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষতিপূরণ ধরলে ১০ লক্ষ টাকারও অধিক হবে।

যেহেতু বসু-সরকারের পরম-করুণায় তিনি তার চাকরীতে পুনর্বহাল হয়েছেন, জ্যোতিবাবুর কথা তাকে মেনে চলতেই হবে। সে কথা যতই অন্যায়, নিষ্ঠুর বিবেকহীনতার পরিচয় হোক না কেন?" একথা তিনি অনেকের কাছেই স্বীকার করেছেন। জাতি ও নামের বিপরীত সমন্বয় একমাত্র কল্যাণ বাবুতে সম্ভব হয়েছে।

জাতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষমার অবতার,
নামেতে কল্যাণ শুভ চিহ্ন আর
তপশীল জাতির পরে একি দুর্ব্যবহার
দারুণ অপমান, পবিত্র লাল ঝাণ্ডার।

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ৫/৩/৭৯

(যুগান্তর—২০ ফাল্গুন, ১৩৮৬)

কুমিরমারী দ্বীপে ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পুলিশ গুলি চালনার পর মরিচঝাঁপির দুই যুবক সফল হালদার এবং তাঁর সঙ্গী নদী সাঁতরে কুমিরমারী হয়ে কলকাতা চলে আসেন। কলকাতা হাইকোর্টে মরিচঝাঁপি ঘিরে ১৪৪ ধারা জারির বিরোধিতা করে হাইকোর্টে কেস করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট ১৪৪ ধারা বাতিল করে দ্বীপবাসীদের পানীয় জল ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না করার আদেশ

দেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই আদেশের প্রতি কর্ণপাত করেননি। বে-আইনি ভাবে বাজেয়াপ্ত করা চাল ও অন্যান্য দ্রব্য নৌকো ফেরত দেওয়া এবং ধৃতদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করেননি। এই সময়ে দৈনিক 'কালান্তর' এবং সুশীল ঘোষ সম্পাদিত 'জননী' পত্রিকা ছাড়া অন্য বাংলা দৈনিকগুলি কোন খবরই ছাপেনি। হাইকোর্টের রায়ের দিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মরিচঝাঁপিতে সরকারী নীতির প্রতিবাদে এক জনসভা হয়। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঐ জন সভায় সভাপতিত্ব এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিরঞ্জন হালদার বক্তৃতা করেন। কিন্তু যুগান্তরে ৫ লাইনের একটি খবরে ছাপে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জনসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

বামপন্থীদের সি. পি. আই. এর মুখপত্র "কালান্তর" পত্রিকায় "চার ভাঁটার পথ ঃ নিষিদ্ধ দ্বীপ" এই শিরোনামায় দিলীপ চক্রবর্তী ধারাবাহিক ভাবে যে সংবাদ পরিবেশন করেন ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, তা থেকে পাঠক জানতে পারবেন মরিচঝাঁপির অবস্থান, উদ্বাস্তুদের পরিচয়। জ্যোতি বসু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের প্রয়াস। এই নিবন্ধ থেকে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল।

"চার ভাঁটার পথ, নিষিদ্ধ দ্বীপ (১)

"যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি। অথবা শত্রু দেশের সীমানায়। মাঠে মাঠে সশস্ত্র পুলিশের ছাউনী, পুলিস চাইলেই আপনাকে হাত উঁচু করে হাঁটতে হবে। খানাতল্লাসী করবে। ক্যাম্পে নিয়ে আটক করবে। জেরা করবে। অথচ জায়গাটি সরকার ঘোষিত বনাঞ্চল নয়। এই জায়গার নাম কুমিরমারী। মরিচঝাঁপির লাগোয়া এক জনবহুল দ্বীপ।

"লঞ্চে কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে কুমিরমারী রায়মঙ্গল নদীর ঘাট, হাটখোলাতে যখন এসেছি তখন সন্ধ্যা। এটি দ্বীপের একপ্রান্ত। দ্বীপের অপর প্রান্তে যেতে এক ঘণ্টার বেশি সময় হাঁটতে হয়। এরপর ঝিল নদীর ওপারে হলো মরিচঝাঁপি দ্বীপ।

"মাঠে নেমে সঙ্গী বললেন, দাদা পোশাকটা বদলে নিন, লঞ্চ থেকেই পুলিশ লেগেছে। আর এই রাস্তাতেও পুলিশ আছে। আপনাকে দেখলে যেতে দেবে না।

—"কেন? এটা তো নিষিদ্ধ এলাকা নয়। সরকার ঘোষিত বনাঞ্চল নয়।" আমি বললাম। "ওটা আপনাদের কলকাতা শহরে খাতায় পত্রে আছে। এখানকার পুলিশের আইন আলাদা। আপনাকে যদি কুমিরমারীর অন্যপ্রান্তে যেতে হয় তাহলে পুলিশের চোখ এড়িয়েই যেতে হবে।"

'ঝিলার পারে যখন এসেছি তখন সন্ধ্যা ৭টা। দূর থেকেই মোটর লঞ্চের শব্দ। নদীতে পুলিশ লঞ্চের তল্লাসী আলো। আর মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, "বন্ধুগণ,

একদল দুষ্কৃতিকারী, সমাজবিরোধী আর বাইরের লোক আপনাদের এই দ্বীপে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে, ওরা আপনাদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারছে না। এমনকি অত্যাচারও করছে। সরকার আপনাদের খাদ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করেছে। আপনারা দন্ডকে যেতে চাইলে বাগনায় সরকারী ত্রাণ শিবিরে আসুন... ইত্যাদি।'

"মরিচঝাঁপি দ্বীপকে রাজ্য সরকার অবরুদ্ধ করেছিল ২৪ জানুয়ারি থেকে। কিন্তু হাইকোর্টের ইনজাংশনের ফলে ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা টানা নৌকায় একটি পথে এপারে আসতে পারেন খাদ্য ও জলের জন্য। এই টানা নৌকা যেখানে এসে লাগে সেখানেও সশস্ত্র পুলিশের ছাউনি। প্রতিটি যাত্রীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু এই দিকের মানুষ ওপারে যেতে পারেন না কিংবা ওপারের মানুষ কোন দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এপারে আসতে পারেন না। আমি যখন পৌঁছাই..... হঠাৎ জোরালো আলো এসে পড়লো সঙ্গীদের মুখে। অন্ধকারে আমি সরে গেলাম। আমার সঙ্গী অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি অঞ্চলের নেতা শ্রীনিবাস মণ্ডল আর নীহার মির্ধা। পুলিশ হাঁক দিয়ে বললো, কে যায়? আপনারা কোথাকার লোক? —এপারের। —জানেন না এই রাস্তায় এখন চলাফেরা করা বারণ। এই রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন না। অগত্যা ধানক্ষেত দিয়ে হাঁটতে হলো। আমরা সরকারী অনুমতি নিয়ে ওপারে যেতে চাই। সূর্যের আলো না উঠলে পুলিশ ক্যাম্পে যাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত সঙ্গীরা জনৈক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ি যাওয়া ঠিক করলেন।

ঐ বাড়িতে গিয়ে দেখি গৃহকর্তা বাড়ি নেই। অগত্যা দ্বীপের অপর প্রান্তে হাটখোলাতেই যাব ঠিক করলাম। কিন্তু বাধ সাধলেন গৃহিণী ও গ্রামের এক বৃদ্ধা।....রাতে দ্বীপে হাঁটবেন না—পুলিশ বিপদ ঘটাতে পারে। বলা যায় না অন্ধকারে গুলিও করে দিতে পারে। এখানেই রাত কাটান।

রাতে রান্না হলো। সকলে খেলেন কিন্তু গৃহিণী খেলেন না। সে কি আপনি খাবেন না?

"খেতে ইচ্ছা করে না।" নদীর পারেই বাড়ি। আঙ্গুল দিয়ে অন্ধকারে নদীর ঐ পাড়টা দেখিয়ে বললেন—"জানেন ওখানকার মানুষরা চৌদ্দ দিন এপারে আসে নি। ভাত খেতে পারে নি। জলও পায়নি। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দ্বীপ। প্রথম প্রথম ২/৩ দিন বেশি শব্দ হয়নি। এরূপ কান্না শোনা যেতো রোজ। কুমীর আর কামোট ভরা নদী পার হয়ে কিছু লোক লুকিয়ে আসতো রাতে—চাল ইত্যাদি খোঁজে। জলের খোঁজে। এরপর তাও বন্ধ হলো। জালিপাতা আর যদু পালং খেয়ে থেকেছে ওরা, মরেছেও অনেক। ওদের কান্না এখান থেকে রোজই শুনতে পাই।" এরপর নিজের শিশু সন্তানকে বুকে রেখে ভাঙ্গা গলায় বললেন—"আমার এ সব মনে হয় আর খেতে ইচ্ছে করে না।"

ইতিমধ্যে আশে-পাশের বাড়ির দুই একজন তরুণ এসে হাজির হলেন। ওরাই বললেন স্থানীয় মানুষের উপর পুলিশী জুলুমের কথা। সন্ধ্যার পর হাত উঁচু করে পথ চলতে হয় এখানকার মানুষকে। তোমরা রিফিউজিদের আশ্রয় দাও—চাল দাও এই বলে পুলিশ ঝামেলাও করে।

সরস্বতী পূজার আগের দিন। উদ্বাস্তু কয়েকজন এসেছিলেন এপারে — পুলিশ তাদের আটক করে। ক্ষুধার্ত উদ্বাস্তুরা তেতে ছিলেন। তারা তখন নৌকা নিয়ে অথবা সাঁতরে এলেন এই পারে.....পুলিশ অবিশ্রান্ত টিয়ার গ্যাস আর গুলি ছুঁড়লো। ওরাও চ্যাঙ্গা ছুঁড়লো। পুলিশের আক্রমণে উদ্বাস্তুরা ছত্রভঙ্গ হলেন। অনেকে দৌড়ে আহত অবস্থায় স্থানীয় মানুষের ঘরে আশ্রয় নিলেন। পুলিশ ঐ সমস্ত ঘরেও আক্রমণ করলো। এর ফলেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন আদিবাসী রমনী বৃদ্ধা মেনকা মুন্ডা। আরো অনেকে আহত নিহত হয়েছেন—তাঁর হিসাব কে দেবে? পুলিশ অনেককে গুলি বিদ্ধ-অবস্থায় টেনে লঞ্চে আর নৌকায় তুলেছে। স্থানীয় মানুষ দেখেছেন। ঝিলের পাড়ে কুমিরমারী দ্বীপের রাস্তা মানুষের রক্তে রক্তে লাল ছিল। (কালান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯)

চার ভাটার পথ ঃ নিষিদ্ধ দ্বীপ (২)

অনুমতি চাইতে গিয়ে ফ্যাসাদ।

.....বাগনা ফরেষ্ট অফিসে এলাম। বাগনা ফরেষ্ট অফিস যেন যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির। অস্থায়ী ওয়ার গ্যাস দপ্তর। এ. এস. পি., ডি. এস. পি., ফরেষ্ট অফিসার। পুলিশের সশস্ত্র শাখার পুরো, কোয়ার্টার, হাফ, অনেক ধরণের অফিসার, গোসাবা থানার বড়, ছোট, মেজো দারোগাবাবু। এছাড়াও বেহালা, যাদবপুর, ক্যানিং, টিটাগড়, হাসনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের ছোট বড় অনেক ধরণের অফিসার। সব নিয়ে বিরাট ব্যাপার।

সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা। গ্রামের রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ। নদীতে প্রহরারত পুলিশ। সশস্ত্র বাহিনীর পুলিশ ইন্সপেক্টর নাম খুব সম্ভবতঃ সুভাষ বিশ্বাস।

নিষিদ্ধ দ্বীপের নিষিদ্ধ মানুষ

মরিচঝাঁপি দ্বীপের চারিদিকে নদী, কিন্তু সমুদ্র বেশ কিছুটা দূরে। গাঁয়ের মানুষের কথায় চার ভাটার পথ। অর্থাৎ চার বার ভাটার মধ্যে নৌকা চালালে সমুদ্রে যাবে। ঐ অঞ্চলের মানুষ এভাবেই পায়ের দূরত্ব হিসাব করে। নদীতে পুলিশের সর্বদা জাগ্রত টহল। স্থানীয় মানুষ বলছেন ৫০টি লঞ্চ টহল দিচ্ছে। মরিচঝাঁপিতে এখন বহু মানুষের বাস। চল্লিশ হাজারের বেশি। অনেকে এখন দ্বীপ ছেড়ে ছড়িয়ে আছেন

আশে পাশে কাজের আশায়। আমি যাওয়ার সময়ে বারাসাত ষ্টেশনে এক মহিলাকে দেখেছি, নাম কৃষ্ণদাসী মন্ডল। কথায় জানলাম মরিচঝাঁপিতে ঘর। এখানে আছে। রাজ মিস্ত্রীর যোগানে কাজ কিংবা ইট টানার কাজ করে।

দ্বীপের মাঝে তিনটি খাল আছে। দ্বীপবাসীর মতে পূবের খাল, মাঝের খাল, পাশের খাল। উদ্বাস্তু পল্লীগুলি ভাগ করা ১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর আর চার নম্বর সেক্টর। দ্বীপে বাজার আছে, স্কুলও আছে, দ্বীপের উদ্বাস্তু অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই তফসিলী জাতিভুক্ত। অধিবাসীদের মধ্যেই আছেন কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে সব। একটি রুটি তৈরির কারখানাও হয়েছে। বিড়ি শ্রমিক আছেন অনেকে। কিন্তু এখন সরকারী অবরোধে বাজার নিষ্প্রভ। রুটির কারখানা বন্ধ। বিড়ি তৈরি হলেও বাইরে চালান যেতে পারে না।

২৪ জানুয়ারি থেকে সরকার দ্বীপ অবরোধ করে। ৩১ জানুয়ারি গুলি চলে। ৯ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের ইংজাংশন অনুযায়ী জল-অন্ন আনার উপর থেকে বাঁধা প্রত্যাহার হয়। কিন্তু এর পরেও কড়াকড়ি চলছে। ৯ ফেব্রুয়ারির পরও যাঁরা চাল আনতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন তার সংখ্যা অনেক এবং ক্রমশ বাড়ছে। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির বক্তব্য, একমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই চাল আনতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন অনন্ত মন্ডল, অরবিন্দ রায়, নিরঞ্জন বাড়ৈ, কার্তিক সরকার, রণজিত মন্ডল, কৃষ্ণদুলাল বিশ্বাস। প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। (কালান্তর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯)

চার ভাটার পথ ঃ নিষিদ্ধ দ্বীপ (৩)

রাজ্য সরকারের মতে উদ্বাস্তুরা সরকারী জমি বে-আইনীভাবে বিলি করেছে। ফর্ম পূরণ করে কিছু কিছু টাকা নিয়ে এই জমি বিলি হয়েছে। সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনাকালে এ বিষয়ে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। আমরা সরকারে ন্যস্ত পতিত জংলা জমি পরিষ্কার করেছি; বিলি করেছি; তাতে ফসল ফলাচ্ছি। এটাতো সাদা চোখেই দেখা যায়। রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রিসভার অনেকেই পুরানো উদ্বাস্তু আন্দোলনের লোক, তাঁরা তো জানেন জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনী বসানোর সময়ে ইউ.সি.আর.সি. তহবিলে সামান্য চাঁদা নেওয়া হতো। ফর্ম পূরণ করবার পর জমি বিলি হতো। এটাতো পুরানো কথা। এখনোও তো তাই হচ্ছে। আর নারকেল গাছের চারা? এর উত্তর দেবেন সরকার। ২৪ তারিখ থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ। এত হাজার হাজার মানুষ খাবে কি? নারকেল গাছের "মাথি" আর জালিপাতা খেয়ে তো তাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাতেই এই গাছের যা ক্ষতি হয়েছে; আমরা মেহনত করে তা পূরণ করে দেবো। সরকার এই অবরোধ ওঠাক।

এখানে এত কষ্ট করছেন, আপনারা দন্ডকে ফেরৎ যেতে চাচ্ছেন না কেন? — "ওখানে যদি সুখেই থাকব তাহলে এখানে কষ্টে আছি কেন?"

অনাহারে মৃত মানুষ

এই দ্বীপের মাটিতে মিশে আছে কিছু মানুষের মৃতদেহ। অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। ওরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই দ্বীপে আগে মানুষ ছিল না। মানুষ যেতো মধু সংগ্রহে। দন্ডক প্রত্যাগত উদ্বাস্তুরা ওখানে স্থায়ীভাবে থাকবেন কি না জানি না। কিন্তু অনাহারে মৃত মানুষেরা এই দ্বীপে স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। মৃত মানুষের এই তালিকা দীর্ঘ। **২৪ জানুয়ারি সরকারের পক্ষ থেকে দ্বীপ অবরোধ করার পর ওখানে অনাহারে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন। এতে আছেন শিশু, বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণীও।** অখাদ্য খেয়ে রোগে মারা গিয়েছেন এই দরিদ্র মানুষেরা।

গুলিতে কতজন মারা গিয়েছেন?

মরিচঝাঁপির বুভুক্ষু উদ্বাস্তু তরুণীদের কামার্ত পুলিশের কামনারও শিকার হতে হয়েছে। নাম অনেকে বলে, অনেকে বলে না। ২০ বছরের কল্পনা পাল আর ১৮ বছরের বিশাখারানী মন্ডল কিংবা সবিতা ঢালি পুলিশের কামনার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। ওদের দেহে পুলিশের জৈবিক কামনার চিহ্ন। এই ধরণের অভিযোগ আরও আছে। পুলিশের এই ভয়ে আতঙ্কিত শুধু ওপারের উদ্বাস্তু তরুণীরা নয়, এপারের কৃষক আর জেলের বধূরাও। সরস্বতী পূজার আগের দিন পুলিশ আর উদ্বাস্তুদের সংঘর্ষে কতজন মানুষ হতাহত হয়েছেন? বাগনায় পুলিশের কর্মকর্তারা জানালেন দুইজন স্থানীয় মানুষ পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছেন। আর ছয়-সাতজন আহত হয়েছেন। গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত বলছেন না। আর ওপারে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কতজন আহত এবং নিহত হয়েছেন তা তাঁরা জানেন না। উদ্বাস্তু সমিতির তালিকানুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৩৬।

এদের আরো অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। উদ্বাস্তুদের কয়েকটি মৃতদেহ নাকি পুলিশ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বেড়মপুরিয়া আর কলাগাছিয়া নদীতে ঐ দেহ ওরা ফেলে দেয়। বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে আর লঞ্চের কর্মীরা খোলা মনে সাক্ষ্য দিতে পারলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। উদ্বাস্তু সমিতি বলেছেন, ঐ ঘটনায় পুলিশের আক্রমণে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন এমন সংখ্যা ৫২। এদের মধ্যে তিনজন মহিলা। এই তিনজন হলেন মালতী সরকার, বাসন্তী মন্ডল আর মালতী বৈরাগী। ২৪ জানুয়ারি পুলিশ ৩০ জন উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করে। যার মধ্যেও কয়েকজন মহিলা আছেন।

শান্ত দ্বীপ কুমিরমারীর মানুষ এ জিনিস এর আগে দেখেনি। ওরা দেখেছেন রক্ত; নদীর বাঁধে রক্ত; বাড়ির অঙ্গিনায় রক্ত। রক্তাক্ত মানুষকে কিভাবে টেনে হিঁচড়ে লঞ্চে উঠিয়েছে পুলিশ, তা ওরা দেখেছেন।

সরকারী দল কি করছে?

নিরন্ন রক্তাক্ত মানুষকে টেনে হিঁচড়ে লঞ্চে ওঠাতে ওরা দেখেছেন। এই জিনিস ওদের মনে, ওদের বুকে লেগে আছে। একথা সত্য, এই সমস্ত দ্বীপের মানুষেরা দেখেছে অসীম কষ্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ জনহীন দ্বীপে উদ্বাস্তুরা বসত সৃষ্টি করেছে। যার ছোঁয়া এসে পড়েছে এখানকার গ্রামীণ অর্থনীতিতে। রাজ্য সরকার কি দন্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবিরে উদ্বাস্তুদের ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করছেন? সরকারী দল সি.পি.এম. অবশ্য সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার শুরু করেছেন। মোল্লাখালি দ্বীপে জনসভা হয়েছে। ভান্ডারখালিতে জনসভা হবে। জনসভা হবে বাসন্তী, গোসাবাতে। এক ক্ষেতমজুর কর্মীর বাড়িতে ছিলাম। সেখানেই শুনলাম সি.পি.এম. স্থানীয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের বলছে, পুলিশ দিয়ে শুধু হবে না। চলো, আমরাও যাই, ওদের উঠিয়ে তোমাদের জমি দেবো।

দুদিন ঐ অঞ্চলে থেকে তাঁদের খবর নিয়ে কুমিরমারী থেকে ফিরে আসছি। পেছনে পেছনে ছুটে এলেন স্থানীয় এক মানুষ। ধর্মভীরু মানুষ, জাতিতে তফসিলী। অনেক আহত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। "দাদা আমাদের নাম ধাম লিখবেন না। পুলিশ ঝামেলা করে।" এরপরে বলেন, "মানুষ আর বাচ্চা না খেতে পেয়ে মরলো। এটা কি ভগবান সহ্য করবেন? ভগবানের বুক ফেটে যাবেনা?" (কালান্তর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯)

ব্লকেডের পর

হাইকোর্টের রায় অনুসারে ব্লকেড উঠে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র এবং এম. এল. এ. কিরণময় নন্দ, প্রবোধ সিংহ, রবিশঙ্কর পান্ডে প্রভৃতি কিছু সাংবাদিক ও ফটোগ্রাদার সঙ্গে নিয়ে মরিচঝাঁপিতে যান। ফেরার পথে হাসনাবাদে লঞ্চ থেকে নামার পর জঙ্গলের আইন অমান্যের অভিযোগে তাঁরা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের বসিরহাট জেলে পাঠানো হয়। পরের দিন জামিনে মুক্ত হয়ে তাঁরা বিধানসভায় এই সমস্যা তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

২২মার্চ পার্লামেন্টের জনতা দলের তিন সদস্য মরিচঝাঁপিতে যান। তাঁরা যাতে উদ্বাস্তুদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে না পারেন, সেজন্য পুলিশ পথে তিনবার লঞ্চ আটকিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ঐ রিপোর্ট পেয়ে দোষী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে চিঠি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কোনো ব্যবস্থা নেননি। শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবসরের সময়েও মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের ঘরে সেই চিঠিটা ছিল বলে জানা গিয়েছিল। তিন এম.পি. রিপোর্টের সারাংশ পরিশিষ্ট - ৩ (থ)তে ছাপা হল।

মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৯ সালের ৬ মে নাগাদ অপারেশান শুরু করার সময় পুলিশ মোতায়েনের খবর পেয়ে বিধানসভার বিরোধী

দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র এবং অন্যান্য এম. এল. এ'রা মরিচঝাঁপি যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা হাসনাবাদ থেকে ফিরে আসেন। কারণ বামফ্রন্ট সরকার সুন্দরবনের সমস্ত লঞ্চ রিকুইজিশান করেছেন পুলিশ দিয়ে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত করার জন্য। ঠিক এই সময়ে ক্যানিং-এ আর.এস.পি.'র সম্মেলন হচ্ছিল। কুমিরমারীর আর. এস. পি নেতা প্রদীপ বিশ্বাস, সুশীল মণ্ডল প্রভৃতি ক্যানিং সম্মেলনে। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে অভিযানের খবর পেয়ে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু সরকার সব লঞ্চ রিকুইজিশান করায় তাঁরা কুমিরমারীতে ফিরতে পারেন না। যখন ফিরেছেন, তখন দেখতে পান মরিচঝাঁপির নেতাজী নগর ভস্মীভূত। যাঁরা সেই সময়ে দ্বীপে ছিল সরকার তাঁদের ধরে নিয়ে অন্যত্র বিভিন্ন ক্যাম্পে রেখে সরকার দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সেই সময়ে যাঁরা জেলে দিলেন, যাঁরা অন্যত্র কাজে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের পরিবারের লোকদের এই ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে খুঁজে বেড়িয়েছেন। নেতাদের নামে ওয়ারেণ্ট থাকায় তাঁরা আত্মগোপন করেন। এক নেতা রাইহরণ বাড়ৈ বাংলাদেশে পালিয়ে যান। সেখানে গ্রেপ্তার হয়ে দুবছর জেল খাটেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যদের খোঁজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ঘুরেছেন। তিনি তাঁদের সন্ধান পেয়েছেন কি না আমাদের জানা নেই।

মরিচঝাঁপি ঃ নৃশংসতার শেষ চিহ্ন

(অমিত সর্বাধিকারী)

মরিচঝাঁপি কুমিরমারী আজ-নিস্তব্ধ। ঝাঁপ শূন্য করে দন্ডক শরণার্থীরা সবাই চলে গেছেন। রয়ে গেছে মানুষের নৃশংসতার শেষ চিহ্ন হিসাবে হোগলা, না হয় গোলপাতার ঘরগুলির পোঁড়াগন্ধ। বিস্কুট, লজেন্স, ওষুধের "বন্ধুত্বের আস্তরণ ছিনিয়ে নিয়েছে শিশুদের প্রাণ, নারীর সম্ভ্রম আর বেঁচে থাকার শেষ সংগ্রামকে। মধ্যযুগীয় এ বর্বরতার শুরু কিন্তু এখানেই নয় — এর শুরু ৩১ জানুয়ারি।"

কুমিরমারীতে পুলিশ জল ও স্থল উভয় দিক থেকে দন্ডক শরণার্থীদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে কমপক্ষে ১৫০ জনকে হত্যা করছে। এ সংখ্যা হয়ত আরও বেশি। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল কমবেশি ৩শ রাউন্ডের মত। ৩১ জানুয়ারির এই নারকীয় নাটকের সমাপ্তি ঘটলো ১৪ ও ১৫ মে তারিখে শরণার্থীদের তৈরি করা হোগলা ঘরগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে। এ কাজে পুলিশের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিল সি.পি.এম.-এর উঠতি ক্যাডাররা, এ অভিযোগ বসিরহাটের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই।

অহেতুক উস্কানি

৩১ জানুয়ারি সকালবেলায় পশ্চিমবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ১ম ও ৮ম ব্যাটিলিয়নের বেশ কিছু সশস্ত্র লোক নিয়ে ৪০টি লঞ্চে মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের

উপর নজর রাখছিলেন বসিরহাটের মহকুমা পুলিশ অফিসার অনিলকুমার।

নদী থেকে প্রায় ১৫০ গজ দুরে নিজেদের অফিসঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সভা করছিল, স্লোগান দিচ্ছিল শরণার্থীরা। হঠাৎ পুলিশ সাহেব বলে উঠলেন, "ওদের একটু গরম করা যাক"। বলেই একজন সেপাই-এর কাছ থেকে নিজেই নিয়ে নিলেন "গ্যাসগান", ছুড়লেন, ২৪-২৫টি সেল। প্রায় সবাই ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে থাকে। ইতিমধ্যে গ্যাসের একটি শেল হোগলার অফিস ঘরে পড়ে এবং সেটিতে আগুন ধরে যায়। খানিক পরে দুটো নৌকা করে শরণার্থীদের কয়েকজন পুলিশ সাহেবের লঞ্চের দিকে এগিয়ে যায় এবং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁদানে গ্যাস শেল ছোঁড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ আই.পি.এস. অফিসার লঞ্চের সারেঙ্গকে নির্দেশ দেয় দুটো নৌকার মাঝখান দিয়ে লঞ্চ চালাও। ফলে, নৌকা দুটি ভেঙ্গে যায়। নৌকার যাত্রীরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে আসে।

এদিকে কুমিরমারী ক্যাম্পে শরণার্থীদের একটি দল এগিয়ে যেতে লাগল পুলিশ ক্যাম্পের দিকে। উদ্দেশ্য সব কিছু জেনে নেওয়া। আচমকা লাঠি, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে ক্যাম্পের কাছে শরণার্থীদের আসতে দেখে ক্যাম্প-এর অধিনায়ক ব্যারাকপুরের এস.ডি.পি.ও. জয়দেব চক্রবর্তী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ৯ম ব্যাটিলিয়নের তার লোকদের সতর্ক থাকতে বলেন। এখানেও সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালায় ১ শো থেকে ১৫০ রাউন্ড। বেশ কিছু হতাহত হয়।

খবরটা বাগনা ক্যাম্পে পৌঁছে যায় ওয়ারলেস মারফৎ। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নীরদ দাস। তিনি তখন সশস্ত্র বাহিনীর ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৮ম ব্যাটিলিয়নের দেড়শ লোক নিয়ে স্থলপথে রওনা দেন কুমিরমারীর দিকে। যাওয়ার আগে লঞ্চের ডিউটি অফিসারকে জানিয়ে দেন, 'জল থেকে আপনারা এবং স্থল থেকে আমি আক্রমণ করব।'

ঘটনাও ঠিক সেইভাবে। প্রথমে টিয়ার গ্যাস শেল ফাটানো হতে লাগল লঞ্চ থেকে। কিন্তু শরণার্থীরা সেগুলি হয় কাদার মধ্যে, না হয় জলে ফেলে দিতে লাগল। জল থেকে যখন আক্রমণ চলছিল তখন এসে পড়লেন দাস সাহেব। এই সময় দাস সাহেবের সঙ্গী কিছু গুরর্খা পুলিশ বেঁকে দাঁড়াল। তারা অকুস্থল থেকে চলে যায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নীরদ দাস গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো ৩টি ব্যাটেলিয়ানের ৪টি কোম্পানির রাইফেল। মাটিতে পড়ে গেল ৬০টির মত তাজা দেহ। এলপাথাড়ী গুলি চালানোর জন্য মারা গেল এক বৃদ্ধ সাঁওতাল—যে উদ্বাস্তু ছিল না। ঘরে বসেছিল। কয়েকদিন পরে আরও ৫টি মৃতদেহ পাওয়া গেল।

মরিচঝাঁপির ও কুমিরমারীর আশে পাশের লোকালয়ে গেলে জানা যাবে, কত মৃতদেহ পুলিশ রাত্রে সরিয়ে ফেলেছে। নদীতে কতগুলি মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাতুর্জের হিসাব

যে রাত্রে এই অপারেশন করা হল সে রাতেই বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানের ইন্সপেক্টররা ২৪ পরগণা পুলিশ সুপারের কাছে হিসাব দিলেন ৩শো গুলি খরচ করার। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দাস সাহেব নিজে তা গ্রহণও করলেন। কিন্তু পরে ইন্সপেক্টরদের ওপর চাপ এলো। "অত গুলি খরচ দেখানো চলবে না, দেখাতে হবে ১০টি গুলি খরচ হয়েছে।" ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বললেন, বাকি গুলির হিসাব মেলানো হবে কি করে। সে দায়িত্ব নিলেন ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার। আলিপুর আর্মারী থেকে নতুন গুলি ব্যাটেলিয়ানগুলিকে দেওয়া হবে বলে জানালেন। মাস খানেকের মধ্যে আলিপুর থেকে ম্যাসেজ এলো, "নতুন গুলি নিয়ে যাও।" সেগুলি আনতে হল। আপাততঃ ব্যাটেলিয়ন-এর গুলির হিসাব ঠিকই রয়েছে কিন্তু কম পড়ে গেছে আলিপুর আর্মারীর।

যদি একই সঙ্গে, একই সময়ে, আলিপুর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট ও ডায়মন্ড হারবারের অস্ত্রাগারগুলির গোলাবারুদ-এর হিসাব নেওয়া যায় তবে এই গরমিল ধরা পড়ে যাবে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করার মত ঃ ৩১ জানুয়ারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মামলা উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে পুলিশ দায়ের করেছে, তাতে দু'টি রাইফেল আদালতে দাখিল করা হয়েছে। দাখিল করা হয়েছে ১০টি শূন্য কার্তুজ। কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ব্যবহার করা কার্তুজ ঐ রাইফেলের নয়। সংশ্লিষ্ট ইন্সপেক্টরদের পার্শোনাল ডায়েরী রিপোর্ট ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নিয়ে নেওয়া হয়েছে আলিপুরে কন্‌ট্রোলরুমের টেলিফোন ম্যাসেজ বই, যাতে এসব তথ্য রয়েছে। (কালান্তর, ২৪ মে ১৯৭৯)।

মরিচঝাঁপি ঃ নৃশংসতার শেষ দিক

৭মে, বিকেলে মহাকারণে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের জানালেন, মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নামতে পেরেছে। কথাটা ঠিক। টিয়ার গ্যাসের সেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রায় মরিয়া হয়ে ৪০ টি লঞ্চ থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নেমেছিল। নেমেই প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে আহত করেছিল বেশ কিছু মানুষকে। রাত্রের অন্ধকারে এলো আরও প্রায় হাজার খানেক পুলিশ, আর সাদা পোশাকের লোক। যাদের পরিচয় হলো "ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের" লোক বলে।

পুলিশের হাত-মাইক থেকে বার বার বলা হচ্ছিল, "আমরা আপনাদের বন্ধু, আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ যাবার, সেখানে গেলে .....ইত্যাদি। কিছুদিন আগে পার্লামেণ্টের জনতা দলের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন।

কাগজে এ ব্যাপারে লেখা হয়েছিল। সুতরাং আর যাই হোক অন্যায় অত্যাচার কিছু হবে না।

১২ মে পর্যন্ত পুলিশের এবং তথাকথিত ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক লজেন্স, বিস্কুট, ঔষুধ দিয়ে একটা সাধারণ সখ্যতা স্থাপন করতে চেষ্টা করে।

১৩ মে রাত্রে হঠাৎ আগুন লাগানো হল। মধ্যরাত্রে আগুন লাগালো। আর্ত চিৎকারে সমগ্র এলাকা উঠলো কেঁপে। ঘর থেকে যাঁরা বেরিয়ে এলেন তাঁদের বেশ কয়েকজনকে ধরে তোলা হলো লঞ্চে। তার আগে নৃশংসভাবে লাঠি পেটা করতে ভুল করেনি পুলিশ।

সকালে অল্প কিছু ছেলে নিয়ে নেতাজী স্কুলে ক্লাস হচ্ছিল। হঠাৎ এখানেও লাগলো আগুন। আগুন লাগার ঘটনা শুনে মায়েরা দৌড়ে যায়, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের সামনে পৌঁছতে লাগলেন। এসে দেখলেন বাচ্চাদের ধরে তুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন লঞ্চে। এর পর জোর করে মায়েদেরও তোলা হলো অন্য লঞ্চে। এ সময় পুলিশের ও বাইরের লোকদের জোর জব্বরদস্তিতে অনেক মায়ের লজ্জা লুটিয়ে পড়ল মরিচঝাঁপির মাটিতে। বাচ্চা রইলো একটি লঞ্চে। মা রইল আর একটিতে। সম্ভবতঃ এভাবেই তৈরি হবে আর এক নতুন ধরণের যাযাবর।

পৈশাচিক ভণ্ডামি কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। আয়োজন করা হলো ফুটবল খেলার। অংশ নিলো স্থানীয় কিছু তরুণ আর বন বিভাগের কর্মীরা। সে খেলা প্রথমে মাঠে তেমন ভীড় হয়নি। পরে আস্তে আস্তে অল্প বয়সের ছেলেরা মাঠের ধারে কিছু কিছু করে ভীড় জমালো। খেলা যখন জমে উঠেছে, এমন সময় সাঁড়াশীর মত ঘিরে ফেলা হলো তাদের। তার পর সেই একই নাটক, তোলা হলো লঞ্চে। ১৩, ১৪ ও ১৫ মে এভাবেই শেষ করা হল মরিচঝাঁপির "অপারেশন"। ঘরগুলিতে এবার আগুন লাগানোর পালা। সে লোকও আনা হোল।

১৭মে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে সাংবাদিকদের জানালেন, মরিচঝাঁপিতে এখন শরণার্থী শূন্য। এর আগে ২৫ এপ্রিল মুখ্যসচিব অমিয় সেন জানিয়ে ছিলেন, সরকারী তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মরিচঝাঁপিতে ও কুমিরমারীতে পুলিসের গুলি চালনা ঠিকই হয়েছে। ২জন মারা গেছে।

কলিকাতার দেওয়ালে আজও পোষ্টার রয়েছে "মরিচঝাঁপি নিয়ে চক্রান্ত চলছে।"

ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর বনদপ্তরকে অনুরোধ করেছে ঘর পোড়ার সমস্ত দাগ মুছে ফেলার ব্যবস্থা করুন।

মরিচঝাঁপিতে ঘটনা সম্পর্ক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির উত্তর ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের সম্পাদক সরল সেন এক বিবৃতিতে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর নৃসংশ অত্যাচারের বিচার

বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন।

শ্রীসেন বিবৃতিতে বলেছেন, "মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর কোনও জুলুম হয়নি "বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মরিচঝাঁপি অপারেশন করতে যেয়ে উদ্বাস্তুদের উপর জুলুম, অত্যাচার, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ, লাঠিচালনা, ঘরবাড়ি ভাঙ্গা ও অগ্নি সংযোগ, নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি, গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো প্রভৃতি সকল প্রকারের রাস্তাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়। তাঁদের বক্তব্যে একথারও স্বীকৃতি আছে যে, "পুলিশের সাথে সহযোগিতায় সি.পি.এম. দলের কর্মীরাও ছিল।" এ সম্পর্কে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে, যদি এ ঘটনা সত্য হত তবে অনেক আগেই এদের বুঝিয়ে দন্ডকে ফেরত পাঠানো যেত। আর মুখ্যমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আগুন লাগানোর ঘটনা দুষ্কৃতিকারীদের কাজ।

এ সম্পর্কে প্রশ্ন হল, যে দ্বীপে সরকারের নির্দেশ ছাড়া কারও যাবার উপায় ছিল না, এমনকি সংসদ সদস্যদেরও নয়, সেখানে বাইরের দুষ্কৃতকারীরা কিভাবে গেল? এবং এই দুষ্কৃতকারীরা কারা? তা ছাড়া উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে হাসনাবাদ এবং সেখান থেকে দুধকুন্ডু ট্র্যানজিট ক্যাম্প খড়গপুর (দন্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানোর জন্য) যেভাবে গাদাগাদি করে পাঠান হয়েছে মানুষ কেন, পশু পাখীদেরও ঐভাবে পাঠানো হয় না।

৮ মে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "আমাদের কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭ মে মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ল্যান্ড করেছে।" এত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৭—১৬ মে-র মধ্যে "বুঝিয়ে পাঠানোর" ব্যাপারটা সন্দেহের সৃষ্টি না করে পারে না। মন্ত্রী মহোদয়গণ যাই বলুন না কেন, আমরা মরিচঝাঁপির সমগ্র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই। (কালান্তর, ২৫ মে, ১৯৭৯)

মরিচঝাঁপির ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই

২৫ মে.—মরিচঝাঁপির ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সম্পাদক বিশ্বনাথ মুখার্জী এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

"মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে ঐ দ্বীপ থেকে সরানোর ব্যাপারে পুলিশের কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যে ভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে তাতে এই ধারণা স্বাভাবিক যে, পুলিশ

কেবলমাত্র বুঝাবার-সুঝাবার মধ্যে নিজেদের কার্যকলাপকে সীমিত রাখেনি এবং বলপ্রয়োগও হয়ে থাকতে পারে।

"অতএব যে সব গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তা নিয়ে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি আমরা করছি।" (কালান্তর, ২৬ মে, ১৯৭৯)

তখনও পর্যন্ত বিশ্বনাথবাবু ও তার পার্টি ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বাইরে ছিলেন। তাঁরা এটা ভালভাবেই জানেন যে স্বরাষ্ট্র বা পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজে। যে মন্ত্রীর নির্দেশে মরিচঝাঁপি দ্বীপে এমন বর্বর কাণ্ড ঘটেছিল, বিশ্বনাথ মুখার্জী সেই মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন নি। মরিচঝাঁপিতে বর্বরতা সুলভ হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ ২১ বছর পরে ২২ জুন, ১৯৯৮ ডানকুনি (হুগলী) তে দাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বগর্বে ঘোষণা করতে পারলেন, "২২ বছরে মিথ্যা বলিনি, ধাপ্পাও দিইনি।"

সংবাদে প্রকাশ—"বামফ্রন্ট সরকার আজ ২২ বছরে পা দিল, এই ঐতিহাসিক ক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি জোর গলায় বলছি, গত ২১ বছরে আমরা কোনদিন মানুষকে কোন ধাপ্পা দিইনি। একটিও মিথ্যে কথার প্রতিশ্রুতি দিইনি।"

(বর্তমান, ২২ জুন-১৯৯৮)

এই প্রকার উক্তি যিনি প্রকাশ্যে জনসভায় দাঁড়িয়ে সদর্পে বলতে পারেন, তাঁর নাম জ্যোতি বসু। তিনি এতবড় অসত্য কথা এবং দেশবাসীকে ধাপ্পা দিতে পারলেন!

মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের সমালোচনায় এস. ইউ. সি.

এস. ইউ. সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুকোমল দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন—"যে পদ্ধতিতে বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপিতে অপারেশন পরিচালনা করেছেন," জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তার তুলনা করে বলেছেন, "এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে গৌরবের অধিকারী ছিলেন, আজ সি. পি. আই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্টের কার্যকলাপে তা সম্পূর্ণ ম্লান হতে চলেছে।"

তিনি বামফ্রন্ট সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও এক সংগঠিত ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন। (কালান্তর, ২৭ মে, ১৯৭৯)

প্রকৃত ঘটনা হলো, পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির নেতারা মরিচঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্বাস্তুদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন কাশীকান্ত মৈত্র, প্রবোধচন্দ্র সিংহ, কিরণময় নন্দ সমেত জনতা পার্টির

আরও নেতা ও সাংবাদিক। মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। বিধান সভায় মরিচঝাঁপিতে বর্বরতা নিয়ে তাঁরা আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন। সুন্দরবনের এম. পি. শক্তি কুমার সরকার নিজে লঞ্চ ভাড়া করে কলকাতার সাংবাদিকদের এবং পরে পার্লামেন্টের সদস্যদের মরিচঝাঁপি দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লোকসভায় এই বিষয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন জনতা পার্টির বসিরহাটের এম. পি. হান্নান মোল্লা নিজে মুসলমান হয়েও মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের হয়ে লোকসভায় সি. পি. এম. সরকারের নিন্দা করেছেন।

অথচ জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। তাঁরা কেন চুপ করে গেলেন যখন জ্যোতিবাবুর পুলিশ উদ্বাস্তুদের ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিল? স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করে তাদের জোর করে মরিচঝাঁপি থেকে তাড়িয়ে দিল, এই রহস্যের কারণ জানা গেল অনেক পরে।

২৩ নভেম্বর ১৯৮০, পার্ক হোটেলে, কেন্দ্রীয় জনতা পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখরের বক্তব্যে। আমার উপস্থিতিতে আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসির নিরঞ্জন হালদারের প্রশ্নের জবাবে বলেন—"সি. পি. এম. পলিটব্যুরোর সদস্য এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, পি রামমূর্তি সহ হরকিষেণ সিং সুরজিৎ দিল্লিতে আমার বাসায় গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আন্দোলনের কথা বলেন। আমি তাঁদের আশ্বাস দিই, আমার সরকার ও দল পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি দেবে। আমি দেখব, আমার দল আপনাদের বিরুদ্ধে যাতে কিছু না করে।"

সেদিন অনেক সাংবাদিক সহ অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সমর গুহ, রাজ্য কমিটীর নেত্রী আভা মাইতির উপস্থিতিতে চন্দ্রশেখরজীকে প্রশ্ন করি—

"আপনার কথা থেকে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের জনতা পার্টির নেতাদের সমর্থন থাকা সত্বেও মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর বাম সরকারের অ-মানবিক ও নৃশংস অত্যাচারে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের জনতা পার্টি কেন নীরব ছিলেন?

চন্দ্রশেখর উত্তর না দিয়া আমার প্রশ্নে উষ্মা প্রকাশ করেন।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্য জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মরিচঝাঁপিতে বর্বর কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরেও নীরব থেকে যান। জনতা পার্টির তিন এম. পি'র রিপোর্ট পেয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী সরকারকে কী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা ২২ বছর পরেও আমাদের অজানা।

পরিশিষ্ট—১

মরিচঝাঁপিতে অবরোধের সময়

কমলা বসু

(পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি ব্লকেড করেন। যাতে মরিচঝাঁপির মানুষ খাদ্য ও জল না পেয়ে মারা যায় এবং অনাহারক্লিস্ট মানুষেরা বেঁচে থাকার আশায় মারিচঝাঁপি থেকে দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায়।

এই সময় বিপ্লবী-যুগের অগ্নিকন্যা বীনা দাশ ভৌমিক ও কমলা বসু কীভাবে মরিচঝাঁপিতে পৌঁছান এবং কলকাতায় ফিরে আসেন, সেই কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে।)

ভাই নিরঞ্জন,

সেদিন মরিচঝাঁপির কথা লিখতে বল্লে, কিন্তু আমি তো কোনো ডাইরি রাখিনি—সব কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে—কত কিছু ভুলেও গেছি। মানুষের জীবনটাই তো এইরকম—ক্রমাগত কাছের জিনিস ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়—আর যে স্রোত একদিন বন্যার মত প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে সেই স্রোত 'অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো, জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

মরিচঝাঁপিও আমাদের জীবনে একটা অত্যন্ত ব্যথার জায়গা যা আছে সত্যিই অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতোই জীবনের একান্তে পড়ে আছে। অথচ ১৯৭৮-৭৯তে সে আমাদের প্রাণমনকে প্লাবিত করেছিল।

দেশ ভাগের দুঃখটা ভুলতে পারিনি —ভাগ করার ছুরিটা আজও বুকের মধ্যে বিঁধে আছে —চলতে ফিরতে ব্যথা পাই।

তাই যেদিন শুনলাম দণ্ডকারণ্য থেকে আমাদেরই কিছু ছিন্নমূল মানুষ এই বাংলায় ফিরে আসছেন—মরিচঝাঁপিতে নিজেরাই ছোট্ট গ্রাম তৈরি করে তারা চাষবাস, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি করে এখানেই থাকবেন তখন খুশিতে মনটা ভরে গিয়েছিল। অনুভূতিগুলি তো মরেনা। কিন্তু সাল তারিখ সবই তো ভুলে গিয়েছি। বোধহয় ১৯৭৮ এর এপ্রিলে শুনেছিলাম। তারপর একদিন সুকুমার নামে আমাদের পরিচিত একটি ছেলে বীণাদিকে (বীণা দাশ / ভৌমিক) জানাল যে, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে লোক মরিচঝাঁপিতে এসে গেছে—রোজই আসছে—অথচ তাদের খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। কারণ মরিচঝাঁপি লবণাক্ত জলে ঘেরা একটা জনশূন্য অরণ্যময় দ্বীপ মাত্র। খাবার জলটুকুও নৌকা করে এসে লোকদের উল্টোদিকের কুমিরমারী গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে হয়। আর সেই সময় কোনো সরকারী টহলদার যদি দেখতে পায়, তা জলে বা স্থলে যেখানেই হোক তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটা ভেঙ্গে

দেবে। ওদের স্টীমার থেকে যদি নদীতে কাউকে পারাপার করতে দেখে, তাহলে লাসো (Lasso) দিয়ে তাদের টেনে তুলে নিয়ে মারে। এই জ্যোতিবাবুর সরকার কেন যে প্রথম থেকেই ওদের সঙ্গে এইরকম শত্রুতা করল, এ রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারলাম না।

অথচ মজা হচ্ছে এই যে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে বসেছেন বলেই কিন্তু ওরা সব দণ্ডকারণ্য থেকে এখানে ছুটে এসেছেন কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন আন্দামানে। কিছু পূর্ববঙ্গের লোকদের বসতি স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন তখন এই কমুনিস্টরাই 'Son of the soil' এর ধূয়া তুলে তাতে বাধা দিয়েছিল। তাই এবার দণ্ডকারণ্যের মানুষজন ভাবলেন এবার তাহলে Son of the soil রা দেশেই ফিরে আসতে পারবেন। এসেই ওঁরা রাম চ্যাটার্জির (তখন তিনি মন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করলেন। বল্লেন "আমরা টাকা পয়সা কিছুই চাইনা, আমরা নিজেরাই সব ঠিক করে নেব। চাষ করব, মাছের ভেরি করে ব্যবসা করব। সরকার চাইলে তাঁদের কাছেই মাছ বিক্রি করব। আমাদের শুধু এইখানে থাকবার অনুমতিটুকু দিন। ওঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং কেন্দ্রে জনতা সরকারের কাছে যে সব স্মারকলিপি দিয়েছিলেন সে সবের কপি ওঁরা আমাদের দেখতে দিয়াছিলেন। সরকার অবশ্য তাদের অবস্থানে অনড়। থাকতে তো দেবেই না—এক্ষুনি তাদের চলে যেতে হবে। যেতেই হবে।

কেন যে সরকার এইরকম একটা মনোভাব নিল এটা আমার আজও একটা রহস্য—মিস্ট্রি অব দি মিস্ট্রিজ। আমি একদিন কমলাদিকে (কমলা মুখার্জি CPI) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা রাজ্য সরকার এরকম করল কেন? ওদের সাহায্য করলে তো এই পুরো জনগোষ্ঠীটাকেই শাসকগোষ্ঠী নিজেদের দলে নিয়ে আসতে পারত—শুধু শুধু শত্রুতা করলেন কেন? কমলাদিও খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, বল্লেন এটা আমিও বুঝিনি কমলা—এ রাজনীতিটা আমি একদম ধরতে পারলামনা।'

যা হোক্—আমরা, মানে বীণাদি (বীণাদাশ / ভৌমিক) আর আমি তখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলাম, যাতে অন্তত গোটা তিনেক টিউবওয়েল বসানোও আর কয়েক কুইন্টাল চাল কেনা যায়। তারপর তাই নিয়েই তো রওনা হলাম। সুভাষ নামে একটি ছেলে চল্ল আমাদের পথপ্রর্দশক হয়ে। ক্যানিং পর্যন্ত গিয়ে তারপর লঞ্চে করে যেখানে নামলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতটুকু অপেক্ষা করতে হবে। সকালে হেটে কুমিরমারী গ্রাম, তারপর নৌকায় মরিচঝাঁপি। এইবার শুরু হলো এক মজার খেলা। সুভাষের নির্দেশ —আমাদের পরিচয় নাকি প্রকাশ করা চলবে না। চারিদিকে সরকারী চরেরা সব ছড়িয়ে আছে। আমাদের গন্তব্য বা উদ্দেশ্য জানতে পারলেই গ্রেপ্তার অবধারিত। আমাদের গাইড সুভাষ বলছে, আমরাও তাই করে যাচ্ছি। সে আমাদের অতি ছোট একটা চালা ঘরে নিয়ে এল। সেখানে চা

বিক্রি হয়। চারপাশে জনবসতি বলে কিছুই চোখে পড়ল না । শুধু মাঠ জঙ্গল কিছু কিছু চষা জমি। কিন্তু রাতটা তো আমাদের কোথাও কাটাতে হবে। সেই ঘরটার চালের নিচে গ্রামের বাড়িতে যেমন দেখা যায় তেমনি একটা মাচা আছে। একটা ল্যাকপ্যাকে বাঁশের মই কোত্থেকে যেন যোগাড় হলো। সুভাষ তো সেই মই ধরে নীচে দাড়িয়ে রইল—আমি আর বীণাদি তো গুটি গুটি সেই মই বেয়ে উপরে উঠলাম আর তক্ষুণি শুয়ে পড়লাম। তারপর সুভাষও উঠে তারি একপাশে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে দিব্যি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। আমাদের তো ঘুম আর আসেনা—একটু নড়লেই মচ্‌মচ্ শব্দ—ভেঙ্গে না পড়লেই বাঁচি। আমার তো তখন অট্টহাসিতে পেট ফেটে যাবার যোগাড় অথচ শব্দ করা নিষিদ্ধ। কী আর করা—বীণাদির সঙ্গে ফিসফিস করে গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিলাম। তারপর ভোর হতেই সুভাষ আমাদের নিয়ে হাটা শুরু করল। ভোর মানে তখনও অন্ধকার। মাসটা বোধহয় জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি—ঠিক মনে নেই। তবে শীতটা মনে আছে। তখন থেকে আমাদের ছদ্ম পরিচয় হলো আমরা নাকি কুমিরমারীতে কোন যজমানের বাড়িতে যাচ্ছি। এবড়ো খেবড়ো মাঠের মধ্য দিয়ে হাটছি, মাঝে মাঝে আলের ওপর দিয়েও যেতে হচ্ছে। অনভ্যাসে কষ্ট যত না হচ্ছে—তার থেকে বেশী হাসি পাছে—এদিকে গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে। সেই ছোটবেলায় অকারণ হাসির জন্য স্কুলে বকুনি খেতে হতো—বুড়ো বেলায়ও তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

এখন আমাদের মরিচঝাঁপি যেতে হবে। কিন্তু যাই কী করে? সরকারী লঞ্চ ভট্ ভট্ শব্দ করে মারিচঝাঁপি দ্বীপটার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে, কোনো নৌকা বা লোক দেখলেই Lasso দিয়ে তুলে নিচ্ছে। তাহলে? এখন উপায় কী? এবার কি তবে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। কী খারাপ যে লাগছে—অথচ সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি মরিচঝাঁপি দ্বীপটা। নদীপৃষ্ট থেকে বেশ একটু উঁচু—অনেকটা খুব ছোট্ট একটা টিলার মত আকৃতির ময় সুউচ্চতায়। সরকারী লঞ্চটাতো সমানেই দ্বীপটাকে ঘিরে ঘুরছে যেই ওটা কুমিরমারীর সামনে থেকে ওপাশে ঘুরে গেল তক্ষুনি সুনীল নামে ছেলেটি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাড়াল। কোন মন্ত্রবলে জানিনা একটা ছোট্ট ছিপ জাতের নৌকা নিয়ে এসেছে —মাথায় কোনো ছাউনি নেই নৌকার মত। বীণাদি আর আমি তো লাফিয়ে তাতে উঠে পড়লাম—আর তীরবেগে সুনীল আমাদের নিয়ে মরিচঝাঁপি পৌঁছে গেল যেন মূহুর্তে। কিন্তু এখন নামব কী করে—নামতে গিয়েই বুঝতে পারলাম সম্ভবতঃ আমার কোমর অবধিই কাদায় ডুবে যাবে —তারপর তো আমার আর পা তোলা সম্ভব নয়। কোনো কথা না বলে চোখের পলক ফেলবার আগেই সুনীল আমায় স্রেফ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তার নিজের হাঁটু অবধি কাদায় ডোবাতে ডোবাতে কী এক আশ্চর্য কৌশলে এক ছুটে আমায় ওপরের বনভূমিতে পৌঁছে দিল। ততক্ষণে আবার সরকারী স্টীমলঞ্চের ভট

ভট শব্দ কানে আসছে—অর্থাৎ পরিক্রমা শেষ করে আবার এদিকে আসছে। ঝড়ের বেগে সুনীল নীচে নেমে আবার সেই একই পদ্ধতিতে বীণাদিকেও পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে নিয়ে এল। তারপর আবার ছুটল নৌকাটা তুলে আনার জন্য—গিয়ে দেখল সরকারী লঞ্চ ওটা তুলে নিয়ে গেছে আর বুঝতে পেরে গেছে ওদের টহলদারী সত্ত্বেও যাতায়াত হচ্ছে। যাক্—

তারপর এই জনহীন বনভূমিটুকু হেটে পার হয়ে আমরা একটা বেশ বড় খাদের সামনে এসে দাড়ালাম। এখানে ভূখণ্ডটি দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এটা পার হলেই আমরা মরিচঝাঁপির বসতিতে গিয়ে পৌছব। পার হবার ব্যবস্থা হিসাবে একটি মাত্র বাঁশ এপার থেকে ওপার অবধি ফেলা আছে। তবে হাত দিয়ে ধরবার জন্য ডানপাশে একটু উচু করে আরেকটা বাঁশ বাঁধা আছে। প্রায় সার্কাসের ভঙ্গীতে ডানহাতে সেই বাঁশ ধরে এক পা এক পা করে আমরা দিব্যি পৌছে গেলাম।

খবর তো সব আগেই পৌছে গেছিল—গ্রামশুদ্ধ সবাই ছুটে এলেন—সতীশ বাবু (মণ্ডল) তো ছিলেনই। কেউ কাউকে চিনিনা, তবু মনে হলো বহুদিন পর দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়রা বুঝি সবাই বাড়ি ফিরে এসেছে। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরল—সবারই প্রায় চোখে জল, মুখে হাসি। কারণ ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দ্বীপ অবরোধ করার পর একমাত্র আমরাই প্রথমে মরিচঝাঁপি ভেতরে গিয়েছিলাম। আরো অনেকেই ওদের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন এবং অনেকদিন ধরে, এমন কী ওরা উৎখাত হয়ে যাবার পরেও। এ ব্যাপারে জ্যোতির্ময় দত্তের (বুদ্ধদেব বসুর জামাতা) নাম অগ্রগণ্য।

শেষ পর্যন্ত মরিচঝাঁপিতে একটা বাড়িতে পৌছলাম। গৃহকর্তা এবং কত্রীর আন্তরিক অভ্যর্থনায় মনটা জুড়িয়ে গেল। বাড়ি মানে মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। তা হোক্ সেটা কিছু নয় কিন্তু সেখানে দারিদ্র্যের যে চেহারা দেখলাম (শুধু একটা বাড়িতেই নয়—সারাটা গ্রামেই) তা এদিককার দীনতম লোকের কাছেও অকল্পনীয়। নদীর ওপারে এই ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সভ্যজগত থেকে বিচ্ছিন্ন কতগুলি দ্বীপ। ইলেকট্রিক নেই, স্কুল নেই, ডাক্তারখানা নেই, বাইরে থেকে কেউ নিয়ে না গেলে একটা ট্রানজিস্টারও নেই। কিন্তু ইহা বাহ্য—দারিদ্র্যের চেহারা তারপরেও যে কী হতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না—চোখে দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

একটা জনহীন অরণ্যসঙ্কুল দ্বীপকে শুধু ওদের দুটি হাত দিয়ে ওরা যে ছবির মত কি সুন্দর একটা গ্রাম তৈরি করেছে তাই দেখে আমরা তো হতবাক্। ভাবা যায়না, ওদের ইঞ্জিনীয়ার নেই, আর্কিটেক্ট নেই, সিমেন্ট বালির তো প্রশ্নই নেই—তবু যে কেউ মুগ্ধ হবে ঐ ছবির মতো সুন্দর গ্রামটি দেখে—সত্যিই মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে কী করতে পারে এটা একটা দেখবার মতো জিনিস, স্কুল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি—কী

নেই,—গ্রামের মেঠো রাস্তা, কিন্তু এতটুকুও অপরিচ্ছন্নতা নেই কোথাও। আর আছে সবারই একটি করে বাড়ি, বাড়ি মানে ১টি বা দুটি খুব ছোট ছোট মাটির ঘর।

ব্লকেডের সময় ওরা তখন কী খেত শুনবে? এক ধরণের ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে সবাই পেট ভরায়। ঘাসের নামটা মনে পড়ছে না— ওখানে ওটা নাকি অপর্যাপ্ত জন্মায়। (চাল যেটুকু যোগাড় হয়েছিল সেটা উল্লেখ্যই নয় তবে শেষ পর্য্যন্ত তিনটি টিউওয়েল অবশ্য হয়েছিল।) তখন কাশীকান্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তাঁকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম। (বিধানসভায় তখন কিছুটা হৈ চৈও হয়েছিল কিন্তু ঐ পর্যন্তই)। সেদিন মরিচঝাঁপিতে সতীশবাবু সহ অন্য সবার সঙ্গে নানারকম আলোচনা, প্লান হলো কী ভাবে কী করা যায়? বিকালে বীণাদিকে সভানেত্রী করে একটা সভা হলো। এমন সময় এক দল ছেলে মেয়ে (তাদের কাজই ছিল নদীর ধারে পাহারা দেওয়া, কারণ তখন মরিচঝাঁপিতে অচেনা কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা, এটাই ছিল সরকারী নিয়ম)। ছুটতে ছুটতে এসে বল্ল "স্টিমার ভর্তি পুলিশ এসেছে"। আমরাও ছুটে গেলাম—ভাবলাম হয় বীণাদিকে গ্রেপ্তার করবে, নয়তো নির্বিচারে গুলি চালাবে। কিন্তু না, ওরা সে সব কিছুই করেনি—স্টিমার থেকে মাটিতে নামবার সাহস পর্যন্ত হয়নি। আমরা তো গিয়ে দেখলাম নদীর ধারে গোটা মরিচঝাঁপি ফল ইন্ করে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশ অফিসারেরা ওদের স্টিমারের সামনে এসে তাঁদের নিজেদের মতো করে লোকেদের বোঝাতে লাগলেন মরিচঝাঁপি ছেড়ে যাবার জন্য। আর সমস্ত মরিচঝাঁপি একসঙ্গে চিৎকার করে উত্তর দিল—"আমাদের লাশ নিয়ে যান, আমরা যাব না।' অনেক ভুলেছি কিন্তু ওদের সেদিনের কণ্ঠস্বর আজও কানে বাজে। তারপর ওরা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করল। কে জানে এইজন্যই ওরা এসেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—আপনারা কতদিন ধরে এখানে আছেন, কবে এসেছেন, কবে ফিরবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো নির্দ্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে পাশ কাটানো ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। শেষকালে বলে কিনা "ফেরবার জন্য তো আপনারা কিছু পাবেন না, আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা পৌছে দিচ্ছি।" কী স্পর্ধা! অবশ্য কথাগুলো বলেছিল খুবই ভদ্রভাবে। বীণাদি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আমাদের জন্য আপনাদের ভাবতে হবে না, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না।' ওরা শেষ পর্যন্ত চলে গেল।

এপার-ওপারে ওদের আলোর সিগন্যালে কথা হয়—শুনলাম এখনও পুলিশ আছে—আমরা গেলেই নাকি ধরবে। সত্যি হোক্ মিথ্যা হোক্, আমরা তো ওখানেই রইলাম। এদিকে রাত বাড়তে বাড়তে তো মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেল। তারপর আবার সেই সুনীল ভূইফোরের মত কোত্থেকে একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে হাজির। আমার সেদিন হঠাৎ প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটা মনে পড়েছিল। এপারে মানে

কুমিরমারীতে এসে শুনলাম পুলিশ সুকুমারকে (সুকুমার সর্বজন শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। এটা ওর অপরাধের একটা কারণ কিনা জানিনা) গরু খোঁজা করেও খুঁজে না পেয়ে আমরা যে বাড়িতে আমাদের ব্যাগ দুটো রেখেছিলাম (তাতে সামান্য দুচারটে জামা কাপড় আর গরম শাল ছিল) সে দুটোই রাগের চোটে নিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেদের মত আমাদের পেলে আমাদেরও নিয়ে যেত। জানিনা। শেষ রাতটুকু একটা বাড়ির বাইরের সিড়িতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে বসেই কাটিয়ে দিলাম। জায়গাটা বোধহয় যেখান থেকে স্টীমার ছাড়ে তার কাছাকাছি হবে। এখন আর ভাল মনে পড়ছে না। সুভাষ বোধহয় একটু তফাতে কোথাও ছিল। এখন সময় একটি লোক এসে আমাদের নানাবিধ প্রশ্ন করতে সুরু করল। "কোথায় যাইবেন? আপনারা কোথা থেকে আসতেছেন? কার বাড়িতে গেছিলেন?" একটা প্রশ্নেরও উত্তর না পেয়ে লোকটি বল্ল "দাদারা কথা কন না ক্যান?" এরকম জায়গায় ও এরকম সময়ে ভদ্রলোক বোধহয় কোনো মহিলার কথা ভাবতেই পারেন নি। 'দাদারা কথা কন না কেন' এ নিয়ে পরে আমরা নিজেরা অনেক হাসাহাসি করেছি।

ওখান থেকে ফিরে মনুমেন্টের তলায় বীণাদি একটি সভা করেছিলেন—তখন তো দিল্লিতে জনতা পার্টির সরকার, কলকাতার পার্টির লোকেরা সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন সাংসদ শক্তি সরকার। বীণাদি সেদিন যে কী অপূর্ব বল্লেন—এখন দুঃখ হয় কেন টেপ করে রাখিনি। প্রথমেই বল্লেন, ঠিক এইখানে, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনড়, অনমনীয়।

সময়টা সম্ভবত ১৯৭৯র মে মাস হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা ও আদেশ অনুসারে কয়েক শো, হাজারও হতে পারে, পুলিশ মরিচঝাঁপির লোকেদের লাঠি দিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে আধমরা করে, ওদের তৈরি সব ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে, জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেয়। সেদিন আমরা ওদের পাশে দাঁড়াতে পারিনি। এ লজ্জা, এ দুঃখ আমাদের রাখবার জায়গা নেই। এই অসম—যুদ্ধে বীণাদি আর আমি যে কিছু করতে পারতাম তা নয়— কিন্তু ওদের পাশে দাড়িয়ে ওদের সঙ্গেই তো মার খেতে পারতাম—সব নৃশংসতা, সব অত্যাচার ওদের সঙ্গেই ভাগ করে নিতে পারতাম! স্বপ্নভঙ্গের কষ্টটা থাকত কিন্তু লজ্জাটা মুছে যেত। লাইব্রেরি ঘরে অথবা স্কুলঘরে সুভাষচন্দ্রের একটি চমৎকার বড় ছবি টাঙ্গানো ছিল—পুলিশেরা সেটি লাথি মেরে নিচে ফেলে দিয়েছিল। আমরা, শুধু আমরা দুজন উপস্থিত থাকলেই এটা হতে পারত না। আমরা বেঁচে থাকতে ওদের স্পর্ধাই হতো না ঐ ছবি স্পর্শ করবার। না হয় বড়জোর হারাবংশী বীরের রক্তে নকল বুঁদিগড় ভেসেই যেত।

আমরা যে সেদিন থাকতে পারলাম না এ ব্যর্থতা এ লজ্জা বীণাদি সহ্য করতে পারেন নি—আমিও আমৃত্যু ভুলবনা। অথচ দুদিন আগে থেকেই আমরা ওখানে পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সরকার সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে

নিয়েছিল তখন—এমনকী, স্টীমলঞ্চ চলাচলও বন্ধ রেখেছিল। আমরা নানাভাবেই মরিচঝাঁপিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলাম। অবসর নেওয়ার পর আমি আমার স্বামীকে আর আমার ভগ্নীসমা বন্ধু মীরা সেনকে বলেছিলাম—এখন তো কিছুটা সময় দিতে পারি —এখন কিছুদিন কুমিরমারী একা থেকেই দেখিনা, এতবড় ব্যর্থতার প্রায়াশ্চিত্ত করতে পারি কিনা। কুমিরমারীতে তো অনেক কিছু করবার আছে—আর ওখানে থাকতে থাকতে দেখি না মরিচঝাঁপিতে আর একটা fight দিতে পারি কি না—The best and the last. বারাসাত, বসিরহাট ইত্যাদি যেখানে যেখানে ওরা ছড়িয়ে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের সময় লাগবে না। আমার স্বামী এবং মীরা দুজনে দুজনের ভাষায় আমাকে তাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন জালিনওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করেছিলেন— 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। আজ স্বাধীন ভারতে তার চাইতে শতগুন নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমরা কী করছি? প্রফুল্লচন্দ্র সেন অবশ্য মরিচঝাঁপি যেতেও চেয়েছিলেন,—অনশনও করতে চেয়েছিলেন। মোরারজী তখন প্রধানমন্ত্রী—তিনি অনুমতি দেননি। কোনো দলে থাকার এইটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধা—পদে পদে নিজের বিবেককে পরিত্যাগ করতে হয়। খুব ভাল মনে নেই, মোরারজী তখন বোধহয় লণ্ডনে জ্যোতিবাবুর সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন কিন্তু জ্যোতিবাবুরা মরিচঝাঁপিতে ওঁদের থাকতে দিতে রাজী হননি। পার্লামেন্টে তখন সি. পি. এম. দলের ২২ জন সদস্য, তাদের ভোটটা তো হাতছাড়া করা যায়না! তাতে কয়েক হাজার বঙ্গসন্তান মরলে আর কী করা যাবে!

আমি তো বলি সেই পাপেই মোরারজীর গদি গেল।

এ প্রসঙ্গে আরেক জনের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। তিনি হচ্ছেন প্রয়াত আই. সি. এস. শৈবাল গুপ্ত। বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে তো সাহায্য করেছেনই, তাছাড়া যতদিন দণ্ডকারণ্য থেকে আসা মানুষেরা মরিচঝাঁপিতে ছিলেন ততদিন প্রতিমাসে নীরবে নিঃশব্দে ওঁদের অর্থসাহায্য করে গেছেন এবং সেটা একেবারে দু, পাঁচ টাকা নয়। সে অর্থ 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি, সুন্দরবন', নামে যে সমিতি ওঁরা গড়েছিলেন সেইখানে জমা হতো। এমন বলিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ সাহসী রাজকর্মচারী এ যুগের ছেলে মেয়েরা ভাবতেও পারবেনা। আর একটা ঘটনা আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে—সেটা না বলে পারছিনা। আমি তখন একটি সর্বভারতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সভাপতির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, মরিচঝাঁপিতে কিছু সাহায্য করবার জন্য। (রামকৃষ্ণ মিশন নয় কিন্তু) উনি আমাকে একটা প্রশ্নও করেন নি, আমি সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি জানবার চেষ্টাও করেননি—দুদিনের মধ্যে আমার বাড়িতে শিশুদের জন্য কয়েকশো গুঁড়ো দুধের টিন, কয়েকশো কম্বল আর সামান্য কয়েক হাজার টাকা পৌঁছে গেল। বিশ্বাস করতে পারো ? — আসলে সেই সময় জনতা সরকার দিল্লি থেকে একটা পার্লামেন্টারি টিম পাঠিয়েছিল, মরিচঝাঁপিতে

গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। আমিও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছিলাম। ঐ টিমকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি সরকার নিজের টাকায় একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে এতগুলো জিনিস আমরা অনায়াসে নিয়ে গিয়ে দিতে পেরেছিলাম। সেদিন সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। দিল্লির প্রতিনিধিদের কাছেও মরিচঝাঁপির লোকেরা মিনতি করেছিল, 'আমরা কিছু চাইনা, শুধু এই মাটিটুকুতে আমাদের থাকবার অধিকার দিন'। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

প্রায় একই উত্তর দিয়েছিলেন। মীরার উত্তরটা শোনাই,—"কমলাদি, মরিচঝাঁপি যদি তুমি নাও যাও, ওরা কিন্তু তোমাকে কুমিরমারীতেই নজর রাখবে—৭দিন, ১৫ দিন না হয় একমাস, তারপর ওরা যেই দেখবে কুমিরমারীর লোকেদের সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে—তুমি ওদের আত্মীয়বৎ হয়ে গেছো, তৎক্ষণাৎ ওরা তোমায় মেরে ফেলে কাদার তলায় পুতে ফেলবে।"

অকাট্য সত্য—তবু ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছিলাম।

আমি জানি জীবনের তিন চতুর্থাংশ স্বপ্নই ভেঙ্গে যায়—এক চতুর্থাংশ হয়তো বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের যুদ্ধেও তো '৭১ এর মার্চ থেকে ৭২ এর মার্চ পর্যন্ত আমরা, (মানে বীণাদি, মীরা ও আমি) অত্যন্ত গভীর ভাবে যুক্ত ছিলাম। এবং ২৯শে মার্চ আমরাই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম — সেখানেও কি আঘাত পাবার মত কিছুই ঘটেনি? সব কিছুই কি প্ল্যান মাফিক হয়েছিল? হয়নি, তবু সে যুদ্ধ ছিল আমাদের গর্বের। আর মরিচঝাঁপির যুদ্ধ শুধুই লজ্জার, শুধুই গ্লানির।

তবু এটাই আমার শেষ কথা নয়—আমার শেষ কথা হলো Hold fast to your dreams, for if dreams die Life is a broken winged bird. That can not fly.

ইতি

বৌদি (কমলা বসু)

(সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে লিখিত চিঠি। জঃ মন্ডল)

পরিশিষ্ট—২

পূর্ব্ব-ভারত বাস্তুহারা সংসদ

পূর্বভারত বাস্তুহারা সংসদের শাখা কুপার্স ক্যাম্প উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গত ২৮ শে ও ২৯শে নভেম্বর ১৯৫৮ মহাসমারোহে ক্যাম্প উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত ক্যাম্পের উদ্বাস্তু প্রতিনিধি এবং বিহারের কুমারবাগ (বেতিয়া) ক্যাম্পের ও উড়িষ্যার চরবেতিয়া ক্যাম্পের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল এবং ২৯শে নভেম্বর প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এবং উদ্বোধন করেন প্রফেসার শ্রীহরিপদ ভারতী। প্রস্তাবাদি উত্থাপন ও সমর্থনে বক্তৃতা করেন বিভিন্ন ক্যাম্পের প্রতিনিধিগণ। বক্তাগণের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু, এডভোকেট শ্রীমনোরঞ্জন বসু, এডভোকেট শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীসুধাংশু জীবন গাঙ্গুলী, শ্রীনগেন্দ্র নাথ সিকদার, শ্রীশান্তিরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীগুরুদাস বিশ্বাস, শ্রীতারাপদ শাস্ত্রী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীভীষ্মদেব বিশ্বাস, শ্রীমণীন্দ্র নাথ কবিরাজ, শ্রীসূর্য্যকান্ত বিশ্বাস, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মল্লিক ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিকদার প্রভৃতি ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

গত ৩রা ও ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় অনুষ্ঠিত উচ্চপর্য্যায়ের সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান ক্যাম্পবাসী ৪৫ হাজার পরিবারের মধ্য হইতে ৩৫ হাজার কৃষক পরিবারের প্রায় ১৭ হাজার পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ ও ১৮ হাজার পরিবারকে মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও রাজস্থানে প্রেরণের বিষয় গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া এবং ইতিপূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পুনর্বসতির জন্য প্রেরিত উদ্বাস্তুদের একটি বৃহদংশ পুনর্বাসন কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ এবং বিহারেরর বেতিয়া ও উড়িশ্যার চরবেতিয়া ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া রানাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বভারত বাস্তুহারা সংসদের এই ক্যাম্প উদ্বাস্তু সম্মেলন নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

১। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চাষোপযোগী অনাবাদী জমি যাহার পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালের শস্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের স্বীকৃতি অনুসারে প্রায় ১০ লক্ষ একর এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর, আমেদের ১৯৫৬ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখের পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রদত্ত বিবৃতি অনুসারে ৮ লক্ষ একর, এই সব জমি উন্নয়ন করিয়া ৩৫ হাজার কৃষক পরিবারকে পরিবার প্রতি ৩

একর করিয়া মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার একর জমি কৃষির জন্য এবং আধবিঘা করিয়া বসতবাটীর জন্য মোট প্রায় ৬ হাজার একর, একুনে ১ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হউক এবং উন্নয়ন কৃত বাকী জমি স্থানীয় ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমিবিশিষ্ট কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক যাহাতে স্থানীয় পুরাতন অধিবাসীদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষ সৃষ্টি না হইতে পারে।

২। এই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ব্যাপক প্রতিষ্ঠাদ্বারা, যেখানে সম্ভব বড়বড় ক্যাম্পের সন্নিকটে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া উদ্বাস্তুদের এবং স্থানীয় পুরাতন অধিবাসীদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হউক।

৩। সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সম্মেলনের দৃঢ় অভিমত এই যে সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় এবং মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও রাজস্থানের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে তাহার এক তৃতীয়াংশ অর্থে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় শিল্পায়ন সম্ভব এবং এই রাজ্য মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন উপলক্ষে এই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। এরূপ উন্নয়নের দ্বারা যে শুধু উদ্বাস্তুদেরই উপকার হইবে তাহা নহে, এই রাজ্যের পুরাতন অধিবাসীদেরও প্রভুত উন্নতি সাধিত হইবে। ইহার ফলে রাজ্যের খাদ্যশস্যের ঘাটতি পুরণ হইবে এবং বেকার সমস্যা ও অনেকটা প্রশমিত হইবে। পক্ষান্তরে পুনর্বাসনের জন্য উদ্বাস্তুদের বাহিরে প্রেরণ করিলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় অর্থে এই রাজ্যের উন্নয়নের এই সুযোগ হইতে দেশবাসী চিরতরে বঞ্চিত হইবে, ফলে জাতীয় স্বার্থই ব্যাহত হইবে। এই সব যুক্তি উপেক্ষা করিয়া যদি সরকার উদ্বাস্তুদের বাঙ্গলার বাহিরে ও দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের জন্য জবরদস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে ও ইহাদের পুনর্বসতি না দিয়াই ১৯৫৯ সালের ৩১ শে জুলাইর মধ্যে সমস্ত ক্যাম্প তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে তবে উদ্বাস্তু স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থে উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকিবে না। অতএব এ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ও নীতি অবিলম্বে ঘোষণা করিবার জন্য এই সম্মেলন দাবী জানাইতেছে।

৪। এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে আবাদযোগ্য জমির অভাবহেতু উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বাসনের জন্য বাঙ্গলার বাহিরে ও দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিতে হইতেছে, সরকারের এই যুক্তি ও ঘোষণা জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার একটা অপকৌশল মাত্র যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের গত ১৪ই অক্টোবর তারিখের বিবৃতিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে সোনারপুর বাগজলা পরিকল্পনায় ৯/১০ হাজার উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারের পুনর্বাসনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল বিরোধিতায় তাহা সম্ভব হইল না। ডাঃ রায় আরও বলিয়াছেন যে ল্যাণ্ডে রেকর্ড দপ্তর কর্ত্তৃক সর্ব্বশেষ তদন্তে প্রকাশ যে হাওড়া ও হুগলীতে

কৃষিযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩০৭ একর এবং ২২৬৩৯ একর। সম্মেলনের মতে প্রতি পরিবারকে ৩ একর করিয়া জমি দিলে হাওড়া ও হুগলীর মোট ২৬৯৪৬ একর জমিতে ৮৯৪৬ টী পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি অনুসারে সোনারপুর বাগজোলা পরিকল্পনায় এবং হাওড়া ও হুগলী জেলায় ১৮ হাজার পরিবারের পুনর্বসতি হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া থানার নাঙ্গলার বিলে প্রায় ২৬ হাজার বিঘা নীচু পতিত জমি, ব্যারাকপুর মহকুমার বর্ত্তির বিলে সহস্র বিঘা নীচু জমি, ধাপা মানপুর মৌজায় প্রায় ৩৩ বর্গ মাইল পতিত জমি, যাত্রাগাছি ঘুনী মৌজায় ৮৫০০ বিঘা জমি, ক্যানিং থানার হেড়োভাঙ্গা, ঝড়খালি মৌজায় বহু সহস্র বিঘা জমি। হিরন্ময়পুর মৌজায় ৫ হাজার বিঘা পতিত জমি। সন্দেশখালী থানায় মরিচঝাঁপি মৌজায় সরকারের প্রায় ৫০ হাজার বিঘা পতিত জমি এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমায় বহু সহস্র বিঘা জমি ও মুর্শিদাবাদ হইতে বেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ কালান্তরের মাঠ প্রভৃতি স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা কৃষি যোগ্য অনাবাদী জমিতো পড়িয়াই আছে।

৫। এই সম্মেলন দুঃখের সহিত অনুধাবন করিয়াছে যে সরকারের বায়নানামা স্কীম অনুসারে ত্রিশ সহস্রাধিক উদ্বাস্তু পরিবার অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও প্রচুর অর্থ খরচ করিয়া গত তিন বৎসর যাবৎ বসতবাটী ও চাষের নিমিত্ত যে সব জমি ক্রয়ের জন্য বায়না করিয়াছিল পুনর্বাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদের শৈথিল্য টালবাহনা ও অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহা কার্য্যকর হয় নাই। সরকার ইচ্ছা করিলে এই বায়নানামা স্কীমে অন্ততঃ পক্ষে ১৫ হাজার পরিবারের এতদিনে পুনর্বাসন হইতে পারিত। কোথায়ও বা যথাযথ তদন্ত না করিয়াই বায়নাপত্র প্রত্যাখ্যান (রিজেক্ট) করা হইয়াছে, কোথাও বা জমি এলাকার এস, ডি, ও কিম্বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্তাবৎ এলাকার আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চলিবেনা এই মর্মে আদেশানুসারে, আর অনেক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা যে সব জমি চাষের যোগ্য মনে করিয়া এবং নিজের দায়িত্বে সেই সব জমিতে পুনর্বাসন নিতে ইচ্ছুক হইয়া বায়না করিয়াছে সেই সব জমি ও পুনর্বাসন বিভাগের কর্ম্মচারীরা চাষের অযোগ্য ঘোষণা করিয়া অসংখ্য বায়নানামা পত্র নাকচ করিয়াছে এবং হাজার হাজার বায়নানামা দীর্ঘ দুই তিন বৎসর ঝুলাইয়া রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। এই সম্মেলন সরকারের এবম্বিধ নীতির তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং অচিরে বায়না নামা স্কীম পুনঃ চালু করিয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সুযোগদানের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

৬। ১৯৫৯ সালে ৩১ শে জুলাই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ক্যাম্প তুলিয়া দেওয়া ও খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিবার সংকল্প সম্পর্কে গত ২৭শে নভেম্বর রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর বিবৃতি ও হুমকী এই সম্মেলন গভীর উদ্বোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই

ক্যাম্প ও খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করার এইরূপ হুম্‌কীর এই সম্মেলন তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছে। এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত এম.পি.এম.এল.এ ও এম. এল.সি. গণকে প্রধানমন্ত্রীর এইরূপ অবিবেচনা প্রসূত হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেও এবং হুমকি অনুসারে কার্য্য করিতে সরকারকে সর্ব্বশক্তি দিয়া বাঁধা প্রদান করিতে অনুরোধ জানাইতেছে এবং সরকার স্বীকৃত পশ্চিমবঙ্গের চাষোপযোগী অনাবাদী জমি উন্নয়ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের যাহাতে পুনর্বসতি হইতে পারে তাহার জন্য আইনসভার ভিতর ও বাহিরে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত ভাবে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও আন্দোলন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৭। এই সম্মেলন গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত অবগত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের উপর অকারণে নানারূপ নির্য্যাতন চলিতেছে এবং বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন নিবেদন করিয়াও তাহার কোন প্রতিকার বা কোনরূপ উত্তর পাওয়া যাইতেছে না। নানা অজুহাতে উদ্বাস্তুদের ডোল বন্ধ করা হইয়াছে ও হইতেছে। মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও দণ্ডকারণ্যে যাইতে রাজী করাইবার জন্য বিনা কারণে ডোল বন্ধ করা হইতেছে। এমনকি গত মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহে যোগদানের অপরাধে এবং মধ্য প্রদেশে যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় যাহাদের ডোল বন্ধ হইয়াছিল, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কয়েকটি পরিবারের ডোল বন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন কতগুলি মিথ্যা মামলা সরকার দীর্ঘকাল ঝুলাইয়া রাখিয়া উদ্বাস্তুদের অশেষ দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে। উক্ত বিষয়গুলির প্রতি এই সম্মেলন সরকারের বিশেষ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ইহার প্রতিকার দাবী করিতেছে।

৮। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নিমিত্ত সরকারের দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে এই সম্মেলনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ইহা শুধু একটি ব্যয় বহুল পরিকল্পনাই নহে ইহা একটি অবাস্তব ও অকার্য্যকরী পরিকল্পনাও বটে। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িশ্যা রাজ্যের তিনটি জেলা লইয়া ৩০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত এলাকায় মাত্র ১৬৮৯৬ টি পরিবার অর্থাৎ প্রায় ৮৫ হাজার অনাহার ক্লিষ্ট,অর্দ্ধমৃত ও অশিক্ষিত লোক ছড়াইয়া দিয়া দুইটি ভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যে অজানা অচেনা পরিবেশে একটি বাঙ্গালীর সমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলার প্রত্যাশা একটা অবাস্তব দুরাশা বা বাতুলতারই সামিল। ভারত সরকারের এই অর্থ কৃচ্ছ্রতার সময় শূন্যে দুর্গ নির্ম্মানের এই পরিকল্পনা বন্ধ রাখাই সমীচীন।

এই সম্মেলন বিনয়ের সহিত সরকারের নিকট এই সতর্কবাণী পেশ করিতেছে যে, সরকারী প্রলোভন ও চাপে পড়িয়া যে সব অজ্ঞ ও অসহায় উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যে যাইতে বাধ্য হইতেছে বা হইবে তাহারা কলেরা ও ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি, সভ্যতা বিবর্জিত ঐ অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে ছয়মাস হইতে এক বৎসরের অধিকাল

টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

৯। এই সম্মেলন নিম্নোক্ত দাবীর ভিত্তিতে আগামী ১২ই ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট একটি গণডেপুটেশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং সরকার এই দাবী মানিয়া না লইলে দাবী আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

দাবীসমূহ ঃ

ক) পশ্চিমবঙ্গের আবাদযোগ্য পতিত জমির উন্নয়ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পুনর্বসতি দিতে হইবে।

খ) বায়নানামা চালু করিতে হইবে এবং পুরাতন বায়নানামাগুলির সত্বর বিচারসহ নূতন বায়নানামা করিবার সুযোগ অবিলম্বে দিতে হইবে।

গ) সরকারী প্রতিনিধি এবং পূর্ব্বভারত বাস্তুহারা সংসদ সহ অন্যান্য উদ্বাস্তু সংগঠন হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটী ল্যাণ্ড কমিটি গঠন করিতে হইবে। উক্ত কমিটি রাজ্য মধ্যে বাসোপযোগী ও চাষোপযোগী জমির সন্ধান করতঃ পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিবে।

ঘ) উড়িষ্যা, বিহার ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যাগত যে সব উদ্বাস্তুকে স্পেশাল রিসিভিং সেণ্টারে ও ভবঘুরে আশ্রমে রাখিয়া ভবঘুরের পর্য্যায় ফেলা হইয়াছে তাহাদিগকে নিয়মিত উদ্বাস্তু স্বীকার করিয়া পুনর্বসতির সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

ঙ) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্যাম্প তুলিয়া দেওয়া চলিবেনা। ১৯৫৯ সালের ৩১ জুলাই মধ্যে সমস্ত ক্যাম্প তুলিয়া দেওয়ার সরকারী ঘোষণা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

চ) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সকল সুবিধা সুযোগ গ্রহণ ও সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করার পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে ও বাংলার বাহিরে উদ্বাস্তু প্রেরণ চলিবে না।

১০) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনোর জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় অর্থে এই পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নতি সাধন ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীতে প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সাহায্য, সহযোগিতা ও নৈতিক সমর্থন প্রদানের জন্য এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তিদের নিকট আবেদন জানাইতেছে।

১১) এই সম্মেলন ঘোষণা করিতেছে যে, উদ্বাস্তু ও জাতীয় স্বার্থে উদ্বাস্তুদের প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সকল উদ্বাস্তু সংস্থার সম্মিলিত সংগ্রামের নীতি গ্রহণ পূর্ব্বভারত বাস্তুহারা সংসদ বাঞ্ছনীয় মনে করে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের

সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য এই সম্মেলন কার্য্যকরী কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করিতেছে।

১২) এই সম্মেলন গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ক্যাম্পে টি বি রোগীদের চিকিৎসার বা স্পেসাল ডায়েটের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না, পক্ষান্তরে সে সব টি, বি, রোগী স্পেসাল ডায়েট পাইতেছিল তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্মেলন কর্ত্তৃপক্ষের এবংবিধ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা করার দাবী করিতেছে।

১৩) এই সম্মেলন বিহারের বেতিয়া ক্যাম্পের শ্রীমতী আলোরণী দে, শ্রী বিষ্ণু দে, শ্রী সুধীর মণ্ডল ও অন্যান্য কতিপয় বাস্তুহারা কর্মীকে বিনা বিচারে আটক রাখার সংবাদে গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে এবং অচিরে ইহাদিগকে বিনাশর্ত্তে মুক্তিদানের দাবী জানাইতেছে।

১৪) এই সম্মেলন দুঃখের সহিত অবগত হইয়াছে যে, ক্যাম্পে বসবাসকারী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার মতলবে স্কুল ও কলেজ হইতে ছাত্রদের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। এই সম্মেলন সরকারের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সরকারী সাহায্য ও পূর্ব্বাপর যে অবস্থায় ছাত্ররা অধ্যায়ন করিতেছিল তাহা চালু রাখিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছে।

১৫) বাঙ্গলার বাহিরে প্রেরিত ক্যাম্পবাসী হাজার হাজার উদ্বাস্তুর দুঃখ দুর্দ্দশার সংবাদে এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগ বোধ করিতেছে এবং তাহাদিগকে অচিরে সুষ্ঠু পুনর্বসতি দানের ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে। তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বসতি না হওয়া পর্য্যন্ত আর কোন উদ্বাস্তুকে বাঙ্গলার বাহিরে প্রেরণের সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এই সম্মেলন তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

১৬) যে সব অঞ্চলে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়া উদ্বাস্তুদের দ্বারা মাটিকাটান হইয়াছে তাহাদের সেই অঞ্চলে অথবা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হউক।

১৭) ক্যাম্প কর্ত্তৃপক্ষের কুট চক্রান্তের ফলে যে সব মিথ্যা মামলায় উদ্বাস্তুদের হয়রান করা হইতেছে, তাহা অবিলম্বে বিনা শর্ত্তে তুলিয়া লওয়া হউক।

(সম্মেলনের পরে প্রকাশিত প্রচারপত্র। জঃ মন্ডল)

পরিশিষ্ট—৩

MEMORANDUM TO THE MEMBERS OF PARLIAMENT WHENTHEY VISITED MARICHJHAPI

পার্লামেন্টের তদন্ত কমিটির নিকট মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির স্মারকলিপি।

[সুন্দরবনের এম.পি. শ্রীশক্তি সরকারের চেষ্টায় জনতা পার্টি মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের সমস্যা পর্যালোচনার জন্য পার্লামেন্টের তিন সদস্যের এক তদন্ত কমিটিকে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে পাঠান। প্রসন্নভাই মেহতার নেতৃত্বে মঙ্গলদেও বিশারদ ও ডঃ লক্ষ্মীনারায়ন পান্ডে ঐ তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁরা শক্তি সরকারের সঙ্গে মরিচঝাঁপিতে পৌঁছালে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি এক স্মারকলিপি দেন। বামফ্রন্ট সরকার ঐ দিন সাংবাদিকদের মরিচঝাঁপি যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। .....পৃষ্ঠার annexure সমেত পনেরো পৃষ্ঠার স্মারকলিপিতে সই করেন সমিতির সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ। এখানে স্মারকলিপি এবং গণহত্যার তথ্য সহ কিছু annexure ছাপা হল। — জ. মন্ডল]

To
Shri Prasannabhai Mehta
Leader, Enquiry Committee
Regarding Police Firing and other
inhuman torture on homeless, helpless
refugees at Netaji Nagar (Marichjhapi)
Sundarban, 24 Parganas, W. Bengal.

Dated : 22nd March, 1979

Sub : **Refugees from Dandrk to Sundarban**

Respected Sir,

On behalf of thirty thousand refugees of Marichjhapi, I beg to submit the following for your kind and sympathetic considerations. For 12 to 15 years, we were forced to live subhuman lives in various transit camps in Mana under retired Army personnels, were assaulted and tortured brutally by camp authorities and by the state police on various fabricated/concocted grounds lodged by the Army personnel and his pet groups in the local administration. We lost lives in police firing now and then, when

we wanted to redress our sufferings and salvation of our longstanding problems through proper enquiry/investigation. From time to time, we were arrested in the mana camp and the modesty of our young girls were molested by the local employees/C.R.P./, Police / S.A.F. and they let loose oppression on ordinary refugees. Even to-day, a large number of refugees are still in jails or have cases in different courts in Dandakaranya area.

In rehabilitation centres/sites whether in Dandakaranya or in other states we had to live like cows and buffellows in slaughter houses having little security of lives.

In Dandakaranya,

i) 3 to 5 acres of land divided into 4 to 5 plots and were allotted to each migrant families at a distance of 4 to 5 km. The villages were completely barren, covered with stony, sandy mud without any water supply facilities.

ii) The offices, markets, hospitals, ration distributing centres, etc., were located in far away places. The distance may be 15 to 20 km. from different villages and rehabilitation centres.

iii) Irregular payments of inadequate cash doles/rations/ medicines etc. from places far away from migrant villages reflect the harassment to migrants. The system of paying low wages to the refugees irregularly add to the harassment.

iv) Illtreatment of local authorities and the hostility of the Adivasis, lack of security and modesty of women and of justice compelled the migrant to desert their respective Rehabilitation sites/centres from February 1978. They took this decision as they were unable to find any way out of redressing their unlimited sufferings and fulfillment of their basic demands of effective resettlement through repeated prayers to the D.R.O. New Delhi.

* * * * *

The Left Front parties longed to resettle East Bengal refugees in Sunderban area from the very begining after the partition. Now and then, they consoled the migrants outside Bengal through mass meetings held for protesting police oppressions and other difficulties facing them with the promises that they would help the migrants to resettle in Sundarban if time would allow the Left Front to come to power, with the instruction/consent of Shri Jyoti Basu, honourable Chief Minister of West Bengal, Shri Ram Chatterjee,

Hon'ble State Minister for Civil Defence accompanied by Shri Ashoke Ghosh, the Secretary of the Forward Block.....went to Dandakaranya and other states to visit Migrant's position and conditions with their own eyes and to console them to their future steps of effective resettlement as promised from time to time.

* * * * *

The refugees coming from Dandakaranya gathered in Hasanabad and camped there nearly two months to find out proper way of earnings, livings and the policy and principles of the State Government towards refugees at Hasanabad.

After residing 15/20 days at Kumirmari without any obstruction from local authorities, we entered into plantation, Bagna, Marichjhapi in 24 Pargonas.

We started our new lives with a full arrangement of daily consumption such as living house, school, markets, roads, hospital, tubewells, etc. We managed to findout sources of income, also establishing cottage industry such as Bidi factory, Bakery, Carpentary, Weaving factory etc. and also built embankment nearly 150 miles long covering an area of nearly 30 thousand acres of land to be used for fishing, expecting an income of Rs. 20 crores per year. That may easily help and enable us to stand on our own feet. Moreover, after one or two years washing by rain water, preventing saline water to flow over, these lands will yield a lot of crops such as paddy and other vegetables.

* * * * *

We have distributed lands to Marichjhapi among six thousands refugee families in the shape of paras, villages and anchals. Nearly a thousand families built their houses in different plots in group system and have been residing there about a year.

Police Attack in Marichjhapi

On 20 August 1978, after long five months to our entry into Marichjhapi, the Government of West Bengal came to Marichjhapi with 30 launches carrying a large number of police to take back refugees to Dandakaranya. Their continued presence for 15 days failed to bring back a single family to Dandakaranya. This led to the attack of police on the refugees (Police launches) ran over 43 boats, breaking into pieces and also opened fire resulting deaths of two young refugee boys. The police with the help of the CPI(M)

followers attacked the boats of the refugees. The refugees ran away leaving their 157 boats behind loaded with timber and firewood costing nearly Rs. 3.50 lakhs including the cost of the boats.

The blockade

In the first week of November 1978, a news item published in the Ananda Bazar Patrika that the Govt. would not disturb the refugees in Marichjhapi. But the Govt. again rushed to Marichjhapi on 24th January 1978 with more power and means to oust the refugees forcibly, and send back to Dandak as soon as possible before 31 March and seiged by imposing Section 144 of I.P.C. all over the river around Marichjhapi, prevented the entry of foodgrains and other necessary commodities, water, medicine etc. from the nearest village, market, i.e. Kumirmari, Mollakhali, Satjelia etc. making the Marichjahpi completely isolated from all other civilized places.

The Attack

From the morning of 24 January '79 police started the oppression with the help of 30 launches and two steamers of B.S.F. by bursting teargas shell towards Marichjhapi, arrested people from their living houses in different plots by breaking down and setting fire to the house. They also looted all the articles i.e. foodgrains, clothings, bell-metal, plates, glass, brass pitches, gold ornaments, iron made articles, hard cash etc. The police also didnot hesitate to outrage the modesty of our women including three young girls. The police launces ran over refugee boats carrying foodgrains and necessary commodities. They beat the drowning passengers severely and prevented them from getting to the shore.

After a strong and strict barricade for 7 days, on 31.1.79, Refugee women, afraid of starvation death, attempted to cross the Bagna river to collect food and water from Kumirmari, the nearest village. The police with their launches attacked the boats in the river by throwing teargas shells violently, drowned the boats by dashing with the launches and attacked the drowning women by running over them repeatedly. The refugees standing on the otherside (Plantation) became impatient for fear of their painful death....and beating of the police, they rushed to help them by boats and also became the victim of the cruel police attack. By the by, the refugees and the local people gathered there to protest the brutal actions of the police on hungry helpless

refugees. The police became angry and opened fire indiscriminately resulting... death of 15 refugees and two local people including one woman.

The police arrested a large number of refugees, wounded persons, beating severely by gun barrels and pressed with boot-soles. The police by day and night strictly barricaded the island, started inhuman torture on the refugees everywhere, resulting arrest of nearly a thousand refugees including 500 persons selling and carrying foodgrains. Vegetables, clothing, etc. 375 persons died of starvation and diseases from consuming totally unfit food, 2 persons committed suicide by hanging, seizing of 100 boats loaded with foodgrains and other necessary commodities amounting a total loss of Rs. 4,15,142.00.

We protest strongly against some comments of Hon'ble Chief Minister of West Bengal on our activities in Marichjhapi.

(i) We are not establishing any parallel Government in Marichjhapi. We are poor and helpless people in the world having no place to live in. Any person may visit to see our condition from the very begining we are ready to talk with the Government. We are Indian citizens and are loyal to the Indian Constitution. It in quite impossible on the part of helpless, homeless poor refugees to form a parallel Government. Mr. Jyoti Basu accused us of running a parallel Government having connection with foreign powers only use as a pretext to oust the refugees from Marichjhapi. The accusation is a total lie.

(ii) We never demanded homeland. Even we do not know the definition of homeland. We never delivered any speech or published anything regarding homeland. We never brought any person from Khulna of Bangladesh.

Under the Circumstances stated above, the Udbastu Unnayan Samity and the homeless, helpless hungry refugees, may we earnestly request you to consider the following demands for immediate implementation.

Demands

1) Immediate removal / withdrawal of all sorts of police barricades including u/s 144 of the I.P.C. relating to reserve forest

from all the rivers around Marichjhapi, as it is not a reserve forest.

2) Immediate judicial enquiries are to be ordered in all the past events of police oppression and police firing of refugees on 31.1.79 with adequate compensation of the lost lives to their relatives and other compensation of foodgrains including boats, breaking down of houses, other valuables looted by the police.

3) Our basic demand is for effective resettlement in our beloved Marichjhapi bearing a lot of good hopes and bright future to the distressed and deprived Topshil (scheduled caste) refugees who have lost so many lives and last furthing of their whole life's earning.

4) An immediate release order may be passed to the refugees in Jail (arrested) under various sections, with the withdrawals of all cases against the refugees including refugee-ladies without any condition.

With best regards.

Yours sincerely,

(Sd/-) **Raiharan Baroi**
General Secretary
Udbastu Unnayanshil Samity
Netaji Nagar, Marichjhapi
P.O. Kumirmari
24 Parganas (W.B.)

পরিশিষ্ট—৩ (ক)

স্মারকলিপির সঙ্গে প্রদত্ত নথি

২৪/১/৭৯তারিখ হইতে অদ্য পর্যন্ত অবরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে মোট ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা ও পরবর্তী ঘটনার বিবরণ, ঘটনা অনুযায়ী পরে আরও জানানো হবে।

নং	বিবরণ	সংখ্যা	মোট পরিমাণ মূল্য
১।	৩১/১/৭৯তারিখে জ্যোতিবাবুর পুলিশের গুলিতে নিহত স্থানীয় লোক সহ উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ঃ—	১৪জন	১। অনাহারের দরুণ গলায় ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু ঃ— (১) ভানুমতী রায় স্বামী মনোরঞ্জন। বয়স ২১ বৎসর। (২) রঞ্জন মণ্ডল °কালীপদ মণ্ডল। বয়স ১৬ বৎসর।
২।	২৪/১/৭৯ তারিখ হতে খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে অনাহারে শিশুসহ মৃত্যুর মোট সংখ্যা ঃ—	১৩৬ জন	২। অনাহারে মৃত শিশুদের সংখ্যা — ৯৪ জন
৩।	২৪ জানুয়ারি হতে অবরোধের দরুণ গাছের লতাপাতা খেয়ে অসুখে এবং বিনা চিকিৎসায় শিশু সহ মোট মৃত্যুর সংখ্যা ঃ-	২৩৯ জন	৩। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু শিশুদের সংখ্যা —১৭৭ জন
৪।	৩১/১/৭৯ তারিখ জ্যোতিবাবুর পুলিশের গুলিচালনার দিন এবং বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের উপরে পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণের মোট সংখ্যা ঃ	২৪ জন	মোট সংখ্যা ২৭১ জন
৫।	৩১/১/৭৯ তারিখ পুলিশের গুলি চালনার ফলে এবং বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের ধর পাকড়ের ও অত্যাচারের দরুন নিখোঁজ ব্যক্তিদের মোট সংখ্যা ঃ	১২৮ জন	
৬।	৩১/১/৭৯ তারিখ গুলি চালনার দিন এবং বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থান হইতে জেলে আটক উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা ঃ—	৫০০ জন	

৭।	(ক) ২৪/১/৭৯ তারিখ হইতে জ্যোতিবাবুর পুলিশ কর্তৃক ঘর ভাঙ্গা ও ঘর পোড়ানোর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ	ভাঙা ঘরের সংখ্যা ১০০০ (একহাজার) ও পোড়ানো ঘরের মোট মূল্য	মোট মূল্য ১,০০,০০০.০০
	(খ) পুলিশ কর্তৃক ছিনতাই ও লুটতরাজের মোট মূল্য	সামগ্রী ছিনতাইয়ের মোট মূল্য ঃ	২,০০,০০০.০০
৮।	২৪/১/৭৯ তারিখ হইতে বিভিন্ন দিনে মরিচঝাঁপিতে পুলিশ কর্তৃক নৌকা ছিনতাইএর মোট সংখ্যা ঃ	১৬৩ খানা	১,৬৩,০০০.০০
৯।	২৪/১/৭৯ তারিখ হইতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ কর্তৃক চাউল আটা এবং বিভিন্ন সামগ্রী ছিনতাই এর মোট পরিমাণ এবং মূল্য ঃ	৬৪কুঃ ১৭ কেজি	১২,৩৬৪.০০
১০।	২৮/১/৭৯ তারিখ হইতে পুলিশ কর্তৃক টিয়ার গ্যাস, গুলি এবং বেপরোয়াভাবে লাঠি চার্জের ফলে আহতদের মোট সংখ্যা ঃ	১৫০ জন	
১১।	২৪/১/৭৯ তারিখ হইতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাট ও হাটবাজার হইতে পুলিশ কর্তৃক নগদ টাকা পয়সা ছিনতাই ঃ		২,৭৭৮.০০
		মোট	৪,৭৮,১৪২.০০

সার ঃ বিবরণী সহায়ক কাগজ পত্র সঙ্গে দেওয়া হইল।

পরিশিষ্ট—৩ (খ)

৩১শে জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে ও অত্যাচারে নিহত ব্যক্তির নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নিহত ব্যক্তির নাম	পিতা / স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	বাংলাদেশের গ্রাম ও জেলার নাম	দণ্ডকারণ্যে কোন ক্যাম্পে ছিল	মরিচঝাঁপিতে কবে এসেছেন	উদ্বাস্তু কার্ড নং	মন্তব্য
১।	রবীন সরকার	সর্বেশ্বর	২৫	—	—	”	বাজুয়া জেলা খুলনা	M/P-V No. = 4	বৈশাখমাস নেতাজীনগর১ ব্লক নং - এ	৭১২৫২	
২।	পাগল মণ্ডল	রূপচাঁদ	৪০	—	—	”	সোনীবন্দ জেলা খুলনা	এম.পি.ভি নং ৬৪/১০	”	৭৫৫২০	
৩।	শ্রীনাথ মণ্ডল	ইন্দ্র মণ্ডল	৩০	—	—	”	চান্নিচক্ খুলনা	মালকানগিরি	”	—	খড়্গপুর কার্ড ছিল না
৪।	ভবেন্দ্র নাথ রায়	ফুলচাঁদ	৪০	—	—	”	স্থানীয়	—	মার্চ মাস নেতাজীনগর১ ব্লক নং - সি	—	
৫।	ঝোনী বালা সরকার	সুধীর সরকার	৩৫	—	”	—	গ্রা ঃ রামনগর	এম.ভি. নং ৫৪	”	—	
৬।	বাসুদেব মণ্ডল	সুরেন মণ্ডল	২৫	—	—	”	,, গোবিন্দকাঠি	—	নেতাজীনগর -১ ব্লক নং - বি	—	
৭।	প্রবীনচন্দ্র রায়	হরিপদ রায়	২২	—	—	”	বিশ্বনাথপুর খুলনা	ইজগাও ক্যাম্প অন্ধ্রপ্রদেশ	ইং ৮/১০/৭৮ নেতাজীনগর৩ ব্লক নং - এ	—	

ক্রমিক নং	নিহত ব্যক্তির নাম	পিতা / স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	বাংলাদেশের গ্রাম ও জেলার নাম	দণ্ডকারণ্যে কোন ক্যাম্পে ছিল	মরিচঝাঁপিতে কবে এসেছেন	উদ্বাস্তু কার্ড নং	মন্তব্য
৮।	রবীন্দ্রনাথ শিকদার	শ্রী গয়ালী	৩০	—	—	”	গ্রাম বিরহী নদীয়া	—	৮/১০/৭৮ ইং নেতাজীনগর - এ	—	—
৯।	নিতাই হালদার	মনিন্দ্র	১৮	—	—	”	পিরোজপুর বরিশাল	মানা ক্যাম্প রায়পুর	২৩/৪/৭৮ নেতাজীনগর৩ ব্লক নং - সি	—	—
১০।	স্থানীয় ২ জন (ক) মেনকা মুন্ডা (খ) একটি ছেলে	স্বী ভূষণ	৪৫	—	”	—	কুমীরমারী	—	—	—	—
১১।	প্রিয়নাথ বিশ্বাস	বিনোদ	৩০	—	—	”	ফরিদপুর	মালকানগিরি	১০/৫/৭৮ নেতাজী নগর	—	—
১২।	দুঃখী রাম সরকার	পুন্যবরন	১৮	—	”	—	—	—	বৈশাখমাস নেতাজীনগর	—	—
১৩।	তারক সরকার	কেনারাম	৩৫	—	—	”	টিকেন খুলনা	—	জ্যৈষ্ঠ মাস নেতাজীনগর১	—	—
১৪।	ঝর্ণারানী মণ্ডল	সুশীল মণ্ডল	৫ মাস	”	—	—	বাগেরহাট খুলনা	—	নেতাজীনগর১	—	—

স্বাঃ রাইচরণ বাড়ৈ

পরিশিষ্ট—৩ (গ)

অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের নাম
নেতাজী নগর (মরিচঝাঁপি) ২৪.১.৭৯ হইতে

ক্রমিক নং	মৃত ব্যক্তিদের নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	মন্তব্য
১।	সতীশ চন্দ্র মণ্ডল	কালিপদ মণ্ডল	৩৫	—	—	”	
২।	হরিপদ কবিরাজ	বিমল কবিরাজ	২	”	—	—	
৩।	অনিতা বিশ্বাস	অভিলাস বিশ্বাস	১	”	—	—	
৪।	হারাধন সরকার	প্রফুল্ল সরকার	৪	”	—	—	
৫।	অঘোর মণ্ডল	ভগীরথ মণ্ডল	৪৫	—	—	”	
৬।	লক্ষ্মীরানী সরকার	বিনয় সরকার	৪	”	—	—	
৭।	খুকুরাণী সরকার	অনিল সরকার	৩	”	—	—	
৮।	আশালতা বিশ্বাস	শৈলেন বিশ্বাস	২মাস	”	—	—	
৯।	কল্পনা মণ্ডল	নির্ম্মল মণ্ডল	৩১/২ মাস	”	—	—	—
১০।	কালিদাসী মণ্ডল	নির্ম্মল মণ্ডল	৫মাস	”	—	—	
১১।	সবিতা রায়	বিশ্বনাথ রায়	৫মাস	”	—	—	
১২।	বনদেবী মণ্ডল	হেমনাথ মণ্ডল	৭মাস	”	—	—	
১৩।	কালীদাসী রায়	দূর্গাপদ রায়	৭মাস	”	—	—	
১৪।	তুলসী বিশ্বাস	জিতেন বিশ্বাস	২	”	—	—	
১৫।	যোগীন্দ্র মণ্ডল	নটবর মণ্ডল	৩৬	—	—	”	
১৬।	শ্মশানী মণ্ডল	নগেন্দ্র মণ্ডল	৫	”	—	—	
১৭।	খোকন কবিরাজ	হরিপদ কবিরাজ	৩	”	—	—	
১৮।	কানাই মণ্ডল	শশীভূষণ মণ্ডল	৭০	—	—	”	
১৯।	শিবরাম মণ্ডল	জগন্নাথ মণ্ডল	৩০	—	—	”	
২০।	সাধন মণ্ডল	মন্মথ মণ্ডল	২৬	—	—	”	
২১।	অবনী মণ্ডল	সুরেন মণ্ডল	৩৫	—	—	”	
২২।	গোপাল মণ্ডল	যোগেন্দ্র মণ্ডল	৫০	—	—	”	
২৩।	সুবোল মণ্ডল	হরিপদ মণ্ডল	৫৫	—	—	”	
২৪।	সোনাতন মণ্ডল	বাশীরাম মণ্ডল	৩৫	—	—	”	
২৫।	কালিপদ মণ্ডল	নির্ম্মল মণ্ডল	৬মাস	”	—	—	
২৬।	বিদ্যুত সরকার	খগেন সরকার	৫মাস	”	—	—	
২৭।	ঊর্মিলা মণ্ডল	তারাপদ মণ্ডল	৩মাস	”	—	—	
২৮।	সর্ব্বেশ্বর মণ্ডল	কালিনাথ মণ্ডল	৬০		—	”	

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা
২৯।	সুমন্ত সরকার	আহ্লাদ সরকার	৩মাস	„	—	—	
৩০।	খুকু কির্ত্তনীয়া	সুমন্ত	২ „	„	—	—	
৩১।	তারাপদ মণ্ডল	ঁযোগেন্দ্র	৩৫	—	—	„	
৩২।	মঙ্গল সরকার	ঁমাদার	১মাস	„	—	—	
৩৩।	মণিন্দ্র নাথ মণ্ডল			—	—	„	
৩৪।	ফকির রায়	ঁশ্যামাচরণ	৬০	—	—	„	
৩৫।	পবন রায়	ঁবসন্ত	৬০	—	—	„	
৩৬।	লালমোহন রায়	ঁমানিক	৪৫	—	—	„	
৩৭।	আনন্দ মণ্ডল	ঁযোগেন্দ্র	৩৫	—	—	„	
৩৮।	দূর্গাবালা সানা		৬০	—	„	—	
৩৯।	তপনচন্দ্র মিস্ত্রী	শ্রীপরেশ	৩	„	—	—	
৪০।	রামপদ বৈদ্য	শ্রীতারাপদ	২	„	—	—	
৪১।	অন্নদাচরণ বাড়ৈ		৭০	—	—	„	
৪২।	সুভাষ হালদার	প্রেমানন্দ	১	„	—	—	
৪৩।	অনিতা পাল	শ্রমতী প্রভাতী	৩	„	—	—	
৪৪।	খুকী পাল	„	১	„	—	—	
৪৫।	স্বপ্নারাণী বিশ্বাস	G/F শৈলেন	২	„	—	—	
৪৬।	বিনোদবিহারী বৈদ্য		৫৫	—	—	„	
৪৭।	বাবুলচন্দ্র সরকার	সত্যরঞ্জন	৪	„	—	—	
৪৮।	মানিক রায়	উপেন রায়	১	„	—	—	
৪৯।	স্বরস্বতী কয়াল	মহেন্দ্র কয়াল	২	„	—	—	
৫০।	বেলুমতী রায়	সুবল রায়	৩৫	—	„	—	
৫১।	বিকাশচন্দ্র পাল	বিমল পাল	৫	„	—	—	
৫২।	সুমিত্রা বালা	দেবেন্দ্র বালা	৪	„	—	—	
৫৩।	স্বদেশী সরকার	হরিপদ সরকার	৪	„	—	—	নেঃ নঃ১নং
৫৪।	পাচি মণ্ডল	অভিরাম মণ্ডল	১	„	—	—	„
৫৫।	অনুপ কুমার দে	তপন দে	২মাস	„	—	—	„
৫৬।	অতুল মণ্ডল	শৈলেন মণ্ডল	৬০	—	—	„	„
৫৭।	জয়দেব মণ্ডল	শৈলেন মণ্ডল	১মাস	„	—	—	„
৫৮।	মিনতী হালদার	চিত্তরঞ্জন	১	„	—	—	„
৫৯।	সুবোধদাসী সরকার	শিবপদ সরকার	৪মাস	„	—	—	„
৬০।	ফকীর চাঁদ মণ্ডল	ঁরশিক	৬৫	—	—	„	„

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা
৬১।	সারথী মণ্ডল	প্রভাত মণ্ডল	২৫	—	„		নেতাজীনগর -১
৬২।	খুকুমনী রায়	বিপিন রায়	২মাস	„	—	—	„
৬৩।	নমিতা মণ্ডল	ভরত মণ্ডল	৩	„	—	—	„
৬৪।	লক্ষ্মী মণ্ডল	অরবিন্দ মণ্ডল	৩	„	—	—	„
৬৫।	পরিতোষ মণ্ডল	উপেন্দ্র মণ্ডল	৬ বঃ	„	—	—	„
৬৬।	গীতারাণী মণ্ডল	শিবনাথ	৬ বঃ	—	—	—	„
৬৭।	সুন্দরী মিস্ত্রী	অখিল মিস্ত্রী	১ বঃ	„	—	—	„
৬৮।	পাগোল মিস্ত্রী	অরবিন্দ মিস্ত্রী	২মাস	„	—	—	„
৬৯।	রতন অধিকারী	মনোহর	৬বঃ	„	—	—	„
৭০।	গণেশ পাড়ই		৫২বঃ	—	—	„	„
৭১।	খোকন মণ্ডল	পতিরাম মণ্ডল	১মাস	„	—	—	„
৭২।	রমেশ গাইন	রণজিত গাইন	১ বঃ	„	—	—	„
৭৩।	দ্বিপদ মণ্ডল	ফটিক মণ্ডল	১ „	„	—	—	„
৭৪।	বাসন্তী ঢালী	বিনোদ ঢালী	২ „	„	—	—	„
৭৫।	কৃষ্ণপদ ঢালী	বিনোদ ঢালী	৭ „	„	—	—	„
৭৬।	রাধে মণ্ডল	দুলাল মণ্ডল	২৫বঃ	—	„	—	„
৭৭।	মহাদেব মৃধা	খগেন মৃধা	১মাস	„	—	—	„
৭৮।	সুন্দরী ঢালী	নিরাপদ ঢালী	৩মাস	„	—	—	„
৭৯।	লক্ষ্মী বিশ্বাস	অমূল্য বিশ্বাস	৩বঃ	„	—	—	„
৮০।	কালিপদ মণ্ডল	নবকুমার মণ্ডল	৩৫	—	—	„	„
৮১।	শান্তিরাণী সরকার	অতুল সরকার	৩ বঃ	„	—	—	„
৮২।	গোপাল সরকার	অতুল সরকার	২ বঃ	„	—	—	„
৮৩।	ভাত্রী সরকার	ঁমাদার সরকার	৬০	—	—	„	„
৮৪।	পঙ্কজ মণ্ডল	বিনোদ মণ্ডল	৭ বঃ	„	—	—	„
৮৫।	সুচিত্রা মণ্ডল	বসন্ত মণ্ডল	৪ বঃ	„	—	—	„
৮৬।	বিমান বাইন	মান্দার বাইন	৪ বঃ	„	—	—	„
৮৭।	শান্তিরাণী সরদার	বিমল সরদার	৭মাস	„	—	—	„
৮৮।	অনিল ঘরামী	প্রতাপ ঘরামী	৩৫বঃ	—	—	„	„
৮৯।	ডালিম সরদার	ভবতোষ সরদার	১ বঃ	„	—	—	„
৯০।	বিজলী মণ্ডল	শ্যামাপদ	২ বঃ	„	—	—	„
৯১।	বিকাশ গোলদার	নিশীকান্ত	৪ বঃ	„	—	—	„
৯২।	নিশীকান্ত মণ্ডল	সুধীর মণ্ডল	২ বঃ	„	—	—	„

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা
৯৩।	নিরঞ্জন মণ্ডল	নির্ম্মল মণ্ডল	৮ বঃ	„	—	—	নেতাজীনগর -১
৯৪।	বিজন মণ্ডল	ননী গোপাল	৩ বঃ	„	—	—	„
৯৫।	কমলা অধিকারী	সুধন্য অধিকারী	১ বঃ	„	—	—	„
৯৬।	ফুলমতী সরকার	পশুপতি	৫০	—	„	—	„
৯৭।	নিলিমা মণ্ডল	সুধীর মণ্ডল	৩ বঃ	„	—	—	„
৯৮।	রশিক সরদার	বাসুদেব	৪মাস	„	—	—	„
৯৯।	দুলালী হালদার	চিত্তরঞ্জন	১	„	—	—	„
১০০।	খুকুমনী রায়	গুরুপদ রায়	১৫দিন	„	—	—	„
১০১।	প্রভাষ সানা	সুরেন সানা	৪মাস	„	—	—	„
১০২।	সবিতা মণ্ডল	নকুলচন্দ্র	৬মাস	„	—	—	„
১০৩।	নারায়ণী মহন্ত	রবীন্দ্র মহন্ত	২ বঃ	„	—	—	„
১০৪।	মহানন্দ বৈরাগী	কুমুদ বৈরাগী	৪ বঃ	„	—	—	„
১০৫।	সুধা বৈরাগী	কুমুদ বৈরাগী	৫মাস	„	—	—	„
১০৬।	শম্ভু মণ্ডল	পুলিন মণ্ডল	৫ বঃ	„	—	—	„
১০৭।	হেমন্ত মণ্ডল		৭০	—	—	„	„
১০৮।	কৃষ্ণপদ রায়	শিবপদ রায়	৬২	—	—	„	„
১০৯।	নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	ঁফকির মণ্ডল	৪৫	—	—	„	„
১১০।	ফকিরচাঁদ সাহা	ঁঝড়ু সাহা	৬০	—	—	„	„
১১১।	সুভাষ শীল	রতন শীল	৩ বঃ	„	—	—	„
১১২।	খুকী মণ্ডল	রঙ্গলাল	৩মাস	„	—	—	„
১১৩।	গান্ধারী বর্ম্মন	ঁলক্ষন বর্ম্মন	৬০	—	„	—	„
১১৪।	শুক্রী বর্ম্মন	কৃষ্ণপদ	১ বঃ	„	—	—	„
১১৫।	গোবিন্দ মণ্ডল	রাজবিহারী	২৮	—	—	„	„
১১৬।	বিমল পাল	কাঙ্গাল	৫৫	—	—	„	„
১১৭।	তপন বৈদ্য	বঙ্কিম বৈদ্য	১ বঃ	„	—	—	„
১১৮।	মঞ্জু মিস্ত্রী	প্রফুল্ল মিস্ত্রী	৪ বঃ	„	—	—	„
১১৯।	সুব্রত মণ্ডল	বিপ্রদাস	৩ বঃ	„	—	—	„
১২০।	নিরঞ্জন সরকার	শাত্মরাম	৩ বঃ	„	—	—	„
১২১।	দুলাল হালদার	ধীরেন	৪ বঃ	„	—	—	„
১২২।	রবিন বাছাড়	প্রভাষ বাছাড়	৮ বঃ	„	—	—	„
১২৩।	রিক্তা মিস্ত্রী	কৃষ্ণপদ	২ বঃ	„	—	—	„
১২৪।	কুন্তিবালা বিশ্বাস	মনোরঞ্জন	২ বঃ	„	—	—	নেতাজীনগর ২নং

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা
১২৫।	রাজবিহারী মণ্ডল	ঁমণিন্দ্র	৭৫	—	—	„	নেঃ নঃ ৩নং
১২৬।	তারকদাসী গাইন	কিরন গাইন	১০বঃ	„	—	—	„
১২৭।	দিবুকর গাইন	ফটিক	১২বঃ	„	—	—	„
১২৮।	লক্ষ্মী মণ্ডল	শ্রীটিকেন	৭মাস	„	—	—	„
১২৯।	শশ্মানী মণ্ডল	শ্রীনগেন	৩	„	—	—	নেঃ নঃ ২নং
১৩০।	সীমা হালদার	শান্তি	২	„	—	—	নেঃ নঃ ৩নং
১৩১।	খুকী ঘরামী	নগেন ঘরামী	৩	„	—	—	„
১৩২।	বাসন্তী সরকার	সন্তোষ	৬মাস	„	—	—	নেঃ নঃ ২নং
১৩৩।	পাচী মণ্ডল	ঈশ্বরভূষণ	২মাস	„	—	—	নেঃ নঃ ৩নং
১৩৪।	কণিকা ঘরামী	কানাই ঘরামী	৬ বঃ	„	—	—	„
১৩৫।	নটবর মণ্ডল	প্রসাদ মণ্ডল	৪ বঃ	„	—	—	„
১৩৬।	পচা মণ্ডল	কৃষ্ণপদ	৩মাস	„	—	—	„

রাইহরণ বাড়ৈ
সাধারণ সম্পাদক
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
(সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ঘ)

২৪শে জানুয়ারী অবরোধের পর হতে অন্নাভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে এবং বিনা চিকিৎসায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের নাম নিম্নে বর্ণিত হল।

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	রেণুকা মণ্ডল	বিমল মণ্ডল	৩বঃ	,,	—	—	নেঃনঃ১	টাইফয়েড
২।	সুশান্ত মণ্ডল	জিতেন মণ্ডল	২মাস	,,	—	—	,,	ডাইরিয়া
৩।	অনিমা মণ্ডল	জিতেন মন্ডল	৩বঃ	,,	—	—	,,	আমরোগ
৪।	ঝরনা মণ্ডল	সুনীল মণ্ডল	৫মাস	,,	—	—	,,	,,
৫।	মহানন্দ মণ্ডল	হেমন্ত মণ্ডল	৯বঃ	,,	—	—	,,	কলেরা
৬।	আরতী সরদার	খগেন সরদার	৬মাস	,,	—	—	নেঃন১/c	পেটেররোগ
৭।	বিনয় মণ্ডল	বসন্ত মণ্ডল	১০মাস	,,	—	—	,,	,,
৮।	প্রতিভা গোলদার	সুনীল গোলদার	৮ ,,	,,	—	—	,,	,,
৯।	জগদীশ মণ্ডল	শ্রীশচীন	১১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১০।	শিউলি রায়	সুনীল রায়	১বঃ	,,	—	—	নেঃনঃ৩	,,
১১।	খোকন পরামানিক	হারান	৫,,	,,	—	—	,,	,,
১২।	কামিনী রায়		৫০ ,,	—	,,	—	,,	ডাইরিয়া
১৩।	কনক রায়	গোপাল	৬০ ,,	—	,,	—	,,	,,
১৪।	নকুল রায়	গনেশ রায়	৭৫ ,,	—	—	,,	,,	,,
১৫।	পারুল হাওলাদার	শ্রীহরেন্দ্র	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬।	অরবিন্দ মৃধা	চন্ডীরাম	৮মাস	,,	—	—	,,	,,
১৭৯।	সান্তনা হালদার	বাল্যক	২ ,,	,,	—	--	,,	,,
১৮।	সরোজিত সানা	শ্রীসতীশ	১৪বঃ	,,	—	—,,	,,	
১৯।	নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	বাঞ্ছারাম	৫৫ ,,	—	—	,,	,,	,,
২০।	ভাস্কর সরকার	কিরণ সরকার	৫ ,,	,,	—	—	নেঃনঃ২	,,
২১।	আত্মারাম	দ্বারিক	৬০ ,,	—	—	,,	,,	,,
২২।	বিনোদ বৈদ্য	বনমালী বৈদ্য	৬৫ ..		—	,,	,,	,,
২৩।	হরিপদ সরকার	হরেন সরকার	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
২৪।	খোকন গাইন	নিরঞ্জন পাইন	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
২৫।	খুকু সানা	হরেন সানা	৮ ,,	,,	—	—	,,	,,
২৬।	খোকন সরকার	পতিত সরকার	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
২৭।	ভক্তরাম পাইক	তারাপদ	২৮ ,,	,,	—	,,	,,	,,
২৮।	বিমল বাড়ৈ	গনেশ	২৪ ,,	—	—	,,	১/B	,,

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
২৯।	হরেন বাড়ৈ	শ্রী যোগেশ	৩০ ,,	—	—	,,	১/A	ডাইরিয়া
৩০।	প্যায়ারীমোহন রায়	পূর্ণচরণ	৪০ ,,	—	—	,,	১/C	,,
৩১।	হরিহর চাকলাদার		৬০ ,,	—	—	,,	১/B	,,
৩২।	অনিতা ঘরামী	শান্তরাম	১৭ ,,	—	,,	—	৩/C	,,
৩৩।	অঞ্জনা রাণী ঘরামী	পরিতোষ	১৬ ,,	—	,,	—	,,	,,
৩৪।	পাঁচুরাম সানা	সতীশ	২২ ,,	—	—	,,	,,	আমরোগ
৩৫।	রাধাপদ মিস্ত্রী	যজ্ঞেশ্বর	৪০ ,,	—	—	,,	,,	,,
৩৬।	সবিতা গাইন	দুলাল গাইন	৪ ,,	,,	—	—	৩/B	ডাইরিয়া
৩৭।	খোকন সরকার	সন্তোষ	৮ মাস	,,	—	—	৩/A	,,
৩৮।	রণজিত সরকার	রাধাকান্ত	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
৩৯।	খুকুরাণী সরদার	সন্ধ্যারাণী	৩বঃ	,,	—	—	৩/C	,,
৪০।	পরিমল মণ্ডল	শশধর	২বঃ	,,	—	—	,,	,,
৪১।	পরিমল হালদার	ধীরেন	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪২।	নমিতা মণ্ডল	টিকেন	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪৩।	রীনা হালদার	প্রভাষ	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪৪।	অনিল গোলদার	সতু	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪৫।	সুলতা গোলদার	রাধাপদ	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪৬।	নিরাপদ মণ্ডল	নির্ম্মল	২,,	,,	—	—	,,	,,
৪৭।	পরিতোষ পরামানিক	হারান	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
৪৮।	কেনারাম সরদার	পরেশ	৬৫ ,,	—	—	,,	৩/D	,,
৪৯।	রাধাকান্ত মণ্ডল	রাজেন্দ্র	৫৫ ,,	—	—	,,	৩/C	,,
৫০।	প্রহ্লাদ রপতান	খোকন	১ ,,	,,	—	—	নেঃ নঃ ১	,,
৫১।	গীতা রাণী রপতান	খোকন	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫২।	স্বপ্না রানী রায়	বিনোদ	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫৩।	প্রাণেশ্বর মণ্ডল	বিরেশ্বর	৬০ ,,	—	—	,,	আমরোগ	,,
৫৪।	অর্চনা রাণী গোলদার	বীরেন	৬ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫৫।	সদানন্দ সরকার	নরেন্দ্রনাথ	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫৬।	ক্ষিতিষ বাড়ই	খগেন্দ্রনাথ	৮ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫৭।	পূর্ণিমা মণ্ডল	বিভূতি মণ্ডল	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
৫৮।	ফুলিবালা মণ্ডল	সর্ব্বেশ্বর	৬০ ,,	—	,,	—	,,	,,
৫৯।	বিশ্বনাথ সানা	কনেক সানা	৩ ,,	,,	—	—	,,	কলেরা
৬০।	কণিকা মণ্ডল	ধনঞ্জয়	২ ,,	,,	—	—	,,	,,

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
৬১।	অন্নদা বিশ্বাস	বলাই	২০„	—	—	„	„	„
৬২।	সুকুমার সানা	প্রভাষ সানা	১„	„	—	—	„	„
৬৩।	পূর্ণিমা সরকার	অরবিন্দ	২„	„	—	—	„	„
৬৪।	সনাতন বৈরাগী	নিমাই	২„	„	—	—	„	ডাইরিয়া
৬৫।	অমরী রায়	হরিপদ রায়	৫„	„	—	—	„	„
৬৬।	ভাদরী রায়	হরিপদ	৮মাস	„	—	—	„	„
৬৭।	পাঁচীদাসী রায়	মনমথ	৭০বঃ	—	„	—	„	„
৬৮।	শিশির রায়	মনোরঞ্জন	৯মাস	„	—	—	„	„
৬৯।	কালিদাসী রায়	নরেন্দ্রনাথ	৫বঃ	„	„	—	„	„
৭০।	বিশ্বজিৎ রায়	নরেন্দ্রনাথ	১„	„	—	—	„	„
৭১।	কৌশল্যা সরকার	হরেন সরকার	৪৫„	—	„	—	„	„
৭২।	মালতী তরফদার	হরেন্দ্র নাথ	৪৫„	—	„	—	„	„
৭৩।	খোকন মণ্ডল	ভোলানাথ	৫মাস	„	—	—	„	„
৭৪।	অর্জুন গাইন	বিশ্বনাথ	৭০বঃ	—	—	„	„	„
৭৫।	মনষারাণী রায়	অনিল রায়	৪„	„	—	—	„	„
৭৬।	বিশ্বজিৎ রায়	অনিল রায়	১„	„	—	—	„	„
৭৭।	সত্যজিৎ রায়	অনিল রায়	৩মাস	„	—	—	„	„
৭৮।	রবীন গোলদার	প্রহ্লাদ	৭বঃ	„	—	—	„	„
৭৯।	খোকন মণ্ডল	অরবিন্দু	৫দিন	„	—	—	„	আমরোগ
৮০।	নারায়ন মণ্ডল	অরবিন্দু	৫বঃ	„	—	—	নেঃ নঃ ১	ডাইরিয়া
৮১।	উদয় মণ্ডল	অতুল	২„	„	—	—	„	„
৮২।	সতীশ সরকার	নন্দরাম	৬৫„	—	—	„	„	„
৮৩।	পঞ্চানন সরকার	গোবিন্দ	৭মাস	„	—	—	„	„
৮৪।	ননীবালা মণ্ডল	গোপাল	৫৫বঃ	—	„	—	„	„
৮৫।	মানিক বাছাড়	বাবুরাম	৫„	„	—	—	„	„
৮৬।	রানিবালা মণ্ডল	রাজেন্দ্র	৬০„	—	„	—	„	„
৮৭।	বিভারাণী রায়	শৈলেন রায়	২„	„	—	—	„	কলেরা
৮৮।	পশুপতি শীল	প্রফুল্ল	৩„	„	—	—	আমরোগ	„
৮৯।	শশঙ্কর মণ্ডল	জিতেন	৩মাস	„	—	—	„	„
৯০।	সবিতা মণ্ডল	তুষারকান্তি	৩বঃ	„	—	—	„	„
৯১।	অর্পণা মণ্ডল	তুষারকান্তি	২„	„	—	—	১/B	কলেরা
৯২।	জীবনকৃষ্ণ সরকার	যতীন	২১„	—	—	„	„	„

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
৯৩।	যশোমন্ত সরকার	যতীন	২„	—	—	„	„	„
৯৪।	সুচিত্রা মণ্ডল	নগেন্দ্র	২„	„	—	—	„	ডাইরিয়া
৯৫।	সুধারাণী মণ্ডল	উপেন মণ্ডল	৭বঃ	„	—	—	„	„
৯৬।	অঞ্জলী মণ্ডল	উপেন মণ্ডল	৩„	„	—	—	„	„
৯৭।	শেফালী মণ্ডল	উপেন মণ্ডল	৮মাস	„	—	—	„	„
৯৮।	ললিতা বিশ্বাস	প্রফুল্ল	৮„	„	—	—	„	„
৯৯।	সঞ্জীব মণ্ডল	অমূল্য	২„	„	—	—	„	„
১০০।	হারাধন মণ্ডল	নরেন মণ্ডল	২„	„	—	—	„	„
১০১।	হিমাংশু মণ্ডল	শচীন মণ্ডল	৬„	„	—	—	„	„
১০২।	কালিদাসী মণ্ডল	রাধাকান্ত	৮„	„	—	—	„	„
১০৩।	সূর্য্যমণী মণ্ডল	যদুবর	৬০বঃ	—	„	—	„	„
১০৪।	খুকুমনী সানী	ফনীভূষণ	৭মাস	„	—	—	„	„
১০৫।	শ্যামলী মণ্ডল	বিনোদ	১বঃ	„	—	—	„	„
১০৬।	ডালিম মণ্ডল	বিনোদ	৩বঃ	„	—	—	„	„
১০৭।	জানকী মণ্ডল	বাবুরাম	৫„	„	—	—	„	„
১০৮।	নবীদাসী মণ্ডল	যদুনাথ	৭০„	—	„	—	„	„
১০৯।	নিবাস মল্লিক	তারাপদ	৭মাস	„	—	—	„	„
১১০।	প্রদিপ দেবনাথ	গোকুল	৩বঃ	„	—	—	„	„
১১১।	অনিতা সরকার	নিরাপদ	৩„	„	—	—	„	„
১১২।	লক্ষ্মীরাণী সরকার	সুপদ	৫„	„	—	—	„	„
১১৩।	ফুলমালা সরকার	সুপদ	২মাস	„	—	—	নেঃ নঃ ১/B	„
১১৪।	বকুলবালা সরকার	শ্রীবিষ্ণুপদ	৪৫„	—	„	—	„	„
১১৫।	দুঃখীরাম মণ্ডল		৭০„	—	—	„	„	„
১১৬।	সুচিত্রা মণ্ডল	কেনারাম	৩„	„	—	—	„	কলেরা
১১৭।	বিকাশ মণ্ডল	বিনোদ	১„	„	—	—	„	„
১১৮।	সুহাশীনি মণ্ডল	বিনোদ	৩„	„	—	—	„	„
১১৯।	খুকুমনী বর্ম্মণ	শরৎচন্দ্র	৭দিন	„	—	—	আমরোগ	„
১২০।	সবিতারাণী মণ্ডল	রাজেন্দ্র	৩বৎ	„	—	—	„	„
১২১।	মংগলী মণ্ডল	মণিন্দ্রনাথ	৬মাস	„	—	—	„	„
১২২।	পলী মণ্ডল	প্রফুল্ল	২০বঃ	—	„	—	„	ডাইরিয়া
১২৩।	বিশ্বনাথ মণ্ডল	প্রফুল্ল	৩„	„	—	—	„	„
১২৪।	আশালতা গাইন	উপেন্দ্র	৪„	„	—	—	„	„

ক্রমিক নং মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
১২৫। সুমতী মণ্ডল	*পাগোল	৬০ ,,	—	,,	—	,,	,,
১২৬। নিধান মণ্ডল	সুবল মণ্ডল	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১২৭। কৃষ্ণপদ রায়	বিনোদ	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
১২৮। রাখাল মিস্ত্রী	শরৎচন্দ্র	৮ ,,	,,	—	—	,,	,,
১২৯। কবিতা মিস্ত্রী	শরৎচন্দ্র	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৩০। খুকুমনী মণ্ডল	অভিনাস	৭ দিন	,,	—	—	,,	,,
১৩১। পংকজ সমাদ্দার	সুখরঞ্জন	৫মাস	,,	—	—	,,	,,
১৩২। যতীন সরকার	নূতন	৬০ বঃ	—	—	,,	১/C	আমরোগ
১৩৩। মনোহর মণ্ডল	কেনারাম	৬মাস	,,	—	—	,,	,,
১৩৪। অনিতা বিশ্বাস	বিরেন	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৩৫। সমির সরকার	তারাপদ	৯বৎ	,,	—	—	১/A	,,
১৩৬। সঞ্জিতা মৃধা	কুমুদ	৮মাস	,,	—	—	২/C	,,
১৩৭। নির্ম্মলচন্দ্র রায়	মণিমোহন	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৩৮। সবিতা মণ্ডল	মহাদেব	৭বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৩৯। তারাপদ মণ্ডল	*মেঘনাথ	৪০ ,,	—	—	,,	,,	,,
১৪০। শ্যামল মণ্ডল	*তারাপদ	৪ ,,	,,	—	—	,,	কলেরা
১৪১। পচা সমাদ্দার	খগেন	৩বৎ	,,	—	—	নেতাজী	,,
১৪২। অমরী সমাদ্দার	খগেন	৪মাস	,,	—	—	,,	
১৪৩। সুন্দরী তরফদার	রাজকুমার	২ বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৪৪। খোকামনী সরকার	প্রফুল্ল	৫মাস	,,	—	—	,,	ডাইরিয়া
১৪৫। যশো সরকার	*নবীন	৭০বঃ	—	,,	—	,,	,,
১৪৬। বুলবুল রায়	যতীন	১ বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৪৭। সুধান্য মণ্ডল	*মুল্লুকচাঁদ	৬ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৪৮। খুকুমনী মণ্ডল	অজিত	৩মাস	,,	—	—	,,	,,
১৪৯। শঙ্করী মণ্ডল	কালিপদ	৬ বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৫০। সঞ্জয় মুখার্জী	কামেখ্যা	১	,,	—	—	,,	,,
১৫১। খুকুমনী পাইন	সতীশ	৬ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৫২। তাপস গোলদার	দুলাল	১ ,,	,,	—	—	,,	টাইফয়েড
১৫৩। পুন্যচরণ মণ্ডল	*বিশ্বনাথ	৭০ ,,	—	—	,,	,,	আমরোগ
১৫৪। কমলা মণ্ডল	কালিপদ	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৫৫। খোকন মণ্ডল	কালিপদ	১মাস	,,	—	—	,,	,,
১৫৬। যামিনী হালদার	*বসন্ত	৬০বঃ	—	—	,,	,,	,,

ক্রমিক নং মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
১৫৭। মহাদেব দেবনাথ	তৃপ্তিকুমার	৪দিন	,,	—	—	,,	,,
১৫৮। বিমলী মণ্ডল	বিভূতি	২ বঃ	,,	—	—	,,	টাইফয়েড
১৫৯। খুকুমনী সদ্দার	মহন্ত	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬০। কালীদাসী মণ্ডল	ভৈরব	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬১। বকুলরানী মণ্ডল	যোগেন্দ্র	৪৫ ,,	—	,,	—	নে/২A	,,
১৬২। দেবুরঞ্জন মণ্ডল	যোগেন্দ্র	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬৩। নকুলচন্দ্র সরকার	*মহাদেব	৬৩ ,,	—	—	,,	,,	,,
১৬৪। রঞ্জিতারানী সরকার	সন্তোষ	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬৫। শিখারানী ঢালী	সুপদ	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬৬। মনোজ সরকার	অরবিন্দ	১৫দিন	,,	—	—	,,	আমরোগ
১৬৭। পূর্ণিমা মিস্ত্রী	গোপাল	১৫বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৬৮। খুকুমনী সরকার	খগেন্দ্র	১৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৬৯। গীতারানী মিস্ত্রী	গোপাল	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭০। পাচিবালা মণ্ডল	অনিল	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭১। প্রমিলা মণ্ডল	রাধাকান্ত	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭২। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	রাধাকান্ত	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭৩। বিষ্ণুপদ মণ্ডল	রাধাকান্ত	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭৪। কালীদাসী রায়	অনিল	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭৫। সুষমা মণ্ডল	প্রফুল্ল	৯মাস	,,	—	—	,,	ডাইরিয়া
১৭৬। গৌরী গোলদার	পুলিন	৩বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৭৭। নিরোদ বৈদ্য	*রামকৃষ্ণ	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৭৮। দিনেশ মণ্ডল	হরিপদ	৭মাস	,,	—	—	,,	,,
১৭৯। জঙ্গলী সানা	কালিপদ	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৮০। সবিতা মণ্ডল	মাধব	১ বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৮১। পাচী মণ্ডল	বিনোদ	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৮২। অর্পনা গোলদার	মনিন্দ্র	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৮৩। যতীন মণ্ডল	রাম মণ্ডল	৫০ ,,	—	—	,,	,,	,,
১৮৪। খুকুমনী মণ্ডল	জয়দেব	৬ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৮৫। সুকচাঁদ বিশ্বাস	ভগীরথ	৭মাস	,,	—	—	,,	,,
১৮৬। খুকুমনী বিশ্বাস	ভগীরথ	৮ বঃ	,,	—	—	,,	,,
১৮৭। পাগল সরকার	অমেশ	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৮৮। কালিপদ বিশ্বাস	*কার্ত্তিক	৭০ ,,	—	—	,,	নে/২D	ডাইরিয়া

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
১৮৯।	খোকন মণ্ডল	সমারেশ	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯০।	শেফালী মৃধা	সুবল	৬ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯১।	সাবিত্রী মণ্ডল	অতুল	১২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯২।	অসিত বালা	চিত্তরঞ্জন	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯৩।	লক্ষ্মী বাইন	নিরঞ্জন	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯৪।	খুকুমনী চৌধুরী	কার্ত্তিক	৪ মাস	,,	—	—	,,	,,
১৯৫।	রতন মল্লিক	ভক্তরাম	১বঃ	,,	—	—	,,	কলেরা
১৯৬।	সরলা মল্লিক	ভক্তরাম	৫ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯৭।	অমেলা মল্লিক	ভক্তরাম	২ ,,	,,	—	—	,,	,,
১৯৮।	শ্রীমতী মল্লিক	হরিবর	৫০ ,,	—	,,	—	,,	,,
১৯৯।	ঠাকুর দাস	°হরিপদ	১৮ ,,	—	—	,,	,,	,,
২০০।	বামুনী গাইন	জগদীশ	১ ,, ,,		—	—	,,	আমরোগ
২০১।	খোকন সরকার	সুধীর	৩ মাস	,,	—	—	,,	,,
২০২।	সরজিনী মণ্ডল	কিনুরাম	৩ মাস	,,	—	—	,,	,,
২০৩।	সতিশ মণ্ডল	°রাজকুমার	৭৫বঃ	—	—	,,	,,	,,
২০৪।	পাচীরাণী সরকার	ভূপেন্দ্র	৩৫ ,,	—	,,	—	,,	,,
২০৫।	অনিমা কয়াল	অজিত	৫মাস	,,	—	—	,,	,,
২০৬।	রবীন্দ্র বাছাড়	°ফকির	১বঃ	,,	—	—	,,	,,
২০৭।	চতুর মণ্ডল	কটিরাম	৩৫বঃ	—	—	,,	,,	টাইফয়েড
২০৮।	শশ্মান মণ্ডল	°চতুর	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
২০৯।	শরত মণ্ডল	ভূষণ	৪০ ,,	—	—	,,	,,	,,
২১০।	সরলা বর্ম্মন	°তোতারাম	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
২১১।	কবিতা মণ্ডল	ঝড়ুরাম	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
২১২।	জঙ্কুলী মণ্ডল	মহাদেব	১ ,,	,,	—	—	,,	,,
২১৩।	শশধর হালদার	তোতারাম	৫৫ ,,	—	—	,,	নে/২E	কলেরা
২১৪।	যমুনা হালদার	স্বাঃ শশধর	৫০ ,,	—	,,	—	,,	,,
২১৫।	সুজাতা মণ্ডল	ননীগোপাল	৬মাস	,,	—	—	,,	,,
২১৬।	খুকু মণ্ডল	চন্দ্রকান্ত	১বঃ	,,	—	—	,,	,,
২১৭।	কিনিবালা বাইন	সুরেন্দ্র	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
২১৮।	দিলীপ মণ্ডল	শ্যামাপদ	৭ ,,	,,	—	—	,,	,,
২১৯।	শ্যামলী সানা	যগেন্দ্র	৫বঃ	,,	—	—	,,	,,
২২০।	খোকন সানা	হরিপদ	১মাস	,,	—	—	,,	,,

ক্রমিক নং	মৃতব্যক্তিদের নামঃ	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ	ঠিকানা	মন্তব্য
২২১।	সুনীল সানা	নিরাপদ	১বঃ	,,	—	—	,,	,,
২২২।	বিষ্ণুপদ রায়	নারায়ন	৯মাস	,,	—	—	,,	,,
২২৩।	শঙ্কর মণ্ডল	রণজিত	১ বঃ	,,	—	—	,,	,,
২২৪।	চপলা সরকার	স্বাঃ কালিপদ	২৫ ,,	—	,,	—	,,	,,
২২৫।	নির্ম্মল সরকার	শ্রীলক্ষ্মী	৪ ,,	,,	—	—	,,	,,
২২৬।	উপেন্দ্র বর্ম্মণ	°পিতম্বর	৪ ,,	,,	—	—	,,	টাইরিয়া
২২৭।	খুকুরাণী গাইন	সাধন	১ ,,	,,	—	—	নে-ন/১/A	,,
২২৮।	স্বপন সরকার	মতিলাল	৩ ,,	,,	—	—	,,	,,
২২৯।	নিরাপদ মণ্ডল	পুণ্যচরণ	২৫ ,,	—	—	,,	,,	,,
২৩০।	ভারতী সরদার	অজিত	৫ ,,	,,	—	—	৩/C	,,
২৩১।	খুকী মণ্ডল	গিরেন	৩মাস	,,	—	—	,,	,,
২৩২।	কেনারাম সরদার	°পারশ	৬০বঃ	—	—	,,	,,	,,
২৩৩।	নিরঞ্জন সানা	যতিশ	৩৫ ,,	—	—	,,	,,	,,
২৩৪।	গীতারাণী সরকার	গুরুপদ	৫মাস	,,	—	—	,,	,,
২৩৫।	ফটিকচাঁদ মৃধা	°শশীভূষণ	৬৮বঃ	—	—	,,	,,	,,
২৩৬।	নিলমনী মণ্ডল		৭০ ,,	—	—	,,	,,	,,
২৩৭।	নিদ্রা সরকার	অক্ষয়	৬০ ,,	—	,,	—	৩/C	,,
২৩৮।	কণিকা মৃধা	নিধুরাম	২ ,,	,,	—	—	২/B	,,
২৩৯।	ঝুনু অধিকারী	নিত্যানন্দ	২½ ,,	,,	—	—	১/A	,,

রাইহরণ বাড়ৈ
সাধারণ সম্পাদক
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
(সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ঙ)

২৪/১/৭৯ তারিখ থেকে মহিলাদের উপর ধর্ষণ এবং পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ সহ নামের তালিকা নিচে বর্ণিত হইল।

অভিযোগকারী মহিলার নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	মন্তব্য
১। শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী রায়	ভবতোষ	২২ বঃ	৩১/১/৭৯ তারিখ কুমীরমারীর পারে গুলিকাণ্ডের দিনও ১/২/৭৯ এবং ২/২/৭৯ বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে এবং মরিচঝাঁপির কাক্‌সা ভাইজোড়ী, ও বিজয় ভারনী, কালীরচর প্রভৃতি গ্রামে জ্যোতিবাবুর পুলিশ কতৃক উপরোক্ত স্থানে বর্ণিত মহিলাদের উপর ধর্ষণ এবং পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে।
২। কুমারী পারুল রাণী দে	কেশব দে	১৯ ,,	
৩। সুমিত্রা রাণী রায়			
৪। শৈলবালা মিস্ত্রী			
৫। পুষ্পরাণী দাস			
৬। সবিতা ঢালী	পিতা-সতীশ ঢালী	২২ ,,	
৭। বিশাখা মণ্ডল	,, সতীশ মণ্ডল	১৮ ,,	
৮। কল্পনা রাণী পাল	স্বাঃ রাখাল পাল	২৩ ,,	
৯। কুমারী সুমতী সরকার		১৭ ,,	
১০। উর্ম্মিলা হালদার	মনিন্দ্র হালদার	১৬ ,,	
১১। শোভারাণী বাড়ৈ	যোজ্ঞেশ্বর বাড়ৈ	১৭ ,,	
১২। সুলতা বালা	নরেন বালা	১৯ ,,	
১৩। নীলা রাণী সরকার	দুলাল সরকার	১৭ ,,	
১৪। শ্রীমতী বিনোদিনী বৈরাগী		৩০ ,,	
১৫। শ্রীমতী অমিতা বিশ্বাস	অনিল বিশ্বাস	২৭ ,,	
১৬। আশা মল্লিক	বিশ্বনাথ মল্লিক	২৩ ,,	
১৭। স্বপ্নারানী মিস্ত্রী	দ্বিজেন মিস্ত্রী	২১ ,,	
১৮। কুমারী শান্তি রায়	অনুকূল রায়	১৬ ,,	
১৯। শ্রীমতী শোভা বিশ্বাস	বাসুদেব বিশ্বাস	২০ ,,	
২০। ,, চপলা মণ্ডল	সচীন মণ্ডল	২৪ ,,	
২১। ,, সন্ধ্যা সরকার	মনীন্দ্র সরকার	৩০ ,,	
২২। কুমারী শেফালী বালা	বিরাজ বালা	১৬ ,,	
২৩। কুমারী শুষমা বালা		১৭ ,,	

রাইহরণ বাড়ৈ *(সাধারণ সম্পাদক)*
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (চ)

মাননীয় ,
সভাপতি মহাশয়
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)

মহাশয়,

অধিনের বিনিত নিবেদন এই যে, আমি শ্রীমতী কল্পনা পাল, স্বামী শ্রীরাখাল পাল, আপনার অনুগত ১নং ঘেরী কাক্‌সা নদীর পার, সুদীর্ঘ ৮মাস যাবত বসবাস করিতেছি। গত ইং ৬/২/৭৯ তারিখে পুলিশ আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। প্রথমত পুলিশ মারধর করে আমাদের বাগনা অফিসে নিয়ে যায়। অফিসে নিয়ে পুলিশের দল আমার সাথে নারকীয় ব্যবহার করে। ব্লাউজ পয্যন্ত আমার শরীর হইতে খুলিয়া ফেলে, এ হেন নারকীয় অত্যাচার পুলিশ শুরু করেছে। যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

অতএব মহাশয়ের নিকট আমার করুণ প্রার্থনা, অবিলম্বে পুলিশের এই অত্যাচারের কিছু একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে উদ্বাস্তু নারীর দল এমনিভাবে পুলিশের হাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ইতি নিবেদিকা
কল্পনা পাল (২৩)
১নং ঘেরী কাক্‌সা নদীর পার

রাইহরণ বাড়ৈ
সাধারণ সম্পাদক
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
(সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

মাননীয়
সভাপতি মহাশয়
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব ভারতীয়)
নেতাজী নগর (মরিচঝাঁপি)

মহাশয়,

অধিনের বিনিত নিবেদন এই যে, আমি কুমারী বিশখা রাণী মণ্ডল, পিতা শ্রীসতিশচন্দ্র মণ্ডল। সুদীর্ঘ ৮ মাস যাবত আপনার অধিনস্ত ১নং ঘেরী কাক্‌সার পার বসবাস করিয়া আসিতেছি। গত ৬/২/৭৯ তারিখে পুলিশ লঞ্চ নিয়ে আমাদের ওখানে যায় এবং পুলিশ আমাদের মারধর করে, বাড়ী ভেঙ্গে দেয়, তারপর আমাদের পরিবারের সকলকে লঞ্চে করে বাগনা অফিসে নিয়ে যায়। বাগনা অফিসে পুলিশ আমাকে পৃথকভাবে রাখে, এবং আমার সহিত চরম দুর্ব্যাবহার করার চেষ্টা করে, বহু কষ্টে আমি আমার কাপড় ফেলে রেখে পালাতে বাধ্য হই। পুলিশ আর আমাকে ধরতে পারে না।

অতএব মহাশয়ের নিকট আমার কাতর প্রার্থনা যে, আমরা যাহাতে এই পশুরুপি পুলিশের হাত হতে আমাদের ইজ্জত, ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারি তাহার সুব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়। অন্যথায় আমার মত সমস্ত মেয়ে তাহার ধর্ম্ম এমনিভাবে ওই পুলিশের হাতে নিরুপায়ে হারিয়ে যাবে।

ইতি—

নিবেদিকা

বিশাখা রাণী মণ্ডল (১৮)
১নং ঘেরী কাক্‌সা নদীর পার

রাইহরণ বাড়ৈ
সাধারণ সম্পাদক
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
(সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

মাননীয়
সভাপতি মহাশয়
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব ভারতীয়)
নেতাজী নগর (মরিচঝাঁপি)

মহাশয়,

অধিনের বিনিত নিবেদন এই যে, আমি কুমারী সবিতা রাণী ঢালী, পিতা যতিন ঢালী, মরিচঝাঁপির অন্তর্গত ১নং ঘেরী দেবীপুর গ্রামে পরিবার পরিজন সহ ৮ মাস বসবাস করছি। গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৯ আমি পিতা মাতার কাছে আমাদের উক্ত বাড়ীতে ছিলাম। ঐদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় ২টা লঞ্চ নিয়ে কতকগুলি পুলিশ আমাদের গ্রামে চড়াও হয়। এবং ঘরবাড়ী ভাঙ্গতে থাকে এবং লোকজনের উপর মারপিট করতে থাকে, গ্রামের প্রায় সমস্ত ঘরগুলিই পুলিশ ভেঙ্গে দেয় এবং নারী, শিশু নির্বিশেষে নির্যাতন করে।

আমাদের বাড়ীতে যখন আসে তখন আমার বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে তিনি আগেই জঙ্গলে পালিয়ে যান। ঐ সময় পুলিশ এসে আমাদের ঘরদোর ভেঙে আমাদের মালপত্র টাকা পয়সা লঞ্চে ওঠাইয়া নিয়ে যায়। তারপর আমাকেও জোর করে ধরে নিয়ে লঞ্চে গেল। আমার মা তখন বাঁধা দিয়েছিলেন। পুলিশ তাকে লাথি মেরে জলের মধ্যে ফেলে দেয়। কিছু পরে আমাকে নিয়ে লঞ্চ ছেড়ে দেয়। লঞ্চে করে আমাকে বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং দু'জন পুলিশ দ্বারা আমাকে পৃথক জায়গায় আটকে রাখা হয় এবং আমার সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার করে। আমার পরনের কাপড় খানা পর্য্যন্ত ছিড়ে ফেলে, সমস্ত রকম অশ্লীল ব্যবহার করে, আমার নারীত্বের চরম অবমাননা করে। পাশবিক অত্যাচার সহ ধর্ষণ পর্য্যন্ত করে। ঐ অবস্থায় আমাকে দীর্ঘ ছয়দিন যাবৎ আটকে রাখা হয়। পরে আমি ওখান থেকে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে চলে আসি। আমি ৩/২/৭৯ তারিখে মরিচঝাঁপিতে আমার মা-বাবার কাছে চলে আসি।

মহাত্মন সমীপে আমার কাতর আবেদন আমার কুমারী ও নারীত্বের চরম অবমাননা করে আমার জীবনটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যারা দায়ী, যারা আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। তাদের যথোপযুক্ত বিচারের জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।

বিনীতা—

তাং ৭/২/৭৯

কুমারী সবিতারাণী ঢালী
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)

রাইহরণ বাড়ৈ *(সাধারণ সম্পাদক)*
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

মাননীয়

সভাপতি মহাশয়

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব ভারতীয়)

নেতাজী নগর (মরিচঝাঁপি)

কুমীরমারী ২৪ পরগণা, বাংলা

মহাশয়,

অধিনের বিনিত নিবেদন এই যে, আমি কুমারী আরতী রাণী হালদার পিতা শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র হালদার সাং নেতাজীনগর পাশ্বস্থ এলাকায় গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আরও তিনজন মহিলা ছিল। আমরা হাতের সাহায্যে বা হাত দিয়া কাঠ সংগ্রহ করছিলাম এমন সময় কয়েকজন পুলিশ বন্দুক সহ আমাদেরকে পিছন দিক থেকে তাড়া দেয়। আমরা ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করি। দুর্ভাগ্য বশত আমি পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে পালাতে পারিনি। তখন পুলিশেরা গুলি করার ভয় দেখিয়ে আমাকে জঙ্গলে যেতে নির্দ্দেশ দেয়। আমি তখন পায়ে ধরে অনুরোধ করে বলি "আমাকে ক্ষমা করুন, ছেড়ে দিন, ভবিষ্যতে আর কোনদিন এখানে আসব না। কিন্তু পুলিশ বার বার একই ধরনের উক্তি করতে থাকে এবং গভীর জঙ্গলে যাবার জন্য আমাকে বার বার বিরক্ত করতে থাকে।

ইতি মধ্যে আমাদের ক্যাম্প থেকে কয়েকজন ভাইয়েরা আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসেন। কিন্তু পুলিশ তাদের পথিমধ্যে বাধা দেয় ও আটকে রাখে। তাদের মধ্যে থেকে কেহ দুর থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে ডাকতে থাকে। কিন্তু পুলিশ তাদের ডাকে সাড়া না দিতে আমাকে ধমক দেয় এবং বলতে থাকে "চল তোকে ক্যাম্পে যেতে হবে।" অতপর খবর পেয়ে নেতাজীনগর থেকে আবালবৃদ্ধ বনিতা অসংখ্য লোক এক সঙ্গে বেরিয়ে আসেন এবং প্রায় দুঘণ্টা থেকে আমাকে পুলিশের কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

অতএব মহাত্মন যাহাতে পুলিশের এই নারকীয় অত্যাচার হতে নারীর নারীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষা করে মানুষের ন্যায় বসবাস করতে পারি এবং পারে তাহার বিহীত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নিবেদন ইতি

কুমারী আরতীরাণী হালদার

নেতাজী নগর

২৩/১/৭৯

রাইহরণ বাড়ৈ (সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

পরিশিষ্ট—৩ (ছ)

নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকা

৩১/১/৭৯ তারিখ হইতে

নং	নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ
১।	সুনীল কুমার বড়াল	যজ্ঞেশ্বর	২৫	—	—	,,
২।	দেবেন্দ্রনাথ গাইন	দুর্গাচরণ	৪৫	—	—	,,
৩।	সমর কুমার বিশ্বাস	মনিলাল	২২	—	—	,,
৪।	জগদীশ বাছাড়		৬০	—	—	,,
৫।	বিনয় কুমার বাছাড়	জগদীশ	৩০	—	—	,,
৬।	মনোজিৎ মণ্ডল	বাবুরাম	২৮	—	—	,,
৭।	অজিত কুমার রায়	কেদার	২২	—	—	,,
৮।	রমেশ হালদার	যজ্ঞেশ্বর	২৮	—	—	,,
৯।	শচীন কুমার মণ্ডল	বসন্ত	৩৫	—	—	,,
১০।	নিরাপদ মাঝি	রতন	২০	—	—	,,
১১।	কালু সরকার	সুনীল	৬৫	—	—	,,
১২।	মনোজ হালদার	বসন্ত	১৮	—	—	,,
১৩।	গোপাল ঢালী	কেদার	৬০	—	—	,,
১৪।	সুনীল মণ্ডল	ক্ষিরোদ	২৫	—	—	,,
১৫।	ঊষারাণী রায়	ভবতোষ	১৭	—	,,	—
১৬।	বাবুরাম মণ্ডল	সুনীল	১৮	—	—	,,
১৭।	বাসন্তী মণ্ডল	বাঞ্ছারাম	১৮	—	,,	—
১৮।	কিরণ মণ্ডল	প্রফুল্ল	১৬	—	—	,,
১৯।	রবীন্দ্র সরকার	সর্বেশ্বর	২২	—	—	,,
২০।	অনিল দাস	মধুসুদন	১৮	—	—	,,
২১।	পারুল রাণী দে	সন্ধ্যা	১৭	—	,,	—
২২।	শম্ভু মণ্ডল	সুরেশ	২৫	—	—	,,
২৩।	কালীপদ মণ্ডল	বিষ্ণুপদ	২৫	—	—	,,
২৪।	আদিত্য হালদার	চন্দ্রকান্ত	১৮	—	—	,,
২৫।	সন্তোষ পোদ্দার	মনোরঞ্জন	৩০	—	—	,,
২৬।	পরিতোষ সরকার	সুবল	২৩	—	—	,,
২৭।	শ্যামলচন্দ্র তরুয়া	নকুল	১৯	—	—	,,
২৮।	বিরেন বিশ্বাস	লালু	৩৫	—	—	,,
২৯।	অখিল মণ্ডল	নরেন্দ্র	২৮	—	—	,,
৩০।	মিনতি রাণী বৈরাগী	কাশধর	১৩	—	,,	—
৩১।	কালিপদ সরকার	সুনীল	২৭	—	—	,,

নং	নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ
৩২।	সন্তোষ কুমার সরকার	নরেন্দ্র	২২	—	—	,,
৩৩।	বীরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস	রসিক	২৮	—	—	,,
৩৪।	নিমাই নাগ	মনোরঞ্জন	২২	—	—	,,
৩৫।	কার্ত্তিক মণ্ডল	আদিত্য	২২	—	—	,,
৩৬।	বিশ্বনাথ বিশ্বাস	খগেন্দ্র	২০	—	—	,,
৩৭।	প্রিয়নাথ বিশ্বাস	কিশোর	৩০	—	—	,,
৩৮।	সারথিরাণী সরকার	নিরাপদ	১৫	—	,,	—
৩৯।	তারক সরকার	কেনারাম	৪০	—	—	,,
৪০।	কালিপদ সরকার	বিষ্ণুপদ	২৫	—	—	,,
৪১।	বিমল ঘরামী	প্রভাত	২১	—	—	,,
৪২।	সুবোধ মণ্ডল	অর্জুন	১৮	—	—	,,
৪৩।	কিশোরী রায়	বসন্ত	১৯	—	—	,,
৪৪।	দীনবন্ধু ঘরামী	সুরেন	৩০	—	—	,,
৪৫।	বিমল সরকার	বেণী	৩০	—	—	,,
৪৬।	গোকুল সরকার	নকুল	১৭	—	—	,,
৪৭।	গোবিন্দ পাল	তারাপদ	১৯	—	—	,,
৪৮।	বিভূতি বৈদ্য	বিশ্বনাথ	২৩	—	—	,,
৪৯।	হাজারী সরকার	রাজকুমার	৪০	—	—	,,
৫০।	সন্তোষ সরকার	হাজারী	১৮	—	—	,,
৫১।	প্রভাস মাঝি	নিতাই	১৯	—	—	,,
৫২।	অর্জুন হালদার	মোহন	১৯	—	—	,,
৫৩।	শচীন মণ্ডল	নটবর	১৯	—	—	,,
৫৪।	নারায়ণ পাল	উপেন	৪৫	—	—	,,
৫৫।	প্রহ্লাদ বিশ্বাস	অতুল	২২	—	—	,,
৫৬।	সুধীর রায়	দ্বিজবর	৪৫	—	—	,,
৫৭।	জগন্নাথ মণ্ডল	মাদার	২১	—	—	,,
৫৮।	জগদীশ মণ্ডল	,,	১২	—	—	,,
৫৯।	ভূপেন সরকার	নবীন	৪০	—	—	,,
৬০।	দেবেন্দ্রনাথ সরকার	নিমাই	৪৫	—	—	,,
৬১।	গীতারাণী মণ্ডল	কিনু	১৫	—	,,	—
৬২।	হৃদয় মণ্ডল	—	৪৫	—	—	,,
৬৩।	সুজন সরদার	সুধীর	৩০	—	—	,,
৬৪।	প্রভাস মণ্ডল	উপেন	২৮	—	—	,,
৬৫।	কৃষ্ণপদ মণ্ডল	ভরত	২৮	—	—	,,

নং	নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ
৬৬।	বেণীকান্ত মণ্ডল	বিশ্বনাথ	১৫	—	—	,,
৬৭।	জগদীশ বৈরাগী	হরিপদ	২১	—	—	,,
৬৮।	অশোক মৃধা	রতন	—	—	—	,,
৬৯।	অমল কুমার বিশ্বাস	অমূল্য	১৪	—	—	,,
৭০।	তারক সরকার	ভূধর	১৮	—	—	,,
৭১।	বৈদ্যনাথ সরকার	,,	১৩	—	—	,,
৭২।	নরেন্দ্র সরকার	শুকচাঁদ	২৫	—	—	,,
৭৩।	রামেশ্বর মৃধা	গোপাল	২০	—	—	,,
৭৪।	সুধীর সরদার	মৃনাল	১৭	—	—	,,
৭৫।	হরিপদ গাইন	বিপিন	৫০	—	—	,,
৭৬।	সুরেন গাইন	হরিপদ	৩০	—	—	,,
৭৭।	মাধবচন্দ্র গাইন	,,	২৫	—	—	,,
৭৮।	অপর রাণী গাইন	মাধব	২০	—	,,	—
৭৯।	কিরণচন্দ্র সরকার	কৃষ্ণপদ	৪০	—	—	,,
৮০।	সুভদ্রা রাণী সরকার	কিরণ	১৭	—	,,	—
৮১।	নেপাল হালদার	নয়ন	৩০	—	—	,,
৮২।	মাখন ঢালী	প্রহ্লাদ	৫০	—	—	,,
৮৩।	নরেন্দ্রনাথ বৈদ্য	কার্ত্তিক	৩৫	—	—	,,
৮৪।	মন্টুকুমার মণ্ডল	,,	৫০	—	—	,,
৮৫।	ভূধর চন্দ্র মণ্ডল	বলরাম	২৫	—	—	,,
৮৬।	নগেনচন্দ্র মণ্ডল	ভরত	২৫	—	—	,,
৮৭।	গোলক ঢালী	কেদার	৫০	—	—	,,
৮৮।	কিরণ মণ্ডল	অবণী	২৪	—	—	,,
৮৯।	বিভূতি মণ্ডল	মহাদেব	২২	—	—	,,
৯০।	পাগল মণ্ডল	রূপচাঁদ	২৫	—	—	,,
৯১।	ভবতোষ মণ্ডল	—	২৫	—	—	,,
৯২।	প্রিয়নাথ মণ্ডল	দেবেন	২২	—	—	,,
৯৩।	বিনয় গাইন	মাদার	২৭	—	—	,,
৯৪।	দিলীপ মিস্ত্রী	হরিবর	১৮	—	—	,,
৯৫।	রবীন্দ্রনাথ সরকার	ভরত	১৮	—	—	,,
৯৬।	নিরাপদ সানা	মদন	৪৫	—	—	,,
৯৭।	ভোলানাথ সরকার	শ্রীকান্ত	২৮	—	—	,,
৯৮।	অজিত কুমার সরকার	হাজারী	২৭	—	—	,,
৯৯।	বিভূতি মণ্ডল	মহাদেব	২৮	—	—	,,

নং	নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	বয়স	শিশু	মহিলা	পুরুষ
১০০।	দুখীরাম মণ্ডল	অতুল	৩০	—	—	,,
১০১।	খগেন্দ্র বর্মণ	যতীন্দ্র	২৮	—	—	,,
১০২।	পুলিন মণ্ডল	বিহারী	১৭	—	—	,,
১০৩।	শশাঙ্ক মণ্ডল	,,	১৯	—	—	,,
১০৪।	ফটিক গাইন	নেত্রধর	২০	—	—	,,
১০৫।	রবীন্দ্র শিকদার	গয়ালী	৪০	—	—	,,
১০৬।	নিরাপদ মণ্ডল	রামচন্দ্র	৪০	—	—	,,
১০৭।	চিত্তরঞ্জন মণ্ডল	ভগবান	২৫	—	—	,,
১০৮।	তেজেন্দ্র মণ্ডল	যজ্ঞেশ্বর	৩০	—	—	,,
১০৯।	কালিদাস মণ্ডল	মহেন্দ্র	১৭	—	—	,,
১১০।	আশুতোষ দে	সুবল	২০	—	—	,,
১১১।	চিত্তরঞ্জন ঢালী	রামলাল	৩৫	—	—	,,
১১২।	কালিপদ মণ্ডল	বিহারী	২০	—	—	,,
১১৩।	হরেন সরদার	সুধন্য	২২	—	—	,,
১১৪।	অন্নদা গুহ	খগেন	১৭	—	—	,,
১১৫।	নগেন সরদার	রামমোহন	২৩	—	—	,,
১১৬।	সন্তোষ মণ্ডল	বিশ্বনাথ	৩৫	—	—	,,
১১৭।	সূর্য্যকান্ত বিশ্বাস	ভূবন	৪২	—	—	,,
১১৮।	সুশীল কুমার রায়	ভীম	২২	—	—	,,
১১৯।	কৃষ্ণপদ মৃধা	দুর্গাপদ	৩২	—	—	,,
১২০।	সমর সরদার	কাশীনাথ	৩৫	—	—	,,
১২১।	প্রিয়নাথ বিশ্বাস	বিনোদ	১৮	—	—	,,
১২২।	মনোরঞ্জন হালদার	বসন্ত	১৮	—	—	,,
১২৩।	রেবতী মৃধা	অধীর	২০	—	—	,,
১২৪।	পরিতোষ সরকার	সর্বেশ্বর	৩০	—	—	,,
১২৫।	ভবসিন্ধু মণ্ডল	গৌরচাঁদ	১৫	—	—	,,
১২৬।	বাবুরাম মণ্ডল	তারক	৩৫	—	—	,,
১২৭।	সুভাষ মণ্ডল	দুর্লভ	৫৫	—	—	,,
১২৮।	অভিরাম মণ্ডল	ত্রৈলক্ষ	৫০	—	—	,,

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (জ)

৩১শে জানুয়ারী যে সকল ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়ে বসিরহাট ও আলিপুর জেলে আটক রয়েছেন তাঁদের কিছু সংখ্যক নাম নিম্নে বর্ণিত হল।

১।	অমূল্য মণ্ডল	২৭।	অশোক পোদ্দার
২।	অরুণ দে	২৮।	গোবিন্দ দাস
৩।	দেবদাস চাকলাদার	২৯।	ভবসিন্ধু সরদার
৪।	কালিপদ চাকলাদার	৩০।	বাবুরাম মণ্ডল
৫।	অর্জুন হালদার	৩১।	সুভাষ মণ্ডল
৬।	নিমাই দেবনাথ	৩২।	নিরাপদ মাঝি
৭।	গোকুল সরকার	৩৩।	শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল
৮।	সুশীল মণ্ডল	৩৪।	ভবনাথ কির্তনীয়া
৯।	সুভাষ মাঝি	৩৫।	সুবল বিশ্বাস
১০।	আশুতোষ দে	৩৬।	শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল
১১।	মনোরঞ্জন মিস্ত্রী	৩৭।	নিতাই চন্দ্র মণ্ডল
১২।	কালিপদ সরকার	৩৮।	প্রশান্ত মণ্ডল
১৩।	সমর সরদার	৩৯।	কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল
১৪।	সমর বিশ্বাস	৪০।	বাসুদেব রায়
১৫।	রতন সরদার	৪১।	পারুল দে
১৬।	ফটিক গাইন	৪২।	মালতী বৈরাগী
১৭।	সুনীল বাড়ৈ	৪৩।	সারথী সরকার
১৮।	আদিত্য হালদার	৪৪।	জগধাত্রী রায়
১৯।	অন্নদা গুহ	৪৫।	বসন্ত মণ্ডল
২০।	পরিমল দাস	৪৬।	ননীগোপাল দাস
২১।	কালিপদ মণ্ডল	৪৭।	অজিত রায়
২২।	শ্যামল বিশ্বাস	৪৮।	বিশ্বনাথ বিশ্বাস
২৩।	কালিদাস মণ্ডল	৪৯।	দীনবন্ধু শিকদার
২৪।	সুধীর মণ্ডল	৫০।	কৃষ্ণপদ মৃধা
২৫।	অনীল দাস	৫১।	হরেন্দ্রনাথ সরকার
২৬।	সুধীর সরকার	৫২।	মালতী সরকার

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ঝ)

৩১/১/৭৯ তাং হইতে বিভিন্ন দিনে এবং বিভিন্ন জায়গা হতে জেলে আটক কিছু ব্যক্তিদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল

নং	জেলে আটক ব্যক্তির নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	মন্তব্য
১।	শ্রী কিরণচন্দ্র মণ্ডল	মৃত মহেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল	
২।	„ নরেন্দ্রনাথ সরকার	„ শরৎচন্দ্র সরকার	
৩।	„ হরি মণ্ডল	„ ভোলানাথ	
৪।	„ চন্দ্রকান্ত বরকান্দাজ	„ মানিক বরকান্দাজ	
৫।	„ আনন্দ হালদার	„ শরৎচন্দ্র হালদার	
৬।	„ কানাই মৃধা	„ বনমালী মৃধা	
৭।	„ কান্তরাম বরকান্দাজ	„ মাণিকচাঁদ	
৮।	„ মঙ্গল বরকান্দাজ	„ মাণিকচাঁদ	
৯।	„ যমুনারাণী মণ্ডল	„ বিহারী মণ্ডল	
১০।	„ মনোরঞ্জন মণ্ডল	„ গিরীশ মণ্ডল	
১১।	„ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	„ রাখাল বিশ্বাস	
১২।	„ মধুসূদন দাস	„ রাইচরণ দাস	
১৩।	„ ভবতোষ	অজ্ঞাত	
১৪।	„ সুশীল মণ্ডল	„ পবন মণ্ডল	
১৫।	„ ভরতচন্দ্র রায়	„ প্রহ্লাদ রায়	
১৬।	„ সুশীল মণ্ডল	„ বাসুদেব	
১৭।	„ অতুল মণ্ডল	„ শ্যামাচরণ	
১৮।	„ খগেন বর্মণ	শ্রী যতীন বর্মন	
১৯।	„ ধীরেন পোদ্দার	মৃত মহেন্দ্র পোদ্দার	
২০।	„ হরেকৃষ্ণ হালদার	„ পার্বতী হালদার	
২১।	„ শরৎচন্দ্র মণ্ডল	„ রাজেন্দ্র মণ্ডল	
২২।	„ প্রহ্লাদ গোলদার	„ অক্ষয় গোলদার	
২৩।	„ হরিদাস মণ্ডল	„ দুর্গাচরণ মণ্ডল	
২৪।	„ নিরাপদ রায়	„ নিরাঞ্জন রায়	
২৫।	„ তপন চৌকিদার	„ প্রহ্লাদ চৌকিদার	
২৬।	„ ব্রজেন্দ্র নাথ মণ্ডল	„ শশধর মণ্ডল	
২৭।	„ অমূল্য বিশ্বাস	„ প্রিয়নাথ	
২৮।	„ বনমালী মণ্ডল	„ সুরেন্দ্র মণ্ডল	
২৯।	„ সতীশ সরদার	„ পরেশ সরদার	
৩০।	„ বাবুরাম মণ্ডল	„ ভোলানাথ	
৩১।	„ মোগল মণ্ডল	„ সনাতন মণ্ডল	

নং	জেলে আটক ব্যক্তির নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	মন্তব্য
৩২।	„ নারায়ন মৃধা	„ সুকুমার মৃধা	
৩৩।	„ ধীরেন্দ্রনাথ সরদার	„ যদুবর সরদার	
৩৪।	„ সারথী সরকার	„ নিরাপদ সরকার	
৩৫।	„ সুনীল বড়াল	„ যজ্ঞেশ্বর	
৩৬।	„ অনিল মণ্ডল	„ মধুবরণ মণ্ডল	
৩৭।	„ কালিদাস সরদার	„ বিষ্টুপদ সরদার	
৩৮।	„ কৃষ্ণপদ মৃধা	„ দুর্গাপদ	
৩৯।	„ হরিদাস ঘরামী	„ প্রকাশ ঘরামী	
৪০।	„ গণেশ ঘরামী	„ প্রকাশ ঘরামী	
৪১।	„ চিত্তরঞ্জন মণ্ডল	„ লক্ষণ মণ্ডল	
৪২।	„ সুশীল মণ্ডল	„ মহাদেব মণ্ডল	
৪৩।	„ হরিপদ মণ্ডল	„ কোমল মণ্ডল	
৪৪।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল	„ কোমল মণ্ডল	
৪৫।	„ কৃষ্ণপদ মৃধা	„ ক্ষেদীর মৃধা	
৪৬।	„ বিমল মণ্ডল	„ ভূপতি মণ্ডল	
৪৭।	„ সুভাষ দেওয়ান	„ শিবপদ দেওয়ান	
৪৮।	„ নিমাই মণ্ডল	„ চারুচরণ মণ্ডল	
৪৯।	„ জগদীশ বাড়ৈ	„ কালিচরণ বাড়ৈ	
৫০।	„ কার্ত্তিক মণ্ডল	„ আদিত্য মণ্ডল	
৫১।	„ যোগেশ রায়	„ রাইচরণ রায়	
৫২।	„ প্রিয়নাথ বিশ্বাস	„ বিনোদ বিশ্বাস	
৫৩।	„ বাসুদেব মণ্ডল	„ সুরেন মণ্ডল	
৫৪।	„ সমর বিশ্বাস	„ মণিলাল	
৫৫।	„ শ্যামল বিশ্বাস	„ নকুল বিশ্বাস	
৫৬।	„ সুরেন সানা	„ বিষ্টু সানা	
৫৭।	„ জগ বাছাড়	„ চন্দ্রকান্ত বাছাড়	
৫৮।	„ কৃষ্ণপদ সানা	„ প্রভাস সানা	
৫৯।	„ বিজন মণ্ডল	„ কানাই মণ্ডল	
৬০।	„ পঞ্চরাম সরদার	„ অর্জুন সরদার	
৬১।	„ আশুতোষ মণ্ডল	„ পবন মণ্ডল	
৬২।	„ নিরাপদ মাঝী	„ রতন মাঝী	
৬৩।	„ কালিপদ বালা	„ সতীশ বালা	
৬৪।	„ কেশব সরকার	„ জগবন্ধু সরকার	
৬৫।	„ রামপ্রসাদ বসু	„ গণেশ বসু	

নং	জেলে আটক ব্যক্তির নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	মন্তব্য
৬৬।	„ শ্রীকান্ত হালদার	„ কালিপদ হালদার	
৬৭।	„ রাম মণ্ডল	„ গোপাল মণ্ডল	
৬৮।	„ রবীন মণ্ডল	„ শরৎ মণ্ডল	
৬৯।	„ সুখদেব মণ্ডল	„ শরৎ মণ্ডল	
৭০।	„ খোকন বাইন	„ নকুল বাইন	
৭১।	„ শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল	„ শান্ত মণ্ডল	
৭২।	„ যতিন রায়	„ গঙ্গা রায়	
৭৩।	„ মিনতীবালা বৈরাগী	„ প্রফুল্ল বৈরাগী	
৭৪।	„ সুশীল মৃধা	„ মহেশ মৃধা	
৭৫।	„ কুমোদ চৌধুরী	„ চিত্তরঞ্জন	
৭৬।	„ বাবুরাম মণ্ডল	„ তারক মণ্ডল	
৭৭।	„ পঞ্চানন সানা	„ বুধরাম সানা	
৭৮।	„ সুশীল বিশ্বাস	„ শচীন্দ্র বিশ্বাস	
৭৯।	„ মনোজ কুমার হালদার	„ বসন্ত হালদার	
৮০।	„ কালিপদ সরকার	„ সুশীল সরকার	
৮১।	„ নিতাই মণ্ডল	„ তাতীরাম	
৮২।	„ সুভাষ হালদার ৩A	„ তাতুল হালদার	
৮৩।	„ গোলক মণ্ডল ৩A	„ চন্দ্রকান্ত মণ্ডল	
৮৪।	„ তিলক মণ্ডল	„ অধর মণ্ডল	
৮৫।	„ কার্ত্তিক সরকার	„ অধর সরকার	
৮৬।	„ দর্শন পোদ্দার	„ কান্তিরাম পোদ্দার	
৮৭।	„ রূপচাঁদ সরদার	„ রাজেন্দ্র সরদার	
৮৮।	„ পরিমল শিকদার	„ নারায়ণ শিকদার	
৮৯।	„ মনোরঞ্জন বালা ৩B	„ গনেশ বালা	
৯০।	„ খোকন সরদার „	„ ভূধর সরদার	
৯১।	„ তারিপ মণ্ডল „	„ সূর্যকান্ত মণ্ডল	
৯২।	„ গোবিন্দ রায় „	„ হরিপদ	
৯৩।	„ সাধন মণ্ডল „	„ কালিপদ মণ্ডল	
৯৪।	„ খোকন বাছাড় „	„ মনোহর বাছাড়	
৯৫।	„ সুরেন মণ্ডল „	„ তামিল মণ্ডল	
৯৬।	„ সন্তোষ মণ্ডল „	„ শরৎ মণ্ডল	
৯৭।	„ হরিপদ মণ্ডল „	„ চৈতন্য মণ্ডল	
৯৮।	„ প্রভাষ হালদার „	„ বালক হালদার	
৯৯।	„ নগরবাসী রায় „	„ দীনবন্ধু রায়	

নং	জেলে আটক ব্যক্তির নাম	পিতা বা স্বামীর নাম	মন্তব্য
১০০।	„ ভরত ঘরামী „	„ মহেশ ঘরামী	
১০১।	„ নিতাই পাল „	„ গিরীশ পাল	
১০২।	„ অমূল্য মণ্ডল „	„ মহাদেব	
১০৩।	„ দিবাকর গাইন „	„ ফটীক গাইন	
১০৪।	„ তারকদাসী গাইন „	„ কিরণ গাইন	
১০৫।	„ নিশীকান্ত মল্লিক „	„ কালিচরণ মল্লিক	
১০৬।	„ বিষ্ণুপদ মল্লিক „	„ নিশীকান্ত	
১০৭।	„ সুশান্ত বিশ্বাস „	„ নগরবাসী	
১০৮।	„ কিরণ মণ্ডল „	„ প্রফুল্ল মণ্ডল	
১০৯।	„ সাধন সরকার „	„ হাজারী সরকার	
১১০।	„ অনিল কৃষ্ণ সরকার „	„ যোগেশ সরকার	
১১১।	„ সঙ্গল বরকান্দাজ „	„ মানিক বরকান্দাজ	
১১২।	„ জগদীশ বাড়ৈ „	„ কালিচরণ বাড়ৈ	
১১৩।	„ মনোহর ঘরামী „	„ শশী ঘরামী	
১১৪।	„ অজয় কৃষ্ণ মণ্ডল	„ বসন্ত মণ্ডল	
১১৫।	„ তারক সরকার	„ ভূধর সরকার	
১১৬।	„ সুবল মণ্ডল	„ হরিপদ মণ্ডল	
১১৭।	„ গোপাল মণ্ডল	„ যোগেন্দ্র মণ্ডল	
১১৮।	„ নিতাই তরফদার	„ শিবনাথ	
১১৯।	„ নিরাপদ রায়	„ নিরঞ্জন রায়	
১২০।	„ রবীন শিকদার	„ গয়ালী	
১২১।	„ অজিত রায়	„ কেদার রায়	
১২২।	„ সুধাংশু মণ্ডল	„ সুবোধ মণ্ডল	
১২৩।	„ পরিতোষ সরকার	„ নিরাপদ সরকার	
১২৪।	„ কৃষ্ণপদ সানা	„ প্রভাষ সানা	
১২৫।	„ মনোজ হালদার	„ বসন্ত হালদার	
১২৬।	„ রেবতী মৃধা	„ অধীর মৃধা	
১২৭।	„ গৌরচন্দ্র মণ্ডল	„ রাইচরণ মণ্ডল	
১২৮।	„ পরিতোষ সরকার	„ সুবোল সরকার	
১২৯।	„ শরৎ মণ্ডল	„ রাজেন্দ্র মণ্ডল	
১৩০।	„ মনোরঞ্জন মণ্ডল	„ গিরীশ মণ্ডল	

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

পরিশিষ্ট—৩ (ঞ)

২৪শে জানুয়ারী হইতে অবরোধের পর চাউল সংগ্রহের জন্য যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের নামের তালিকা কিছু নিম্নে বর্ণিত হল।

১। গৌরাঙ্গ মল্লিক।
২। জগ বাছাড়।
৩। তারাপদ মাঝী।
৪। সাধন মণ্ডল।
৫। কালিপদ মণ্ডল।
৬। রবীন রায়।
৭। কৃষ্ণপদ মণ্ডল।
৮। মাদার স্বর্ণকার।
৯। ভবসিন্ধু মণ্ডল।
১০। নিতাই মল্লিক।
১১। গৌরপদ মল্লিক।
১২। তুষারপদ মল্লিক।
১৩। শৈলেন সরকার।
১৪। সিদ্ধেশ্বর সরকার।
১৫। সুরেন্দ্রনাথ সানা।
১৬। সুবল মণ্ডল।
১৭। বিশ্বনাথ মল্লিক।
১৮। রামেশ্বর গাইন।
১৯। নির্ম্মল মণ্ডল।
২০। কিরণ মণ্ডল।
২১। সুনীল বিশ্বাস।
২২। বিনয় মণ্ডল।
২৩। নরেন্দ্রনাথ মৃধা।
২৪। লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক।
২৫। সুরেন্দ্র মৃধা।
২৬। ধীরেন মণ্ডল।
২৭। ছত্তর মণ্ডল।
২৮। নিরাপদ মণ্ডল।
২৯। কুমদিনী পাণ্ডে।
৩০। বিমল মণ্ডল।

বিঃ দ্রঃ—২৪/১/৭৯ তাং হতে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন জায়গায় কাজের অন্বেষণে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজেরতকালিন অবস্থায় বিভিন্ন দিনের গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৫০০ (পাঁচ শত জন)

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ট)

নৌকা ছিনতাই-এর তালিকা ২৪/১/৭৯ তাং হতে ১১/২/৭৯ তাং পর্য্যন্ত নৌকা ছিনতাই সংখ্যা নেতাজী নগর ২৪ পরগণা

	নৌকার মালিকের নাম	পিতা / স্বামীর নাম	সংখ্যা	তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১।	বাণীকান্ত মণ্ডল	নটবর	১	২৪/১/৭৯	২২ হাত লম্বা x ৫ হাত খোল
২।	যোগেন্দ্রনাথ রায়	রাধাকান্ত	,,	,,	২১ ,, x ৪ ,,
৩।	ভক্তদাস মণ্ডল	হবিবর	,,	,,	২১ ,, x ৪ ,,
৪।	পাগোল গাইন	নটবর	,,	,,	২২ ,, x ৫ ,,
৫।	ভবেন শীল	শশধর	,,	,,	১৮ ,, x ৩ ,,
৬।	রবিন জোদ্দার	নেপাল	,,	,,	১৬ ,, x ৩½ ,,
৭।	কৃষ্ণপদ গাইন	অর্জুন	,,	,,	১৮ ,, x ৪½ ,,
৮।	ভরত মণ্ডল	মহেন্দ্র	,,	,,	২২ ,, x ৫ ,,
৯।	অতুল বিশ্বাস	মহেন্দ্র	,,	,,	১৮ ,, x ৪½ ,,
১০।	সূর্যকান্ত মিস্ত্রী	ভগীরথ	,,	,,	১৮ ,, x ৪½ ,,
১১।	হরেন মিস্ত্রী	মাদার	,,	,,	২২ ,, x ৫,,
১২।	নিরাপদ মণ্ডল	নবীন	,,	,,	১৮ ,, x ৪½ ,,
১৩।	জিতেন মণ্ডল	মান্যবর	,,	,,	১৮ ,, x ৪ ,,
১৪।	লঙ্কেশ্বর সরকার	দয়াল	,,	,,	১৮ ,, x ৪ ,,
১৫।	গোপাল সরকার	রামচরন	,,	,,	১৬ ,, x ৩½ ,,
১৬।	শৈলেন সরকার	ভীষ্ম	,,	,,	২৫ ,, x ৬ ,,
১৭।	বিকাশ সরকার	খগেন	,,	,,	২১ ,, x ৪ ,,
১৮।	অখিল মণ্ডল	বিরিঞ্চি	,,		
১৯।	সুনীল হালদার	মধুসূদন	,,		
২০।	পরিতোষ মণ্ডল	প্রাণেশ্বর	,,	,,	১০ ,, x ৩½ ,,
২১।	সতীশ গাইন	বিপিন	,,	,,	১৯ ,, x ৪½ ,,
২২।	রমেশ বিশ্বাস	মোহন	,,	,,	১১ ,, x ৩½ ,,
২৩।	নিখিল গোলদার	মাখন	,,	,,	১৫½ ,, x ৪ ,,
২৪।	প্রথম বাছাড়	চিত্তরঞ্জন	,,	,,	১৮ ,, x ৪½ ,,
২৫।	দেবেন চন্দ্র রায়	রাইচরন	,,	,,	১০½ ,, x ৩½ ,,
২৬।	নির্ম্মল পাল	কাঙ্গাল	,,	,,	১৬ ,, x ৪½ ,,
২৭।	সুরেন সানা		,,	,,	১০½ ,, x ৪½ ,,
২৮।	গুরুপদ রায়	বিজয়	,,	,,	১২ ,, x ২½ ,,
২৯।	ভদ্র সরকার	লালচাঁদ	,,	,,	২৩ ,, x ৫ ,,
৩০।	বিষ্টুপদ মণ্ডল	নরেন্দ্র	,,	,,	১৫ ,, x ৪½ ,,
৩১।	হরিপদ বরকন্দাজ	মান্দার	,,	,,	১০ ,, x ৪ ,,

নৌকার মালিকের নাম	পিতা / স্বামীর নাম	সংখ্যা	তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাত	লম্বা	x খোল
৩২। মহেন্দ্র বিশ্বাস	সতীশ	„	„	১৮	„	x ৪ „
৩৩। সন্ন্যাসী মণ্ডল	পাঁচু	„	„	২০	„	x ৪ „
৩৪। ভূপতি মণ্ডল	প্রাণকৃষ্ণ	„	„	২৩	„	x ৫ „
৩৫। সুধাংশু বিশ্বাস	পূর্ণচরন	„	„	১৬½	„	x ৪½ „
৩৬। সুধীর সরকার	নবীন	„	„	২১	„	x ৫ „
৩৭। দিগম্বর মণ্ডল	অন্নদা	„	„	১৮	„	x ৪½ „
৩৮। বিমল হালদার	হরিচরণ	„	„	১৮	„	x ৪ „
৩৯। সুখরঞ্জন হালদার	অন্নদা	„	„	২৪	„	x ৬ „
৪০। সুনীলকৃষ্ণ রায়	ছবর	„	„	১৯	„	x ৪½ „
৪১। মহাদেব মণ্ডল	সতীশ	„	„	২১	„	x ৬ „
৪২। উপেন্দ্রনাথ রায়	পাচুরাম	„	„	১৮	„	x ৪½ „
৪৩। কেশব সরকার	সরজী	„	„	১১	„	x ৫ „
৪৪। সুবল বাছাড়	মোহন	„	„	২২	„	x ৫ „
৪৫। জিতেন্দ্রনাথ রায়	ভূষণ	„	„	১১	„	x ৫ „
৪৬। পাগোল ঢালি	সুখচাঁদ	„	„	১৮,	„	x ৫ „
৪৭। নগেন সানা	চন্দ্রকান্ত	„	„	১৮	„	x ৫ „
৪৮। কালিপদ যানা	সুখচাঁদ	„	„	১৪	„	x ৪ „
৪৯। গনেশ মণ্ডল	বিরেশ্বর	„	„	১৫	„	x ৬½ „
৫০। মতিলাল মণ্ডল	কালাচাঁদ	„	„	১৭	„	x ৪ „
৫১। কালিপদ পাণ্ডে	সাবুচরণ	„	„	১৭½	„	x ৩½ „
৫২। নিরাপদ জোদ্দার	শম্ভুনাথ	„	„	২৪	„	x ৪½ „
৫৩। কালিপদ পাল	চিন্তারাম	„	„	১৯	„	x ৪½ „
৫৪। মুকুন্দবিহারী পাল	নিশিকান্ত	„	„	১৯	„	x ৪ „
৫৫। নারায়নচন্দ্র দে	যাদব	„	„	২৪	„	x ৪½ „
৫৬। বিজয়কুমার বিশ্বাস	বিরেন্দ্র	„	„			
৫৭। মধু মালাকর	শ্রীমহেন্দ্র	„				
৫৮। যতীশ মণ্ডল	সুখচরণ	„				
৫৯। বীরেন মণ্ডল	নকুল	„				
৬০। রাখাল বাড়ৈ		„				
৬১। মনিন্দ্রনাথ মণ্ডল	পারশ	„	„	২৩	„	x ৮ „
৬২। চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	° নগেন্দ্রনাথ	„	„	১৯	„	x ৪ „
৬৩। বিমলকুমার গাইন	অটল	„	„	২১	„	x ৪ „
৬৪। বাসুদেব সরকার	° অবিনাস	„	„	২৩	„	x ৬½ „
৬৫। অবিনাস সরকার	° হরিপদ	„	„	২৩	„	x ৪ „

নৌকার মালিকের নাম	পিতা / স্বামীর নাম	সংখ্যা	তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাত	লম্বা	x খোল
৬৬। সুবলচন্দ্র মণ্ডল	° যদুনাথ	„	„	২৪ „	„	x ৭½ „
৬৭। সতীশচন্দ্র সরকার	° হেমচন্দ্র	„	„	১১ „	„	x ৩½ „
৬৮। শ্রীমতী হরিদাসী মণ্ডল	স্বাঃ হরেন্দ্র	„	„	১৮ „	„	x ৪ „
৬৯। শ্রীমতী বিশ্বাক্ষ	কানাইচরণ	„	„	২০ „	„	x ৪ „
৭০। শারদা সরকার	° ইন্দ্র সরকার	„	„	১৮„	„	x ৩½ „
৭১। সুরেন্দ্রনাথ রায়	° ভজন রায়	„	„	১৮ „	„	x ৪ „
৭২। অনিল পাল	° কাঙ্গালী	„	„	১৩ „	„	x ৪½ „
৭৩। হরিপদ শীল	° শারদা	„	„	১২ „	„	x ৪½ „
৭৪। সুধাংশু সরকার	° নবীন	„	„	২১ „	„	x ৫½ „
৭৫। নির্ম্মলচন্দ্র হালদার	° পরেশ	„	„	২২ „	„	x ৬ „
৭৬। দুলাল মণ্ডল	সন্ন্যাসী	„	„	১৮ „	„	x ৪ „
৭৭। লক্ষ্মণ হালদার	° রজনীকান্ত	„	„	১৮ „	„	x ৩½ „
৭৮। জিতেন্দ্র মণ্ডল	° লক্ষ্মণ	„	„	১৯„	„	x ৪ „
৭৯। সুকুমার সরকার	° হরেকৃষ্ণ	„	„	২৫ „	„	x ৪ „
৮০। নগেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী	° অনন্ত	„	„	২১ „	„	x ৪ „
৮১। হরিভূষণ মল্লিক	° কার্ত্তিক	„	„	২৩ „	„	x ৪½ „
৮২। তারাপদ মাঝি	° রতন	„	„	১১ „	„	x ৪ „
৮৩। পণ্ডিত মণ্ডল	° অর্জুন	„	„	১৫ „	„	x ৩ „
৮৪। বাসুদেব মণ্ডল	° বিরেশ্বর	„	„	২৪ „	„	x ৫ „
৮৫। বিষ্ণুপদ পাল	° পঞ্চানন	„	„	২৫ „	„	x ৬½ „
৮৬। শ্রীমতী মহারানী বসু	স্বাঃ গনেশ	„	„	১৫ „	„	x ৩ „
৮৭। বিশ্বনাথ বিশ্বাস	নগেন্দ্র	„	„	২৩ „	„	x ৪ „
৮৮। অবনীকান্ত গাইন	হরেন্দ্র নাথ	„	„	১৯ „	„	x ৪ „
৮৯। গুরুবর বাগচী	° ফকিরচাঁদ	„	„	২১ „	„	x ৪½ „
৯০। সতেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী	বলরাম	„	„	১৬„	„	x ৩½ „
৯১। সুরেন্দ্রনাথ সরকার	° বিরাজ মোহন	„	„	১২ „	„	x ৫ „
৯২। প্রাণরঞ্জন হালদার	রাজেন্দ্র	„	„	২১ „	„	x ৫ „
৯৩। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস	° বিপিন	„	„	১৯ „	„	x ৪½ „
৯৪। শ্রীমতী বিবিবালা বরকন্দাজ	স্বাঃ হরিপদ	„	„	২৩ „	„	x ৪½ „
৯৫। সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	° সম্ভুচরন	„	„	২২ „	„	x ৪ „
৯৬। রবিন বারুই	কৃষ্ণকান্ত	„	„	১৮ „	„	x ৪ „
৯৭। গোপাল মিস্ত্রী	ইশ্বর মিস্ত্রী	„	„	২১ „	„	x ৪ „
৯৮। নিরাঞ্জন মণ্ডল	রসিক মন্ডল	„	„	১২ „	„	x ৪ „
৯৯। বিনোদ মণ্ডল	° সতীশ মণ্ডল	„	„	২৪ „	„	x ৬ „

নৌকার মালিকের নাম	পিতা / স্বামীর নাম	সংখ্যা	তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাত	লম্বা	x খোল
১০০। শ্রীকান্ত বিশ্বাস	*রামচরন	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৩½ ,,
১০১। পতিরাম মণ্ডল	সর্ব্বেশ্বর	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১০২। শ্রীমতী লক্ষ্মীরানী বিশ্বাস	ধীরেন	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১০৩। উর্ম্মিলা বাইন	কালিপদ	,,	,,	২১ ,,	,,	x ৫ ,,
১০৪। বিরিঞ্চি মণ্ডল	কেশবলাল	,,	,,	১৯,,	,,	x ৩ ,,
১০৫। অখিলচন্দ্র বৈরাগী	*লক্ষ্মণ বৈরাগী	,,	,,	১৩ ,,	,,	x ৩ ,,
১০৬। ভূধরকৃষ্ণ মণ্ডল	হাজারী	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৩ ,,
১০৭। শ্রীমতী বকুল ঘরামী	খগেন	,,	,,	২০ ,,	,,	x ৪½ ,,
১০৮। বিনোদ ঢালী	*ঈশান	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১০৯। গতিনাথ সানা	*ভীম	,,	,,	২৪ ,,	,,	x ৩ ,,
১১০। মৃতঞ্জয় রায়	শ্রীসতীশ	,,	,,	২১ ,,	,,	x ৫ ,,
১১১। নিরাপদ মণ্ডল	পূর্ণচরণ	,,	,,	১৬ ,,	,,	x ৩ ,,
১১২। হাজারী মহলদার	বিপিন	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৩½ ,,
১১৩। বিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল	বিহারীলাল	,,	,,	২৪ ,,	,,	x ৪½ ,,
১১৪। তেজেন্দ্র গাইন	নারায়ণ	,,	,,	২৩ ,,	,,	x ৬½ ,,
১১৫। ভবরঞ্জন হালদার	*গঙ্গাধর	,,	,,	২৪ ,,	,,	x ৬½ ,,
১১৬। দরশন জোয়াদার	*মতুরাম	,,	,,	১৩ ,,	,,	x ৩ ,,
১১৭। গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল	*নিলম্বর	,,	,,	১৩ ,,	,,	x ৩ ,,
১১৮। অখিল মণ্ডল	*মুল্লুকচাঁদ	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১১৯। তিলকচন্দ্র মণ্ডল		,,	,,	২০ ,,	,,	x ৪½ ,,
১২০। কালিপদ রায়	*ফকির রায়	,,	,,	১৪½,,	,,	x ৪ ,,
১২১। হরষিত মণ্ডল	*লক্ষ্মণ	,,	,,	২১ ,,	,,	x ৪ ,,
১২২। গোপাল হালদার	সুরেন	,,	,,	২০ ,,	,,	x ৪ ,,
১২৩। বীরেনকুমার শীল		,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৫½ ,,
১২৪। হরিপদ কয়াল	সুশীল	,,	,,	২১½ ,,	,,	x ৪½ ,,
১২৫। প্রফুল্লকুমার শীল		,,	,,	১৬ ,,	,,	x ৩½ ,,
১২৬। কালিপদ সরকার	শিবপদ	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪½ ,,
১২৭। মুকুন্দ বিহারী পাল		,,	,,	১৭,,	,,	x ৪ ,,
১২৮। সুনীল কুমার রায়	ধীরেন্দ্র	,,	,,	২৪ ,,	,,	x ৪,,
১২৯। ভক্তরাম মণ্ডল	*কমল	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪ ,,
১৩০। ধীরেন্দ্র নাথ রায়		,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১৩১। মধুসুধন রায়		,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১৩২। নিরাপদ মিস্ত্রী		,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪ ,,
১৩৩। কৃষ্ণপদ সরকার		,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৩½ ,,

নৌকার মালিকের নাম	পিতা / স্বামীর নাম	সংখ্যা	তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ হাত	লম্বা	x খোল
১৩৪। হরেন কবিরাজ		,,	,,	২৩ ,,	,,	x ৫ ,,
১৩৫। বিহারী মণ্ডল		,,	,,	২৫ ,,	,,	x ৫ ,,
১৩৬। গুরুপদ রায়		,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪,,
১৩৭। তারকচন্দ্র রায়		,,	,,	১৬ ,,	,,	x ৩½ ,,
১৩৮। নিরাপদ সরকার	*গোপাল	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪ ,,
১৩৯। সুরাজ বিশ্বাস		,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১৪০। যোগেন্দ্র মণ্ডল		,,	,,	২৪ ,,	,,	x ৬ ,,
১৪১। চারচন্দ্র মণ্ডল	*শীতল	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪½ ,,
১৪২। বানীকান্ত মণ্ডল		,,	,,	২৩ ,,	,,	x ৫ ,,
১৪৩। শিবপদ মণ্ডল		,,	,,	২১ ,,	,,	x ৪ ,,
১৪৪। যোগেন্দ্র মণ্ডল		,,	,,	১১ ,,	,,	x ৪½ ,,
১৪৫। ধীরেন্দ্র মণ্ডল		,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪½ ,,
১৪৬। বিজয়গাইন		,,	,,	২১ ,,	,,	x ৪½ ,,
১৪৭। বিমল সরদার	*বেনীমাধব	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪ ,,
১৪৮। অশ্বিনী সরদার		,,	,,	১৮½ ,,	,,	x ৪ ,,
১৪৯। চন্দ্রকান্ত বৈদ্য	*সতীশ	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪ ,,
১৫০। সুধাংশু সিকদার		,,	,,	২২ ,,	,,	x ৫ ,,
১৫১। অরবিন্দু বৈদ্য	ধীরেন	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪ ,,
১৫২। সুধন্য সেন	হরষিত	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪ ,,
১৫৩। পঞ্চরাম সরকার		,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১৫৪। অরবিন্দু মণ্ডল		,,	,,	২০ ,,	,,	x ৩½ ,,
১৫৫। নিরোদ বি সরকার		,,	,,	২৩ ,,	,,	x ৫ ,,
১৫৬। তারাপদ সরকার	*জ্ঞানেন্দ্র	,,	,,	২১ ,,	,,	x ৫ ,,
১৫৭। ভক্তদাস মল্লিক		,,	,,	২১ ,,	,,	x ৫ ,,
১৫৮। হরিপদ কবিরাজ		,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৪ ,,
১৫৯। পুলিন মিস্ত্রী	পরেশ	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪ ,,
১৬০। নগেন মণ্ডল	বিষ্ণুপদ	,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪ ,,
১৬১। বিশ্বনাথ রায়	নকুল	,,	,,	১৭ ,,	,,	x ৩½ ,,
১৬২। ধীরেন্দ্র মণ্ডল	দ্বিজবর	,,	,,	১৯ ,,	,,	x ৪½ ,,
১৬৩। চন্দ্রকান্ত বসু		,,	,,	১৮ ,,	,,	x ৪ ,,

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

রাইহরণ বাড়ৈ (সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

পরিশিষ্ট—৩ (ঠ)

ছিনতাইকারী মালপত্রের তালিকা ঃ ২৪/১/৭৯ হইতে ২৪/২/৭৯ পর্যন্ত

নং	মালিকের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ছিনতাইকারী	ছিনতাই স্থান	পরিমান	তারিখ
১।	তপন দে	মৃতঃ বিমল	পুলিশ	কুমিরমারী	১৫কে চাউল	৫/২
২।	সুনিল ভট্টাচার্য্য	„ ক্ষেত্রমহন	„	„	৩৫ „	„ „
৩।	গুরুপদ সরকার	„ দয়াল	„	„	১৫ „	„ „
৪।	কেশব হালদার	„ যোগেন্দ্র	„	„	৪৫ „	„ „
৫।	গৌরপদ মণ্ডল	„ হাজরাপদ	„	„	২৫ „	„ „
৬।	পুলিন মণ্ডল	„ রাজেন্দ্র	„	„	৪০ „	„ „
৭।	গবিন্দ সাহা	„ মতিশ	„	„	১৫ „	„ „
					২০ „	সুজি
					১০ „	ময়দা
					১০ „	আটা
					১০ „	চিড়ে
					৫ „	তরকারী
৮।	বঙ্কিম বৈরাগী	„ রতন	„	„	১০ টাকা	„
৯।	তপন দে	„ কেশব	„	„	২০কেজি চাউল	„
১০।	পুলিন রায়	„ নকুল	„	„	২৫ „	„ „
১১।	শৈলেন সরদার	„ বিশ্ব সরদার	„	„	৪০ „	„ „
১২।	প্রমথ বিশ্বাস	„ কেশব	„	„	৩০ „	„ „
১৩।	জগদীশ সরকার	„ দুলাল	„	„	৮০ „	তরকারী
১৪।	শিশুমহন মণ্ডল	„ মহাদেব	„	„	৪০ „	চাউল „
১৫।	জগদীশ বাড়ৈ	„ মহাদেব	„	„	২০ „	„ „
১৬।	কর্ণধর মণ্ডল	শ্রীসতিশ	„	„	১০টাকা	
					৪কেঃ	তরকারী
					১০ „	চাউল
১৭।	অধীর মণ্ডল	মৃতঃ অন্তত	„	„	১০ „	চাউল
১৮।	অখিল মণ্ডল	„ নরেন	„	„	৩০ „	„ „
১৯।	প্রণব মণ্ডল	„ বাজারী	„	„	৭০ „	„ „
২০।	সুধন্য মণ্ডল	„ পবন	„	„	৩৫ „	„ „
২১।	রমেশ হালদার	„ খগেশ্বর	„	„	১৫ „	„ „
২২।	হরিভক্ত সরকার	„ বসন্ত	„	„	৪০ „	„ „
২৩।	বিজন গাইন	„ অটল	„	„	৪০ „	„ „
২৪।	মেঘনাথ মন্ডল	„ বিষ্ণুপদ	„	„	২৮ „	„ „
২৫।	হরিপদ শীল	„ সারদা	„	„	২০ „	„ „

নং	মালিকের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ছিনতাইকারী	ছিনতাই স্থান	পরিমান	তারিখ
২৬।	গণেশ সরকার	„ মহাদেব	„	„	১৫২ „	„ „
২৭।	বিরেন অধিকারী	„ নিত্যানন্দ	„	„	১০ „	„ „
২৮।	পুলিন মণ্ডল	„ রাজেন্দ্র	„	„	৪০ „	„ „
২৯।	অরবিন্দু মণ্ডল	শ্রীসুরেন্দ্র	„	„	৩০ „	„ ৬/২
৩০।	অরবিন্দু মণ্ডল	„ রতিকান্ত	„	„	১২০ „	„ „
					১০ „	বুট „
					১০ „	ময়দা „
					১ „	তামাক
৩১।	মনোরঞ্জন মণ্ডল	„ শিরীস	„	„	১৫ কেঃ	চাউল „
৩২।	শ্রীনাথ মণ্ডল	শ্রীদিগম্বর	„	„	৪০ „	„ „
৩৩।	প্রহ্লাদ গোলদার	„ অক্ষয়	„	„	২০ „	„ „
৩৪।	চিত্ত রায়	শ্রীপূর্ণ	„	„	২৬ „	„ ৭/২
৩৫।	রমেশ বৈদ্য	„ সুশান্ত	„	„	৩৫ „	চিড়া ৬/২
৩৬।	ঠাকুর দাস	„ সুখলাল	„	„	৪৭ „	চাউল „
৩৭।	সহদেব বিশ্বাস	„ শ্রীঠাকুর	„	„	৪০ „	মুড়ি ৬/২
৩৮।	দিলীপ মিস্ত্রী	„ হরিবর	„	„	৮০ „	„ ৪/২
৩৯।	নিরাপদ বালা	„ মদন	„	„	১৫ „	„ ৬/২
৪০।	গণেশ শীল	„ মহাদেব	„	„	৩৫ „	„ ৫/২
					৪ „	আটা
৪১।	নিরাপদ সরকার	„ মহাদেব	„	„	২ „	গুড় ৭/২
					১ „	লঙ্কা
৪২।	নিতাই সরকার	„ সর্বেশ্বর	„	„	৬ „	মুড়ি ২/২
					৮ মন ৩১কেঃ	চাউল
৪৩।	রাজেন সরকার	„ ভীম সরকার	„	„	৩০কেঃ	চাউল ৪/২
৪৪।	রামেশ্বর	„ দুর্গাচরন	„	„	১১৫ টাকা	„ ৬/২
৪৫।	নিরাপদ মণ্ডল	শ্রীশম্ভু	স্থানিয়	„	৯০ কেঃ	চাউল ১/২
৪৬।	কালিচাঁদ	জগবন্ধু	„	„	৮০ „	„ ৪/২
৪৭।	দুলাল মন্ডল	গিরীধর	„	„	২৫ „	„ „
৪৮।	সারদা মৃধা		„	„	৬৩ „	„ „
৪৯।	নিরঞ্জন মিস্ত্রী	রাজকুমার	„	„	১১০ „	„ „
৫০।	অভিরাম মন্ডল	কৈলাস	„	„	১টা ট্রাঙ্ক	ভর্ত্তিকাপড়
					১টা থালা,	১টা বাটি,
					১টা দা,	১টা কলসী
৫১।	স্বপন মিস্ত্রী	শ্রীদ্বিজেন	সি.পি.এম	„	১০কেঃ	চাউল „
					১ „	কচু

নং	মালিকের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ছিনতাইকারী	ছিনতাই স্থান	পরিমান	তারিখ
					২০টাকা, ১টা শয্যা কাপড়, ১টা ফুলপ্যান্ট, ১টা সোয়েটার	
৫২।	চণ্ডিপদ মণ্ডল	*রমেশ্বর	,,	৭নং জালিয়া	৯কেঃ চাউল	৪/২
৫৩।	সত্যেন হালদার	,, শ্যামাচরণ	,,	কুমিরমারী	৪কেঃ চাউল	৩/২
৫৪।	দুর্গাপদ মণ্ডল	শ্রীশান্তিরাম	পুলিশ	মরিচঝাঁপি	৩০ ,,কপি	৫/২
৫৫।	দেবুরঞ্জন রায়	,,ভূজঙ্গ	,,	,,	৭ ,, ,,	৪/২
৫৬।	মনোরঞ্জন মণ্ডল	,, জজ্ঞেশ্বর	পাবলিক-আর.এস.পি	কুমিরমারী	২০ ,, ,,	৪/২
৫৭।	রূপচাঁদ সরকার	*রাজেন্দ্র	,,	,,	৫ টাকা ১৫ কে চাউল ৫ ,, আলু	৩/২
৫৮।	সচীন গাইন	,, বিহারী	,,	,,	১টা কাপড় ২০কেজি চাউল ৫ ,, আলু	
৫৯।	সুভাষ রায়	শ্রীরাজেন্দ্র	,,	ছোটমোল্লা	৯ ,, চাউল	৫/২
৬০।	ভরত বৈষ্ণম	,, দিগেস্বর	,,	কুমিরমারী	২০ ,, ,,	৩/২
৬১।	মনোরঞ্জন বালা	,, গনেশ	পাবলিক	ছোটমোল্লাখালি	৫ ,, চাউল	৩/২
৬২।	প্রফুল্ল মণ্ডল	,, রাজবিহারী	পুলিশ	কুমিরমারী	২৫ ,, ,,	৭/২
৬৩।	পঞ্চরাম অধিকারী	,, ধরণী	,,	মরিচঝাঁপি	২০০টাকা	৩০/১
৬৪।	জনক মণ্ডল	,, স্বরূপ	,,	,,	২০০০টাকা ও দরকারি মালপত্র	
৬৫।	ধীরেন্দ্রনাথ বৈরাগী	,, বিজয়	,,	,,	২০০টাকার মালপত্র	২/২
৬৬।	শম্ভুরাম পোদ্দার	,, নিরাপদ	,,	,,	৪০কেঃ চাউল	৪/২
৬৭।	নিরাপদ পোদ্দার	,, শম্ভু	,,	ছোটমোল্লাখালি	২০ কেজি আলু	
৬৮।	কুমোদ মণ্ডল	*অভিরাম	,,	,,	২০ ,, চাউল	৫/২
৬৯।	খগেন্দ্র মণ্ডল	,, শিশুমন	,,	,,	১০ ,, আটা ৮ ,, চাউল	৮/২
৭০।	প্রাণকৃষ্ণ মৃধা	,, লক্ষণ	,,	কুমিরমারী	১মন চাউল	৩০/১
৭১।	সুনীল বৈরাগী	,, পূর্ণচরণ	পাবলিক	সাতজেলিয়া	১ মন সুজি ৬০কেজি চাউল	৬/২
			কেশব, গনেশ			

নং	মালিকের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ছিনতাইকারী	ছিনতাই স্থান	পরিমান	তারিখ
৭২।	অজিৎ মণ্ডল	,, নরহরি	ব্রজ মন্ডল	কুমিরমারী	১০ ,, ,,	৬/২
৭৩।	বিভূতি গাইন	শ্রীঅটল	পুলিশ	পাশেরবিল	৬ ,, ,, ১টা চাদর ১ জোড়া জুতো	২/২
৭৪।	প্রমিলা মণ্ডল	শ্রীকালিপদ	,,	,,	৪টা নারিকেল	২/২
৭৫।	রামপ্রসাদ	,, মতিলাল	,,	,,	১২কেঃ চাউল	৭/২
৭৬।	নিত্যানন্দ বালা	,, পূর্ণচন্দ্র	পাবলিক	কুমিরমারী	২০টাকা	৫/২
৭৭।	সন্তোষ বাছাড়	,, দ্বিজবর	পুলিশ	,,	৬০কেঃ চাউল ২ ,, আলু	৩১/১
৭৮।	প্রমথ বিশ্বাস	,, বলরাম	,,	,,	৮৫½ ,,	১/২
৭৯।	সুধীর মৃধা	শ্রী পদ	,,	,,	১০ কেঃ চাউল ৫ ,, কপি ২ ,, আলু	
৮০।	গৌর বৈরাগী	গঙ্গাধর	,,	,,	৯০ ,, চাউল	৫/২
৮১।	অরবিন্দ মণ্ডল	শ্রীধীরেন	,,	,,	৩ ,, ,, ,,	
৮২।	অনন্ত কাপাসী	*রামপদ	,,	,,	৫ ,, আলু ৫ ,, কপি	৭/২
৮৩।	শারদা রায়	,, রাজেন	পাবলিক	ছোটমোল্লা	৬৩ ,, চাউল	১/২
৮৪।	ভবেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীবিশ্বনাথ	পুলিশ চৌকিদার (কাকসা)	মরিচঝাঁপি	৬ টাকা	৩/২
৮৫।	পবিত্র মণ্ডল	,, অনন্ত	পাবলিক	কুমিরমারী	১১কেঃ ছিম ১১ ,,বেগুন ১০ ,, কপি	৬/২
৮৬।	শরৎ ঘরামী	*রমেশ	পুলিশ	মরিচঝাঁপি	১কুঃচাউল ৩ টাকা	৩/২
৮৭।	আদিত্য মাঝি	*রশিক	পাবলিক	কুমিরমারী	২ কেঃ চাউল ১টা প্যান্ট ১,, ব্যাগ ১,, গামছা ১ ,,চাদর ২০ টাকা	
৮৮।	নিরঞ্জন মণ্ডল	শ্রীবল্লভ	পুলিশ	,,	২০কেঃ চাউল	২/২
৮৯।	অমূল্য সরকার	*বরদা	,,	মরিচঝাঁপি	১১০ টাকা ১টা কাপ ১টা নাইলন লেপ	৩১/১

নং	মালিকের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	ছিনতাইকারী	ছিনতাই স্থান	পরিমান তারিখ
৯০।	সন্তোষ মণ্ডল	শ্রীশম্ভুচরণ	গ্রামের লোক	সাতজেলিয়া	৭৫ কেঃ চাউল১/২
৯১।	শান্তিপদ সরকার	নরহরি	গ্রামের লোক	কুমিরমারী	৪টাকা ৭/২
৯২।	ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল	চৈতন্য	পুলিশ	„	৩৫ টাকা ৩১/১
৯৩।	যোগেন্দ্র রায়	সুধন্য	পুলিশের চৌকিদার	সাতজেলিয়া	১০ কেঃ চাউল১/২ ১০ কেঃ আলু ১৫ টাকা
৯৪।	ভূপতি ঢালী	চতুর	গ্রামের লোক	„	১৬ কেঃ চাউল৪/২ ২ কেঃ গুড় ১টা থলে
৯৫।	নগেন মণ্ডল	যগেশ্বর	„	কুমিরমারী	১০ কেঃ চাউল৩/২
৯৬।	শশী বিশ্বাস	„হরিপদ	„	„	৫ „ „ ৩/২
৯৭।	ভবেশ মিত্র	„ রামপদ	„	„	১২ „ „ ৭/২
৯৮।	প্রভাষ মণ্ডল	„ অনন্ত	„	মোহনখালি	১০ „ „ „
৯৯।	অভিলাস	„ সতিশ	„	কুমিরমারী	৮০ „ „ „
১০০।	চিত্তরঞ্জন মণ্ডল	„ নরেন	„	„	৩০ „ „ „ ৮/২
১০১।	যিশুচরণ রায়	„ কামিনী	„	মরিচঝাঁপি	প্লট হইতে ঘর ভাঙ্গিয়া মালপত্র নিয়া যায় — ১৪/২
১০২।	শঙ্কর রায়	„ কামিনী	„	„	„ „ „
১০৩।	গোপালচন্দ্র	„ মানিক	„	„	৩০ „ „ ৩/২
১০৪।	সুখরঞ্জন হালদার	„ অন্নদা	„	কুমিরমারী	২কুঃ৪১কেঃ „ চাউল
১০৫।	কেশব সরকার		„	„	৩কুঃ ৮৪কেঃ১৪/২ চাউল „
১০৬।	নিমাই মণ্ডল		„	„	৫কুঃ ৫কেঃ „ চাউল „
১০৭।	হরিপদ শীল		„	„	১কুঃ ৮৫কেঃ চাউল
১০৮।	কালিপদ গোলদার		„	„	৭৫ কেঃ চাউল ৩ কুঃ „
১০৯।	পরিতোষ বৈদ্য		„	„	১৫০কেঃ আটা ১০০ „ চাউল
১১০।	রণজিৎ মাঝি		„	„	৭৫ „ আটা
১১১।	শ্রীনাথ মণ্ডল		„	„	১০০ „ চাউল
১১২।	বিজন বিশ্বাস	বিরেন্দ্র	„	সাতজেলিয়া	২০০ „ „ „
১১৩।	মধুসূদন সরকার	মহেন্দ্র	„	„	১৫০ „ „ „

মোট ছিনতাইকৃত মালপত্রের তালিকা ঃ

১। চাউল—৫২কুঃ ৭৪ কেজি ১টা গামছা ১টা নাইলন ছাতা

২। আটা — ৪ „ ১০ „ ১টা ট্রাঙ্ক, ১ চাদর, ১ থালা, ১ লেপ

৩। ময়দা — ২০কেজি„ ১ বাটি, ১ কেজি তামাক, ১দা, ২ কেঃ গুড়

৪। চিড়া — ৪৫ „ ১ কম্বল, ৬ কেঃ লঙ্কা

৫। মুড়ি — ২ কুঃ ৭৬ কেজি, ২ প্যান্ট, ১০ কুঃ ডাল

৬। তরকারী — ২ কুঃ ৮৭ „ ১ সোয়েটার, ৮৫½ কেঃ চাউল

মোট সামগ্রী — ৬৪ কুইন্টাল, ১৭ কেজি, ১ জোড়া জুতা,

নগদ টাকা ২৭৭৮.০০, মোট সামগ্রীর মূল্য - ১২৮৩৪ টাকা

গত ২৪/১/৭৯ হইতে ১৪/২ /৭৯ তাং পর্যন্ত পঃ বঙ্গ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নেতাজিনগর নিবাসী উদ্বাস্তুদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে উপরোক্ত ১১৩ জন ব্যক্তির মালপত্র ছিনতাই হইয়াছে।

রাইচরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ড)

পশ্চিমবঙ্গের ভাই ও বোনেরা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকরা গত ১১/২/৭৯ তারিখ রবিবার মরিচঝাঁপি পরিদর্শণের পর হতে পুলিশের তৎপরতা আগের থেকে বেড়ে চলেছে। অর্থনৈতিক অবরোধ কঠোর হয়েছে। মরিচঝাঁপির মাছ ও জ্বালানী কাঠ কিছুই ধরতে দিচ্ছে না। খাদ্য, পানীয় জল ও ঔষধপত্র আনয়ন করতে দিচ্ছেন না। খাদ্য, পানীয় জল ও ঔষধপত্র আনয়ন করতে গেলে জ্যোতিবাবুর পুলিশ, সি.পি.এম. কর্মীদের সহযোগিতায় মরণাপন্ন উদ্বাস্তুদের টাকা পয়সা এবং বর্ণিত সামগ্রী জোর জবর দস্তি ছিনতাই করে নিচ্ছেন। এসব ঘটনা সাতজেলিয়া, ছোট মোল্লাখালি, আমতলী এবং কুমীরমারি প্রভৃতি জায়গায় প্রতিদিন ঘটে চলছে। সময় সময় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বেপরোয়া মারপিট করে চলছে। বিভিন্ন অজুহাতে বহুলোককে জেলে পুরে দিয়েছে এবং এখন ও দিচ্ছেন। উক্তভাবে এক দমদম সেন্ট্রাল জেলেই ৭৮ জন উদ্বাস্তুকে বন্দী করে রেখেছেন। দিনমজুরী কাজ কর্ম্মে যারা যাচ্ছেন, তারাও রেহাই পাচ্ছেন না। কুমীরমারীর খেয়াঘাটে পুলিশ একটা চেকিং পোষ্ট নূতন করে বসিয়েছেন। উক্ত চেকিংপোষ্টে উদ্বাস্তুদের তল্লাসী করা হচ্ছে।

উপরোক্ত জায়গাগুলিতে সি. পি. এম. এর গুণ্ডা বাহিনীর কিছু সংখ্যক লোক জ্যোতিবাবুর পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় এ সব ঘটনা করে চলেছে। স্থানীয় লোকেরা উক্ত কর্মে বাঁধা দিলে তারাও রেহাই পাচ্ছেন না। এসব দুষ্কৃতিকারী মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত সমস্ত স্থানীয় লোক আমাদের সকল প্রকার সহযোগিতা করে চলছেন। উপরোক্ত দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্কর্মের প্রতিবাদে গত ২৫/২/৭৯ তারিখে কুমিরমারীতে স্থানীয়দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সাথে কৃষি মজুরদের কোন রকমের সংঘাত নেই। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা আশে পাশে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এক বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। স্থানীয় লোকদের সাথে আমাদের আজ পর্যন্ত কোন রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমরা আসার পর থেকে চাউল থেকে শুরু করে কোন জিনিষপত্রের দাম বাড়েনি। স্বাভাবিক অবস্থাতে বাজার দর চলছে।

উদ্বাস্তুরা যেখানে পয়সার অভাবে ঝাউগাছের পাতা, যদুপালং, বনের ফুল এবং হেতালী গাছের মাথা খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সেখানে চাউল মজুত করার কথা আমাদের নিকট আকাশ কুসুম কল্পনা। নৌকা বোঝাই করে বাজারের চাউল পাচার হচ্ছে মরিচঝাঁপিতে, এটা মিথ্যা কথা। কোন ব্যবসায়ী মাছের জন্য এবং কাঠের জন্য মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কোন টাকা পয়সা দাদন দেননি। এটাও পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি, জ্যোতিবাবুর সরকার স্থানীয় কিছু সি.পি.এম গুণ্ডাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থাবলী বন্টন করেছেন। উদ্দেশ্য, মরিচঝাঁপির

উদ্বাস্তুদের মিছে মিছি মারধর করা এবং জোর জবরদস্তি করে দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা। এব্যাপারে বহু মেয়েদেরও হয়রান করা হচ্ছে এবং বাগনা অফিসে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে হবে। দণ্ডকারণ্যে ফিরৎ যেতে অস্বীকার করলে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের মারধর করা হচ্ছে।২৪/১/৭৯ তারিখ হতে আজ পর্য্যন্ত তারা অনুরূপভাবে ৪৭টি পরিবারকে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মরিচঝাঁপি থেকে এর অতিরিক্ত আর একটি পরিবারকেও নিতে পারেন নি এবং ভবিষ্যতে আর একটি পরিবারকেও নিতে পারবেন না বলে আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। সরকারের সেতু নির্মানের কাঠ এবং অন্যান্য মালমসলা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা নেয়নি। মরিচঝাঁপির ৩০ হাজার উদ্বাস্তু মরবে তবু দণ্ডকারণ্যে ফিরৎ যাবে না। এটাই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের মধ্যে কোন দল নাই; তারা অভিন্ন একদল এবং একাত্মা। দণ্ডকে উদ্বাস্তুদের মৃত দেহ যেতে পারে জীবিত নয়। বাইরের থেকে কোন টাকা পয়সা আসাতো দুরের কথা বরং ২৪/১/৭৯ তারিখের পর হতে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের রোজী রোজগারের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। উপরন্তু মরিচঝাঁপির অর্থ দিন দিন বেরুয়ে যেতে যেতে আজ অর্থনৈতিক দিক থেকে শুন্যতে দাঁড়িয়েছে। বনের ঘাস তাদের বাঁচার একমাত্র সম্বল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা মনে করে যে, ৭টি বর্ষার জল নয়, একটি বর্ষার জল খাওয়ানোর পরেই মরিচঝাঁপির জমিতে লোনার পরিবর্তে সোনার ফসল তারা ফলাবে এবং বাস্তবতার সাক্ষ্য বহন করবে।

তীর ধনুক ও অস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উদ্বাস্তুরা যদি অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতো এবং তাদের হাতে থাকতো তাহলে ৩১শে জানুযারী১৯৭৯ উদ্বাস্তু নিধন যজ্ঞে শুধু উদ্বাস্তুরাই নিধন হতো না, দু-একজন পুলিশ কর্মচারী নিধন যজ্ঞে সামিল হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তা হয়নি। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা রাজনীতি বোঝে না ও রাজনীতি করে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে কী বুঝায়, তা উদ্বাস্তুদের বোধগম্যের বাইরে। সরকারী টাকায়, সরকারী শিবিরে, সরকারী কর্মচারীরা থাকতে পারেন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা নয়। সরকারী প্রচারকার্য্য বহুভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা সফল হতে পারেননি। ভবিষ্যতে তা সম্ভব নয়, তাই তারা এত অপপ্রচার এবং মিথ্যাকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চাইছেন।

আমাদের কাতর প্রার্থনা, সরকারের বিভ্রান্তমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে স্বৈরাচারী জ্যোতিবসু সরকারের অর্থনৈতিক অবরোধ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে-এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করুন।

রাইহরণ বাড়ৈ (সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ৫/৩/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (চ)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকারের মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত মিথ্যা বক্তব্যের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঠিক বক্তব্য ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তথা জ্যোতিবসু বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে যে-বক্তব্য রেখেছেন, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি।

স্বতন্ত্র হোমল্যাণ্ড সম্পর্কে জ্যোতিবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, হোমল্যাণ্ড সম্পর্কে উদ্বাস্তুরা কিছুই জানে না। হোমল্যাণ্ডের কোন দাবী উদ্বাস্তুদের নেই। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতারা হোমল্যাণ্ড সম্পর্কে কোন ইস্তাহার দেননি এবং বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের একটি পরিবারকেও তারা আনেন নি।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিক। ভারতীয় সংবিধানের তারা অনুগত। তাই মরিচঝাঁপিতে স্বাধীন ও পাল্টা প্রশাসন্ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে-বক্তব্য রেখেছেন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা তার তীব্র বিরোধিতা করছে। জ্যোতিবাবুর এই বক্তব্যকে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। উদ্বাস্তুদের কোন বক্তব্যে পাল্টা সরকার গঠনের কোন ইঙ্গিত নেই। উদ্বাস্তু সমস্যার মৌলিক দিকটিকে চাপা দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য জ্যোতিবাবু এই মিথ্যা প্রচারে নেমেছেন।

আমরা বাঙালী "জাগোবাঙালী" তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা সম্পর্কে জ্যোতিবাবু এই উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি আমাদের সংস্থা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্থা। সকল রাজনীতি এবং দলাদলির উর্দ্ধে থেকে আমরা শুধু সাধারণভাবে বাঁচার তাগিদে কাজ করে চলেছি। তবে রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্থা সমূহের মানবিক সাহায্যের আমরা প্রত্যাশা করি। আমাদের অতীতের কর্মধারাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন চোরাচালানের ব্যাপারে যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আমরা কোন প্রকার চোরাচালানের সঙ্গে মুক্ত নই। বিড়ি ও বিড়িপাতা সম্পর্কে অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা নিজেরাই কয়েকটা বিড়ির কারখানা করেছে। বর্ণিত বিড়ি এখানেই তৈরি হয় এবং সুন্দরবন এলাকাতেই তা বিক্রী হয়। বাংলাদেশ থেকে কোন দ্রব্য আনার ব্যাপারে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা জড়িত নয়। এ অভিযোগের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।

উদ্বাস্তুরা বনসম্পদ নষ্ট করছে বলে যে-অভিযোগ রাজ্য সরকার করেছেন, সে

সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, বনসম্পদ বলতে যা বুঝায় মরিচঝাঁপিতে তা নেই। আছে গেওয়া গরান ছিটা নামের এক প্রকার আগাছা। এগুলি লম্বা তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট এবং ব্যাস ১$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি। গেওয়াগুলি এ মাপ থেকে সামান্য বড়। মরিচঝাঁপি এলাকায় জমি উদ্ধারের জন্য এগুলি আমরা পরিস্কার করেছি বা করছি।

আমরা চেকপোষ্ট বসিয়ে সরকারী লোক বা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি না বলে রাজ্য সরকার যে অভিযোগ করেছেন, তা সত্য নয়। অতিতে ১লা মে ১৯৭৮ চীফ সেক্রেটারি অমিথ কুমার সেন সদলবলে দেখে গেছেন। ৬ই মে ১৯৭৮ রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী সদলবলে তদন্ত ও জনসভা করে গেছেন। তারা বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন, তার একটিও পালন করেন নি। ১৪ই মে রাজ্য সরকারের আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের ডি. আই. জি. নিরুপম সোম সদলবলে তদন্ত করে গেছেন। এখনও আমরা সরকারী প্রতিনিধি আসতে দিতে অরাজী নই। কিন্তু পুলিশ ছাড়াই আসতে হবে। কারণ পুলিশ দিয়ে আমাদের মারপিট ও অযথা হয়রানি করা হয়েছে। তাই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে বলে পুলিশকে ঢুকতে দিতে আমরা রাজী নই। পুলিশ অবরোধ করে, না খাইয়ে, শুকিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের বহু লোককে হত্যা করেছে, গুলি করেও বহু লোককে মেরেছে। আমরা এভাবে মরতে আর রাজী নই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বলেছে, উদ্বাস্তুরা কেন শুধুমাত্র বাংলাদেশের সীমার কাছে মরিচঝাঁপিতে বসতিস্থাপন করতে চায়, তা আমরা বুঝতে পারছিনা। একথার পরিপেক্ষিতে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বক্তব্য অতন্ত সরল এবং স্পষ্ট। দণ্ডকারণ্য থেকে আসার জন্য পরিস্থিতি দায়ী একথা আমরা স্বীকার করছি। তবুও সরল ও সহজ ভাষায় সত্য কথা বলছি যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমানে ক্ষমতাসীন বামফ্রণ্ট সরকারই দায়ী। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সিকন্দর বখতের কথাই ঠিক। বামফ্রণ্ট সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চট্টোপাধ্যায় ও বামফ্রণ্ট কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষ যখন দণ্ডকারণ্য তদন্তে যান, তখন বামফ্রণ্ট সরকারকেই জানিয়ে তারা যান। দণ্ডকের বিভিন্ন জনসভায় তারাই বলে ছিলেন, "পুনর্বাসনের নামে আপনাদের নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। এটা আদৌ পুর্নবাসন নয়। এছাড়া আরও এমন সব উসকানী মূলক বক্তব্য তারা রাখেন, যা আমরা পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে বিশদভাবে কিছু প্রকাশ করেছি। আমরা যখন হাসনাবাদ ও চর হাসনাবাদে বসবাস করছিলাম, তখন পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ২৪ পরগণা জেলা শাসক ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৮ চর হাসনাবাদে সমিতির সাধারন সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈয়ের সাথে বহু উদ্বাস্তুদের উপস্থিতিতে এক আলোচনায় বসেন, তখন তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "রাজ্য সরকার তিন মাসের রিলিফ সহ সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে দণ্ডক উদ্বাস্তুদের বসতি দিতে রাজী আছেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই আমরা মরিচঝাঁপিতে চলে আসতে বাধ্য হই।"

আমরা দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ সপরিবারে মরিচঝাঁপিতে বসবাস করছি। বাঁচার জন্য শিক্ষা, সংস্কৃতিকে বজায় রাখার জন্য হাটবাজার, বিদ্যালয় তথা সভ্যমানুষের বাঁচার ন্যূনতম যা কিছুর প্রয়োজন তা করেছি এবং করছি। উক্ত কাজ প্রতিটি উদ্বাস্তুর তিল তিল করে রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে উঠেছে। এ কাজে উদ্বাস্তুদের শ্রমের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে প্রায় ৫ কোটি থেকে ৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার বলেছেন, মরিচঝাঁপি দ্বীপটি মানুষের বসবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমরা উদ্বাস্তুরা এখানে একবৎসর যাবৎ বসবাস করছি এবং পার্শ্ববর্তী কুমীর মারি এলাকায় লোক দীর্ঘকাল বসবাস করে আসছেন। এতেই প্রমাণ হয়, যে এ জায়গায় বসতি স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রাজ্য সরকারের আরও বক্তব্য উদ্বাস্তুরা কেন বাংলা দেশের সীমানা মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞ, তা আমরা বুঝতে পারছি না। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরাও ঠিক বুঝতে পারছে না। যেখানে কতকগুলি নিরীহ মানুষ কায়িক পরিশ্রম করে জীবনধারনের পথ খুঁজছে, সেখানে জ্যোতিবাবু কেন বাংলাদেশের সীমানার অজুহাত তুলে এবং পাল্টা সরকার ইত্যাদি ধূয়া তুলে উদ্বাস্তু এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে প্রচারে নেমেছেন। আমরা উদ্বাস্তুরা তার কথার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। যে সীমান্ত মরিচঝাঁপি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে, তার এত গুরুত্ব দেওয়ার কি কারণ?

আমরা পূর্ববাংলার মানুষ পুর্ববাংলার জলহাওয়ার অনুরূপ আবহাওয়া সুন্দরবনে বিদ্যমান। দণ্ডকারণ্যে কাঁকর মাটি আমাদের বসবাস ও জীবন গঠনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তবুও রাজ্যসরকার কেন ঐ প্রতিকুল পরিবেশে আমাদের কৌশলে ও জোর করে পাঠাতে চান তা আমরা বুঝতে পারছি না।

আমরা মরিচঝাঁপিতে আজ অসহায়ভাবে পুলিশ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। অনাহারে শিশুসহ অনেক মানুষ প্রতিদিন মরছে। তাই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার সময় আমাদের নেই। তবে সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের এই প্রতিবেদনের পরিপেক্ষিতে আপনারা সত্য যাচাই করবার জন্য এগিয়ে আসুন। উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে এই নিরীহ মানুষগুলির সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান কোন পথে সম্ভব, তা আপনারা চিন্তা করুন। যে বামফ্রন্ট সরকার সর্ব্বহারার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন ক্ষমতার এসেছেন, তারা আজ অতীতকে বিস্মৃত হয়ে সর্ব্বহারার বুকের রক্তে তর্পন করেছে। শত শত শিশুকে অনাহারে শুকিয়ে হত্যা করেছে। উদ্বাস্তুদের ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে পিষে মারবার হীন আয়োজন করেছে। তার প্রতিবাদে আপনারা মানবিক সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসুন। সেই সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান দাবী সমুহ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যথাঃ—

(১) সরকারের পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বনদপ্তরের ২৪/২৬ (গ) ধারা অনুযায়ী

আমাদের খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ করে মেরেছেন ও মারছেন। বর্ণিত ধারা সহ সকল প্রকার অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

(২) সমগ্র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে মৃত ও আহতদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ সহ এই সমস্যার সুষ্ঠু ও মৌলিক সমাধান করতে হবে।

(৩) সুন্দরবনের দাবী সরকারকে মেনে নিতে হবে এবং উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য তথা বহিঃ বাংলায় পাঠানো চলবে না।

(৪) সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে সরকারী ও বেসরকারী রিলিফ সাময়িক ভাবে দিতে হবে এবং ভারতীয় নাগরিকদের প্রাপ্ত অধিকার ও সুবিধাসমুহ উদ্বাস্তুদের দিতে হবে।

(৫) উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার সরকারকে বন্ধ করতে হবে। উদ্বাস্তুদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবার সকল প্রকার অধিকার দিতে হবে।

(৬) উদ্বাস্তুনেতা সহ উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, বিনা শর্তে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। জেলে ও বন্দী উদ্বাস্তুদের মুক্তি দিতে হবে। নৌকাসহ অন্যান্য লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

"জয়হিন্দ"

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (গ)

পশ্চিমবঙ্গের ভাই ও বোনের কাছে মরিচঝাঁপির অবরুদ্ধ বাঙালী উদ্বাস্তুদের করুণ আবেদন

ভাই ও বোনেরা,

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ ২১ শে ফেব্রুয়ারির পরে বহাল থাকবে না বলা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতি বসু সরকার হাইকোর্টের রায় অমান্য করে পুরোপুরি খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ করে এখনও বসে আছে। সমিতি মনে করে হাইকোর্টের রায় বা রুলিং এর ২৪/২৬ ধারা সরকারের সৃষ্টি। উক্ত রায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা অনুসরণ করে চলেছিল। রাজ্য সরকার নিজেই তা ৭/২/৭৯ তারিখ থেকে অমান্য করে চলেছেন। পুলিশ কর্তৃক খাদ্য সামগ্রী এবং টাকা পয়সা জোর করে ছিনতাই করেছেন। যথা ঃ—

তারিখ	নাম	বিবরণ	পরিমাণ	মোটাটাকা
১।১৬/২/৭৯	অনন্তকুমার মণ্ডল	চাউল	৬ বস্তা	৯৭৫.০০
		আটা	৮ „	১২০০.০০
		কেরোসিন	৪ টিন	৯৬.০০
		লবণ	৫বস্তা	১৭০.০০
		অন্যান্য মাল —		৩০০.০০
				২৭৪১.০০
২।১৬/২/৭৯	অরবিন্দু রায় নিরাঞ্জন বাড়ৈ	চাউল	৬ বস্তা	৯৭৫.০০
		আটা	৩ বস্তা	৩৫৪.০০
		সঃ তেল	৫ টিন	৮২০.০০
		লবণ	৮ বস্তা	২৭২.০০
		অন্যান্য মাল —		৩৬৫.০০
		চাউল	৬ বস্তা	৯৭৫.০০
				৩৭৬১.০০
৩।১৬/২/৭৯	কার্ত্তিক সরকার	চাউল	৭ বস্তা	১৭৫৫.০০
		আটা	৭ „	৮২৬.০০
		সঃ তেল	৩ টিন	৪৯৫.০০
		কেরোসিন	৫ টিন	১২০.০০
		অন্যান্য মাল —		৫৫২.০০
				৩৭৪৮.০০
৪।১৬/২/৭৯	রণজিৎ মণ্ডল	চাউল	৬ বস্তা	৭০৮.০০
		আটা	৯ „	১০৬২.০০

		সঃ তেল	৮ টিন	১৩০২.০০
		কেরোসিন	৫ টিন	১২০.০০
		অন্যান্য মাল —		৬২০.০০
				৩৮১২.০০
৫। ১৬/২/৭৯	কৃষ্ণপদ বিশ্বাস	চাউল	১২বস্তা	২১০০.০০
		আটা	৯ „	১০৬২.০০
		সঃ তেল	৯ টিন	১৪৭৩.০০
		কেরোসিন	৫ „	১২০.০০
		অন্যান্য মাল —		৩৭১.০০
				৫১২৬.০০

রাজ্য সরকার বলছেন আমরা উদ্বাস্তুরা বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জ্যোতিবসু সরকার বলেছেন, দণ্ডক উদ্বাস্তুরা সমান্তরাল সরকার গঠন করেছেন এবং তারা অনুরূপভাবে কার্য্য পরিচালনা করছেন। জ্যোতিবসু এবং তার সরকারের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব। উদ্বাস্তুরা মনে করে এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। দণ্ডক উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতের সংবিধানের অনুগত। ভারতীয় সংবিধানকে মেনে চলতে তারা বদ্ধপরিকর।

উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপি বনসম্পদ নষ্ট করছে বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে বক্তব্য রাখছেন আমরা তার ঘোর বিরোধিতা করছি। বন সম্পদ বলতে যাহা বুঝায় মরিচঝাঁপিতে তা নেই। দণ্ডক উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপির জঙ্গল পরিস্কার করে যে সব জমি উদ্ধার করেছেন, উক্ত জঙ্গলের মধ্যে গরান, ছিটা ও গেওয়া বলে এক জাতীয় আগাছা রয়েছে। যাহা লম্বায় তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট এবং ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। এসব গাছে জ্বালানী ছাড়া আর কিছুই হয় না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ডি. আই. জি. নিরুপম সোম ১৪ই মে ১৯৭৮ সালে সরজমিনে তদন্ত করে তিনি নিজেও তার অভিমত প্রকাশ করেছেন, ইহা জ্বালানী ছাড়া আর কিছু নয়।

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে প্রতিনিয়ত অনাহারে মরছে। তাদের অনুরোধ, আপনারা দয়া করে উক্ত অবরোধ অবিলম্বে মুক্ত করুন এবং সমগ্র ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করুন। আমাদের এই সংস্থা কোন রাজনৈতিক সংস্থা নয়। রাজনীতি আমরাা করিনা বা বুঝি না। আমরা যা কিছু করছি বাঁচার জন্য করছি। এ আমাদের বাঁচা মরার লড়াই। আমরা বাঁচতে চাই, আপনারা দয়া করে আমাদের বাঁচান। "জয়হিন্দ"

রাইহরণ বাড়ৈ (সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (ত)

পশ্চিমবঙ্গের ভাই ও বোনের কাছে মরিচঝাঁপির অসহায় বাঙালী উদ্বাস্তুদের করুণ আবেদন

আমরা মরিচঝাঁপির অবরুদ্ধ অসহায় উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে অবেদন জানাচ্ছি। বিগত ২৪/১/৭৯ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আছি। খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ করে আমাদের খাদ্য ও সব কিছুর যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের অভাবে আমাদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। পুলিশের লঞ্চ দিনরাত আমাদের চারিদিকে টহল দিয়ে ফিরছে। খাদ্যের অভাবের তাড়নায় মানুষ গাছের পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। ঐ অবরোধের ফলে ইতিমধ্যে অনাহারে ৮১জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। সরকারের বক্তব্য দণ্ডকারণ্যে ফিরে না গেলে আমাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারা হবে।

শুধু অবরোধ করেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি। ২৮/১/৭৯ তারিখে তৃষ্ণার জ্বালায় অতিষ্ট হয়ে আমাদের মেয়েদের বোঝাই কয়েকটি নৌকা নেতাজী নগর থেকে কুমিরমারীর পারে জল আনতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশের লঞ্চ ধাক্কা মেরে নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয় এবং তাদের উপর ৪ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস বর্ষণ করে। মেয়েদের ওপর ঐ পাশবিক অত্যাচার দেখে কুমিরমারীর স্থানীয় জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, পুলিশ তাদের উপর পাঁচ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস বর্ষণ করে। এই ঘটনায় তিনটি মেয়ে মৃতপ্রায়। ২৯/১/৭৯ তারিখে ওরা আমাদের মাছের ভেড়ির বাঁধা খাল কেটে দেয়। ফলে, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে পুলিশের তর্কের সূত্রপাত হয়। পরে বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত পুলিশের লঞ্চ থেকে অগণিত টিয়ার গ্যাস্ ছোঁড়া হয়। এদিন গুরুতর ভাবে আহত হন, সুনীল, মালতী পাল এবং অশ্বিনী সরকার সহ আরও কয়েকজন। ৩০/১/৭৯ তারিখে একটি লঞ্চ কিনারে এসে জানতে চায়, আমরা দণ্ডকারণ্যে যাব কিনা? উদ্বাস্তুরা সমস্বরে চিৎকার করে বলেন, "আমরা জান দেবো, তবু দণ্ডকারণ্যে যাব না।" তখন থেকে লঞ্চগুলি আগের চেয়ে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠে এবং রাত একটার সময় বিনা প্ররোচনায় শান্ত উদ্বাস্তুদের উপর আবার দশ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। অত্যাচার আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। ৩১/১/৭৯ তারিখ বুধবার পুলিশ প্রায় সকাল দশটা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দিকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ট হয়ে কয়েকটি নৌকা নিয়ে আমাদের কিছু ছেলে মেয়ে খাদ্য ও পানীয় জল আনবার জন্য ওপারে যাত্রা করে কিন্তু পুলিশ মাঝনদীতে লঞ্চের ধাক্কায় বেশ কয়েকটি নৌকা ভেঙ্গে ডুবিয়ে দেয় এবং সমানে তাদের উপর টিয়ার গ্যাস বর্ষণ করে চলে। তখন ছেলে মেয়েরা নিরুপায় হয়ে

সাঁতার কেটে কুমিরমারীর পারে গিয়ে উঠে। সেখানেও তাদের উপর একইভাবে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া চলতে থাকে। ওপারের স্থানীয় জনসাধারণ এই ব্যাপারে যথেষ্ট ভীড় করে এগিয়ে আসে এবং উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলে। প্রায় তিনটার সময় পুলিশ তাদের উপর লঞ্চ এবং স্থল থেকে সমানে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। শুধু গুলিই নয়, তার সঙ্গে বেপরোয়া ভাবে টিয়ার গ্যাসও তাদের উপর সমানে বর্ষণ করে চলে। নেতাজীনগরের পারে পুলিশ ২ রাউণ্ড গুলি চালায়। কুমিরমারীর পারে চালায় ৩০ রাউণ্ড। মোট ৩২ রাউণ্ডগুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে, মেয়ে, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে পৈশাচিক ভাবে নির্বিচারে লাঠিচার্জ চলতে থাকে।

ঐ সময় পুলিশ একজন স্থানীয় লোকের বাড়ী ঢুকে শিশুসন্তান সহ এক মহিলাকে গুলি করে মারে। তারপর টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। শিশুটির গায়ে গুলি না লাগায় সে বেঁচে যায়। মহিলার অপর সন্তান মায়ের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ তাকে ধরে পেটাতে পেটাতে লঞ্চে নিয়ে যায় এবং তাকে গুলি করে মারতে উদ্দ্যত হয়। কিন্তু অফিসারের নির্দেশে তাকে গুলি না করে লাথি মেরে লঞ্চ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। একই সময় একটি পাঁচবৎসরের শিশুকে গলায় পা দিয়ে দম বন্ধ করে মারা হয়। এই নির্মম ও পৈশাচিক গুলি কাণ্ডে উদ্বাস্তু ও স্থানীয় সহ নিহতের সংখ্যা মোট ৩০ জনের মত। উক্ত তিরিশটি মৃতদেহ ঘটনার দিন সন্দেশখালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছোরা দিয়ে প্রত্যেকটি মৃতদেহের পেট কেটে বেড়মজুরিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে আহত অর্ধমৃত কিছু লোক ছিল, তাদেরও বেয়নেট দিয়ে নির্মমভাবে খুঁচিয়ে মেরে ফেলা হয়। উক্ত মৃতদেহের একটি গাড়াল নদীতে পাওয়া গেছে। আর বেশ কয়েকটি মৃতদেহ কলাকাছিয়া নদী থেকে তোলা হয়েছে।

পরদিন ১/২/৭৯ তারিখে স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয় লোকের মৃত্যুতে এবং উদ্বাস্তুদের উপর সরকারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে মিছিল নিয়ে যান। পুলিশ তাদের ঐ মিছিলের উপরও ২ রাউণ্ড গুলি চালায়। তাতে স্থানীয় একজন আহত হন। সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ মহিলা সহ ৫০০ জনের উপর উদ্বাস্তুকে জেলে আটক করে।

এই শোকাবহ অত্যাচারের ঘটনা আমরা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে আবেদন জানাচ্ছি; আপনারা জানুন কেন আজ আমাদের এ অবস্থার ভিতর পড়তে হলো? দেশ বিভাগের জন্য আমরা দায়ী নই। কিন্তু কেন দেশবিভাগের ফলে মাতৃভূমি ত্যাগ করে আমরা সাজলাম অভিশপ্ত বাস্তুহারা? কেন আমাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হল? কেন আমরা দণ্ডকারণ্যে ত্যাগ করলাম? কেন শেষ আশ্রয় হিসাবে সুন্দরবন বেছে নিলাম? এর জন্য বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃবৃন্দ কতখানি দায়ী তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যথা ঃ—

(১) তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের আমলে যখন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বাম ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ তথা জ্যোতিবসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, রাধিকা ব্যানার্জি প্রমুখ দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের দাবি ছিল বাঙালী উদ্বাস্তুদের বাংলাতেই পুনর্বাসন দিতে হবে। তাঁরাও সুন্দরবনের দাবি করেছিলেন, উদ্বাস্তুদের জন্য।

(২) শ্রীপ্রফুল্ল সেনের আমলে জ্যোতি বসু এক সময় "দণ্ডকের কান্না বন্ধ কর", বলে শ্লোগান তুলেছিলেন। ঐ সময় তিনি আবার বলেছিলেন, "দণ্ডকারণ্যে বাঙালীদের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা নয়।" তিনি এ সম্পর্কে জোরদার আন্দোলনও করেছিলেন।

(৩) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ভিলাইয়ের জনসভায় যোগদানের জন্য জ্যোতি বসু পত্র মারফৎ উদ্বাস্তুদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। ঐ জনসভায় তিনি উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমরা ক্ষমতায় না-আসা পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা ক্ষমতায় এলে সুন্দরবনের দাবি অবশ্যই পূরণ করব।"

(৪) ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রদেশের শহীদভাটাতে উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের তদন্ত করতে এসেছিলেন প্রানকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী ও সমর মুখার্জী। তাঁরা ঐ গুলি বর্ষনের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। সমর মুখার্জী দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, যে "সুন্দরবনের দাবি নিয়ে আপনারা আজ গুলি খেলেন, আমরা ক্ষমতা পেলে আপনাদের সুন্দরবনের দাবি আমরা পুরণ করব।"

(৫) ১৯৭৫ সালে মে মাসে মানাতে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী সর্ব্বভারতীয় উদ্বাস্তু সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন শ্রীরাম চ্যাটার্জী, কৃপাসিন্দু সাহা এবং সারা ভারত ফরোওয়ার্ড ব্লকের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীজাম্বুবন্তরাও ধোতে। তাঁরাও সুন্দরবনের দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন।

(৬) ১৯৭৫ সালের জুন মাসে কলকাতায় সি. পি. এম. এর প্রাদেশিক অফিসে দণ্ডক উদ্বাস্তুদের নিয়ে জ্যোতিবাবুর সভাপতিত্বে অষ্টবামের নেতৃবৃন্দের এক সভা হয়। উক্ত সভায় এই সুন্দরবনের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল এ. এল. ডায়াসের কাছে এক স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং ঐ দাবির সমর্থনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলি আহমেদ সাহেবের কাছে এক গণডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(৭) বর্তমান ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় মন্ত্রী রাধিকাবাবুর কাছে ১২ জুলাই ১৯৭৭ সালে দণ্ডক উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে এক স্বারকলিপির মাধ্যমে এক Ultimetam দেওয়া হয়। তাতে বলা হয় যদি আপনারা দণ্ডক উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহলে তারা পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হবেন।

(৮) এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জী, বিধান

সভার সদস্য রবিশঙ্কর পাণ্ডে, কিরণময় নন্দ ২৮/১১/৭৭ তারিখে দণ্ডকারণ্যে সরেজমীন তদন্ত করতে যান। চার দিনের তদন্তে বিভিন্ন জনসভায় রামবাবু বলেন, "সরকার পুনর্বাসনের নামে আপনাদের নির্বাসন দিয়েছেন, তা আমরা তদন্ত করে দেখলাম। আমার সরাকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুকে আমি একথা জানাবই এবং এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে।"

(৯) রামবাবুদের তদন্তের পর দণ্ডক উদ্বাস্তুদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৭ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর কাছে এক ডেপুটেশনে যান। তার কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে এক Ultimetam এ জানানো হয়, অতি সত্বর যদি দণ্ডক উদ্বাস্তুদের কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তারা অতি সত্বরই পশ্চিমবাংলায় চলে আসবেন। তিনি তখন বলেছিলেন, "পশ্চিমবঙ্গে ফুটপাতে বহুলোক বাস করে, আপনারা তাদের মত বসবাস করবেন। আমার সরকার কংগ্রেস সরকারের মত আপনাদের লাঠিপেটা করবে না বা গুলি করবে না"।

(১০) জ্যোতিবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী পুনরায় রামবাবু ও বামফ্রন্ট কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষ ১৬/১/৭৮ তারিখ থেকে ১৯/১/৭৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের অবস্থা তদন্ত করতে যান, বিভিন্ন জনসভায় অশোকবাবু বলেন, "আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গে যান, তাহলে পশ্চিমবাংলার ৫ কোটি মানুষের দশকোটি হাত আপনাদের সমর্থনে গর্জে উঠবে"। রামবাবু বলেন, "দিন আপনাদের আসবেই, আপনারা একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি অতীতেও আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো।"

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, যে আমাদের সংস্থা কোন রাজনৈতিক সংস্থা নয়। রাজনীতি আমরা করি না বা বুঝি না। আমরা যা করছি বাঁচার জন্য করছি। সুন্দরবনের যে, আমরা এসেছি এর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী। আপনারা আমাদের এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে নিজেরাই বিচার করুন এর জন্য কে দায়ী? এই সঙ্গে আমাদের সকরুণ আবেদন, খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ সহ ১৪৪ ধারা সরকারকে উঠিয়ে নিতে বলুন। আমাদের মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচান এবং এই আবেদন করছি যে, আমাদের ওপর এই নারকীয় অত্যাচারের বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করে, প্রকৃত অপরাধীকে জানুন এবং এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে এগিয়ে আসুন।

"জয় হিন্দ"

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (থ)

শ্রদ্ধেয়,
শ্রীকাশিকান্ত মৈত্র
বিরোধী দলনেতা,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভা

মহাত্মন,

আপনারা গত ১১/২/৭৯ তারিখ রবিবার মরিচঝাঁপির পরিদর্শনের পর হতে পুলিশের তৎপরতা আগের থেকে বেড়ে গেছে। পৈশাচিক অত্যাচার ক্রমাগত তীব্ররূপ ধারণ করেছে। মরিচঝাঁপির অন্তগত কাক্‌সা, ভাইজোরা চিলমারী, বিজয় ভারানী, ছোটমতি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ১ বৎসর বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতন চালাচ্ছে। প্রায় ৩০০০ পরিবারকে, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে উৎখাত করেছে। উক্ত পরিবারের প্রায় আড়াই হাজার লোককে পুলিশ স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুকে পাশবিক অত্যাচার করেছে এবং মারধর করেছে। বেশীরভাগ লোককে পুলিশ বাগনায় নিয়ে ২/১ দিন অনাহারে রেখে জোর করে হাসনাবাদে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বর্ণিত এলাকা থেকে ২/৩ টা টিউবওয়েলের মাথা খুলে নিয়ে গেছে। আর খাদ্য সামগ্রী, মালপত্র ও টাকা পয়সা ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বর্ত্তমানে হাইকোর্টের রুলিংএর কথা অনবরত তাদের মাইক দ্বারা প্রচার করে চলছে। আর এও বলছেন, "বনদপ্তরের ২৩/গ ধারা অনুযায়ী আপনারা মরিচঝাঁপিতে বসবাস ও প্রবেশ করতে পারেন না। সরকার যে কোন উপায়ে ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে মরিচঝাঁপি থেকে আপনাদের উঠিয়ে দেবেন। সরকার আপনাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর জন্য বদ্ধ পরিকর। আপনাদের এখানে কোন্ কোন রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী লোক আপনাদের উস্কানী দিচ্ছে ও ভুল বুঝাচ্ছে। তারা আপনাদের বন্ধু নন। এই সি.পি. এম সরকারই আপনাদের প্রকৃত বন্ধু"।

ইং ১১/২/৭৯ তারিখ থেকে বেলা ৪-৩০ ঘটিকায় রাজ্য সরকারের পুলিশ কর্ত্তৃক চাউল এবং আটা বোঝাই আমাদের ২টা নৌকা আটক করেছে। নিম্নবর্ণিত উদ্বাস্তুদের চাউল এবং আটার পরিমাণ সহ তাদের নাম নীচে প্রদত্ত হইল। যেমনঃ—

১ম নৌকার বিবরণ	পরিমাণ	
নাম	আটা	চাউল
১। কেশব সরকার	৫৫ কেজি	৩৫৪ কেজি
২। নিমাই মণ্ডল	—	৫০৫ „
৩। হরিপদ শীল	—	১৮৫ „
৪। কালিপদ যোদ্দার	৭৫ „	৩০০ „

৫। রনজিৎ মাঝি	৭৫ „	১০০ „
৬। পরিতোষ বৈদ্য	১৫০ „	১০০ „
৭। শ্রীনাথ মণ্ডল	৩০ „	১০০ „

দ্বিতীয় নৌকাটি মোল্লাখালী থেকে আসাকালিন পুলিশের লঞ্চ ইচ্ছাকৃতভাবে নৌকাটিকে ধাক্কা মারে এবং আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় নৌকার ৩ জন লোক নৌকা হতে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সাঁতার কেটে কুমীরমারি পারে ওঠে। পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে। পরে নৌকাটিকে ৫০ কুইন্টাল চাউল ও আটা সহ লঞ্চের পিছনে বেধে বাগনা পুলিশ অফিসে নিয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তিরা এখনও মরিচঝাঁপিতে ফিরে আসেননি।

আমাদের মরিচঝাঁপি থেকে বিভিন্ন জায়গায় কাজের তল্লাশে যাওয়ার পথে, যথাঃ কালিনগর, নেজাট, ভবানীপুর, হাসনাবাদ, কুমিরমারী, মোল্লাখালী প্রভৃতি জায়গায় আটক করে এবং তাদের ওপর নানারকম অত্যাচার করছে। ১৩/২/৭৯ তারিখ থেকে পুলিশ এই ঘটনা শুরু করেছে এবং আজ পর্যন্ত ৫০০ জনের ওপরে উদ্বাস্তুকে জেলে আটক করেছে।

পুলিশ পূর্ব্বের চেয়ে আরও ১৪/২/৭৯ তারিখ থেকে ভীষণভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্লান্টেশনের ৪ কোনায় ৪টি পুলিশকে ক্যাম্প করবার জন্য পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্বাস্তুরা পুলিশ ক্যাম্প করবার পক্ষ্যপাতী নয়। তাই পুলিশের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বাক্‌বিতণ্ডা চলছে। পুলিশের আক্রমণাত্মক মনোভাব দুর করবার জন্য আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি। আমরা আশঙ্কা বোধ করছি, যে কোন মূহুর্তে আমরা পুলিশবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারি। আপনারা দয়া করে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন।

রাইহরণ বাড়ৈ
(সাধারণ সম্পাদক)
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্ব্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগণা (পঃবঙ্গ)

তাং ঃ- ১৬/২/৭৯

পরিশিষ্ট—৩ (দ)

মরিচঝাঁপি ঃ এম. পি.-দের রিপোর্ট
অনাহারে অখাদ্য খেয়ে মৃত ৭২, গুলিতে ১০

নয়াদিল্লি ২৪ এপ্রিল — জনতার তিন সংসদ সদস্যের যে দলটি গত ২২ মার্চ মরিচঝাঁপি ঘুরে গেলেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, মরিচঝাঁপি থেকে শরণার্থীদের সরানোর প্রয়োজনে রাজ্য সরকার কঠোর ও দমনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, উত্তেজনা ও গুলিচালনার যে ঘটনার কথা সংসদ সদস্যের কাছে বর্ণনা করা হয়, তা শরণার্থীদের সরানোর ব্যাপারে পুলিশের বাড়াবাড়ি ও শিবির ত্যাগীদের প্রতিরোধের ফলেই ঘটেছে।

জনতা সংসদীয় দলের সম্পাদক ডঃ মূরলীমনোহর যোশি আজ মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত সংসদ সদস্যদের রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন — সংসদ সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শরণার্থীদের প্রতি অমানবিক আচরণের জন্য দোষারোপ করেছেন। ডঃ যোশি বলেন, এম. পি.-রা জানিয়েছেন এ বছর ২৪ জানুয়ারির পর মরিচঝাঁপির নেতাজীনগর এলাকায় ৪৩ জন অনাহারে মারা গিয়েছেন। মানুষ খেতে পারে না বাধ্য হয়ে এমন কিছু খাবার খেয়ে মারা গিয়েছেন ২৯ জন। এম. পি. দলের মতে এ বছর ৩১ জানুয়ারি পুলিশের গুলি চালনার ফলে মরিচঝাঁপিতে ১০ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

ডঃ যোশি বলেন এম. পি. দল জানিয়েছেন, মরিচঝাঁপি সফরের সময় তাঁদের সামনে দুটি শিশুর মৃতদেহ আনা হয়েছিল। তিনি বলেন — অনাহারে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং জোর করে খাদ্যশস্য কেড়ে নেওয়ার ফলে মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের যে ঘাস খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছিল। তিন সংসদ সদস্যের দলটি সেই ঘাসের কিছু নমুনা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। মরিচঝাঁপিতে পুলিশ যে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছিল, সেই কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহৃত ১৪টি খোলও সংসদ সদস্যের দলটি প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছেন। মরিচঝাঁপি সফরের সময় তাঁরা যে সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার টেপ রেকর্ডটিও মোরারজী দেশাইকে দেওয়া হয়েছে।

ডঃ যোশি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযোগ করেন যে, মরিচঝাঁপিতে একটি পাল্টা সরকার চালানো হচ্ছে এবং সেখানে শরণার্থীরা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করছেন। কিন্তু সংসদ সদস্যদের দলটি দেখেছেন এই অভিযোগ অসত্য। ডঃ যোশি আরও বলেন সংসদ সদস্যরা তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, মরিচঝাঁপিতে প্রবেশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পারমিট প্রথা চালু করেছেন। ফলে কোন নিরপেক্ষ দল, এমনকি এম. পি. , এম. এল. এ, এবং সাংবাদিকরা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে নিজেরা স্বচক্ষে কিছু

দেখে আসবেন তাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসদ সদস্য শক্তি কুমার সরকার এক রিপোর্টে বলেছেন। সংসদ সদস্য দলের মরিচঝাঁপি সফরের জন্য যে ভদ্রলোকের লঞ্চ ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, পুলিশ তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। শক্তিকুমার সরকারের নির্বাচন কেন্দ্রে মরিচঝাঁপি অবস্থিত।

মরিচঝাঁপির চার শরণার্থী মহিলা লিখিত বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন। পুলিশ তাদের ওপর বলাৎকার করেছে। সংসদ সদস্যদের রিপোর্টে ওই চার মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সংসদ সদস্যরা জেনেছেন শরণার্থীদের কাছ থেকে ৫৯টি নৌকা কেড়ে নিয়ে সেগুলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডঃ যোশি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশাই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই রিপোর্টের একটি কপি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সংসদ সদস্যরা তাঁদের রিপোর্টে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। এই বিষয়টির সমাধানে মানবিকতার পরিচয় দেওয়া দরকার। মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের আবার দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাওয়ার সময়সীমা বাড়ানো উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন এলাকায় শরণার্থীদের চলে আসার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল এর সমর্থনে সংসদ সদস্যদল তাঁদের রিপোর্টের দুটি নথিপত্রও যোগ করে দিয়েছেন। এই নথিপত্রগুলি হল ঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গে অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জীর সফরসূচীর একটি প্রতিলিপি এবং (২) ১৯৭৫-এর ১৮ মে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি সারা ভারত উদ্বাস্তু সম্মেলনে যে দাবি দাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশচ·· মণ্ডলের কাছে ২১-১১-১৯৭৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দাবি দাওয়াগুলি অনুমোদন করেন তার কপি।

সুতরাং দেখে শুনে মনে হয় দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে এনে সুন্দরবন এলাকায় বসবাসের জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল। যখন প্রায় দেড় লাখ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করলেন। তখন কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সেটাই বেশ অবাক করার মত বিষয়। সংসদ সদস্যরা তাঁদের রিপোর্টে একথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতে দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু উদ্বাস্তু যারা প্রায় সবাই হরিজন, মরিচঝাঁপিতে বসতি নির্মাণ করেন। তারা সেখানে খড়, পাতার কুড়েঘর, বাজার, চায়ের দোকান, ছুতোরের দোকান, মৎস্য চাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তুলে নিজেরাই নিজেদের কর্মের সংস্থান করেন। তারা কিছু গাছ কেটে কাঠ বিক্রি করেন। কর্তৃপক্ষের অগোচরে এবং তাঁদের উদাসীন মনোভাবের বলে এত কিছু ঘটনা ঘটেছে এটা আশা করা যায় না।

সংসদ সদস্যদের মরিচঝাঁপি সফরের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেসব বাধাসৃষ্টি

করেছিলেন সংসদ সদস্যরা তার উল্লেখ করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, যে লঞ্চে সংসদ সদস্যরা মরিচঝাঁপি যাচ্ছিলেন, পুলিশ নানা অজুহাতে তিনবার সেই লঞ্চটিকে আটকায়। প্রথমে পুলিশ পারমিট দেখতে চায়, দ্বিতীয়বার তারা এসে জানায় সংসদ সদস্য দলের সঙ্গে যে সব লোক যাচ্ছেন তারা আর যেতে পারবেন না। তৃতীয়বার পুলিশ বলে, যে প্রাইভেট লঞ্চে সংসদ সদস্যরা যাচ্ছেন সেই লঞ্চটিকে আর পারমিট দেওয়া যাবে না।

সংসদ সদস্যদলের মতে, এটার একেবারেই কোন দরকার ছিল না। আরও ভালোভাবে এটা করা যেত। লঞ্চটিকে আটকানোর জন্য যে বিলম্ব হয়েছিল তাও এড়ানো যেত। রাজ্য সরকারের তরফে এটা একটা অযৌক্তিক কাজ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সদস্যদের মরিচঝাঁপি পৌঁছতে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট দেরি হয়ে যায়।

সংসদ সদস্যদল জানিয়েছেন, তাঁরা টেলিফোনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের সাথে যোগাযোগ করে লঞ্চ আটকানোর জন্য যে অসুবিধা ও বিলম্ব হয়েছে সে কথা তাঁকে জানান। ২৩ মার্চ তাঁরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁরা দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

সংসদ সদস্যদল তাঁদের কাজ সেরে ২৩ মার্চ কলকাতা থেকে দিল্লি রওনা হন। প্রধানমন্ত্রী মনোনীত সদস্য হিসাবে দলে ছিলেন মঙ্গলদেও বিশারদ, ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে ও প্রসন্নভাই মেটা।

যে সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদ সদস্যদের মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সেখানে শক্তিকুমার সরকার এম পি-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, ২৪ পরগণা জেলা কর্তৃপক্ষ তাঁকে বলেছেন, হাসনাবাদ থেকে মরিচঝাঁপি যাওয়ার পথে অন্তত ১২০০ শরণার্থী মারা গিয়েছেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ এপ্রিল ১৯৭৯)

পরিশিষ্ট—৪

দুটি চিঠি ঃ তারকুণ্ডে বনাম নিরঞ্জন হালদার

[মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের জন্য সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসির সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভি. এম. তারকুণ্ডে এক প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু ঐ খবর পেয়ে মরিচঝাঁপিতে আসার কর্মসূচী বাতিলের অনুরোধ জানিয়ে শ্রী ভি. এম. তারকুণ্ডেকে চিঠি দেন। শ্রী তারকুণ্ডে ঐ চিঠিটা পেয়ে নিরঞ্জন হালদারের নিকট থেকে জ্যোতিবসুর চিঠির কী জবাব দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে জানতে চান। এই নিয়ে দুজনের চিঠি। নিরঞ্জন হালদার নিজেই তাঁর চিঠিটার বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন। জঃ মণ্ডল।]

শ্রীতারকুণ্ডের চিঠি

Citizens For Democracy

President	Jayaprakash Narayan	General Sectary's Office
Vice-President	M. C. Chagla	B-17, Maharani Bagh,
	V.V. john	New Delhi-110065
General Secretary	V.M.Tarkunde	Phone 635048
Executive Sectary	Vinod Jain	
Jt. Executive Secretary	N.D. Pancholi	Date : 29.4. 1979
Treasurer	Radhakrishna	

My dear Niranjan Haldar

I have received your letter dated 24 th instant. In the meantime, I received a letter from Jyoti Basu requesting me to cancel the proposed visit of the C.F.D. to Marichjhapi. I discussed the contents of the letter with Arun shourie and a few others. We felt that we did not have adequate information on the basis of which we can come to the conclusion that the refugees were entitled to leave Dandakaranya and shift themselves to the

reserve forest area of Marichjhapi. Unless we come to that conclusion, it would not be right to create an impression among the Marichjhapi refugees that we support their continued stay in Marichjhapi. Our purpose of taking a delegation to Marichjhapi was to ensure as par as possible that the refugees there are treated as human beings and not subjected to enforced starvation. But if as a result of our visit the refugees are likely to be strengthened in their determination to continue their illegal stay in the reserve forest area, as suggested by Jyoti Basu, the advisability of undertaking such a visit, requires to be reconsidered. That is why I am today writing to Shri Jyoti Basu that pending further considereation, the proposed visit of the delegation to Marichjhapi is postponed. I am enclosing herewith a copy of Jyoti Basue's letter to me and a copy of my reply.

In fact, my decision to go with a delegation to Marichjhapi was the result of the news brought by Moni Das Gupta that you were arrested while trying to go to Marichjhapi. The news was later found to be incorrect.

I would like you to consider the contents of Shri Jyoti Basu's letter and what I have said above, and let me know whether we should persist in the proposed visit. In all such cases, my policy is not to act in an irresponsible manner. It appears to me that we cannot encourage the refugees to continue their stay in Marichjhapi un-less we are satisfied that they are justified in leaving Dandakarnaya and make an illegal entry in the reserve forest area.

Kindly send your views to me as early as possible. I will be in Delhi till the 11th of May and will thereafter be in Bombay at the address : C/o Mrs. Shikhare, A-I, Sneh Kunj, Linking Road Extension, Santa Cruz, Bombay-400 054. (Tele No. 543569).

With warm regards,

Yours Sincerely,

(V. M. Tarkunde)

Encl. As above
Mr. Niranjan Haldar
79 R.K. Ghoshal Road
Calcutta-700 042

নিরঞ্জন হালদারের জবাব

৭৯, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড

কলকাতা-৭০০০৪২

৬ মে, ১৯৭৯

প্রিয় মিঃ তারকুণ্ডে,

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর চিঠির কপি সহ আপনার ২৯.৪.৭৯ তারিখের চিঠি গতকাল পেলাম। আপনার চিঠিতে মরিচঝাঁপিতে সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসির ডেলিগেশান পাঠানোর কর্মসূচী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জেনে খুবই দুঃখিত হলাম। আমি একইসঙ্গে প্রস্তাবিত প্রতিনিধি দলের সদস্যা মিসেস লায়লা ফার্ণান্ডেজ ও নয়নতারা সায়গলের চিঠি পেলাম। লায়লা লিখেছেন, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। শ্রীমতী অমিয়া রাও তাঁকে জানিয়েছেন যে, লায়লার বদলে তিনি প্রতিনিধি দলের একজন হয়ে মরিচঝাঁপিতে আসতে ইচ্ছুক। আমি নয়নতারা সায়গলকে লিখেছিলাম, প্রস্তাবিত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মরিচঝাঁপি আসতে। তিনি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন যে, প্রতিনিধি দলের মরিচঝাঁপি আসা স্থগিত থাকায়, তিনি আসতে পারবেন না জেনে খুবই দুঃখিত। যদিও আপনি জানিয়েছেন যে, অরুণ শৌরী এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপনি জ্যোতি বসুকে তাঁর চিঠির জবাব দেওয়ার আগে আমার বক্তব্য জানতে চান। আমি প্রথমেই জ্যোতি বসুর চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে আমার মতামত জানাচ্ছি।

(১) জ্যোতি বসু আপনাকে লিখেছেন যে, দণ্ডকত্যাগী উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন-এলাকা মরিচঝাঁপিতে গিয়ে বন নষ্ট করছে। সুন্দরলাল বহুগুণার চিপকো আন্দোলনের পর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইও বনরক্ষার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং সি-পি-এমের এম. পি. জ্যোতির্ময় বসু মোরারজী দেশাইকে একই কথা বলেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুদের তাড়াতাড়ি দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ না আনলে ওরা সুন্দরবনের বন ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু তথ্য হচ্ছে, মরিচঝাঁপিতে বহুবছর কোনো বন নেই। সেজন্য বন দপ্তর মরিচঝাঁপি দ্বীপের বেশ কিছু এলাকায় নারকেল গাছ পুঁতেছেন।

সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন এলাকা নির্দিষ্ট হয় ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৩ সালের পর সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন এলাকার গাছপালা প্রতিদিনই কাটা হচ্ছে। ১৯৪৩ সালের সংরক্ষিত বন এলাকার বহুদ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে। মরিচঝাঁপিতে

এখন যা ছিল, তা হচ্ছে ঝোপঝাড়, ছয়ফিটের বেশী লম্বা হয় না এমন গাছ। তাতে একমাত্র জ্বালানি হতে পারে। একথা ঠিক যে, মরিচঝাঁপি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকার মধ্যে। কিন্তু বড় গাছপালা নেই, খাদ্য নেই এমন দ্বীপে বাঘেরা থাকে না। সুন্দরবন বনসম্পদের সম্ভাবনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে ডেপুটি কনসারভেটর লিখেছেন, এই সব অঞ্চলে জমির জন্য গাছ বেড়ে ওঠে খুব ধীরে, নানাধরণের কীট ও রোগের আক্রমণের জন্য এখানে ভাল কাঠ হতে পারে এমন গাছের বৃদ্ধি অসম্ভব। (The growth of trees in these Zones is quite slow due to the site factor and the attack of insects and fungus to ageing trees rules out the possibility of quality timber). আমাদের সিটিজেস ফর ডেমোক্রাসির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রেসিডেন্ট শ্রীশৈবাল গুপ্ত (দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের প্রাক্তন চেয়ারম্যান) সম্প্রতি মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করে বাংলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বন নেই বলেই মরিচঝাঁপিতে গত এক বছর যাবৎ প্রায় এক হাজার পরিবার বসবাস করছে। জনতা দলের তিন জন এম. পি. গত ২২ মার্চ মরিচঝাঁপি গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে বসবাসের ঘর ছাড়া স্কুল, বাজার, হাসপাতাল, রাস্তা, টিউবয়েল ছাড়া বিড়ির কারখানা, পাউরুটি তৈরির কারখানা, কাঠ তৈরি ও তাতশিল্প দেখে এসেছেন। উদ্বাস্তুরা নদীর তীর দিয়ে ১৫০ মাইল দীর্ঘ বাঁধ দিয়েছে। সেখানে বছরে ২০ কোটি টাকার মৎস উৎপাদন হতে পারে। এসবের জন্য সরকারের কোনো টাকা খরচ হয়নি। মরিচঝাঁপির এই চিত্রটি সংরক্ষিত বন এলাকার চিত্র নয়। এই ব্যাপারে শ্রীজ্যোতি বসু যা বলেছেন, তা ডাহা মিথ্যা (outright falsehood) ।

(২) জ্যোতি বসু আপনাকে জানিয়েছেন যে, উদ্বাস্তুরা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন করেছেন। এটাও ডাহা মিথ্যা। সুন্দরবনের এই এলাকার নদীগুলিতে ডাকাত ও বাংলা দেশের সঙ্গে চোরাই চালানকারীদের রাজত্ব। তাই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু-উপনিবেশে ঢুকতে গেলে সমিতির 'পাস' দরকার হয়। পুলিশ যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে মেয়েদের ধর্ষণ করে। তাছাড়া পুলিশ জোর করে ধরে নিয়ে তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে চায়। সেজন্য তারা পুলিশকেও কলোনীতে ঢুকতে দেয় না। এটাকে কি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার বলা চলে? বাংলাদেশ সীমান্ত মরিচঝাঁপি থেকে ২৫ মাইল পূর্বে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি. আই. জি. নিরূপম সোম গত ১৪মে, ১৯৭৮ তারিখে মরিচঝাঁপিতে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। তিনি উদ্বাস্তুদের আপত্তিজনক কোনো কাজ করতে দেখেননি। জ্যোতি বসুর অভিযোগ অসত্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

(৩) শ্রীজ্যোতি বসু লিখেছেন, উদ্বাস্তুরা সরকারী সংরক্ষিত বন এলাকার জমি

জবরদস্তির সাহায্যে দখল করেছে। কোনো সরকার এটা সহ্য করতে পারে না। মরিচঝাঁপি যে সংরক্ষিত বন-এলাকা নয়, তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুরা নিজেদের পুনর্বসতি করেছে অপরের জমি দখল করে,—তা সরকারী জমি হোক বা বে-সরকারী জমি হোক। সি. পি. এমের উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ-সি-আর-সি এই জবরদখল কলোনীর উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউ-সি-আর-সি এই জবরদখল কলোনিগুলির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট টাকা চাইছে। কাজেই অপরের জমি বে-আইনী ভাবে দখল করার ব্যাপারে সি-পি-এম কখনও আপত্তি করেনি। তবে একমাত্র পার্থক্য, জবরদখল কলোনীর উদ্বাস্তুরা বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের এবং মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা তফসিলী সম্প্রদায়ের লোক। জ্যোতি বসুর এই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

(৪) জ্যোতি বসুর আশঙ্কা মরিচঝাঁপিতে এই উদ্বাস্তুদের বসবাস করতে দিলে দণ্ডকারণ্য থেকে সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে। যে সব উদ্বাস্তু আশ্রয় ও রোজগারের ব্যবস্থা করতে পেয়েছে, তাঁরা কেন পরিচিত জায়গা ছেড়ে অন্যত্র যাবে? মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর ও গাড়চিরোলী জেলা থেকে একমাত্র গাড়চিরোলীর অচাষযোগ্য পাওয়া জমির মালিকেরা মরিচঝাঁপিতে এসেছে। ঐ দুই জেলার প্রাথমিক শিক্ষকেরা, খনি বা অন্যত্র কর্মরত, দোকানদার, গ্রাম থেকে আসা চন্দ্রপুর শহরের রিক্‌শা চালকদের কেউই মরিচঝাঁপিতে আসেনি। ১৯৭৫ সালের ২৭ জুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর পড়লেই বুঝতে পারবেন, দণ্ডকারণ্য থেকে কেন উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে। "কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী জি. ভেঙ্কটস্বামী ২৬ জুন কলকাতায় বলেনঃ

"মানা শিবিরে প্রায় ১৩ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার পাকাপাকিভাবে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে। এদের মধ্যে ১০ হাজার পরিবারের ওড়িশায় মালকানগিরি মহকুমায় স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নেন। দুই হাজার পরিবারকে ওড়িশায় পাঠানোর পর ওড়িশার স্থানীয় উপজাতিদের আপত্তিতে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী উদ্বাস্তু পাঠানো বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন। ফলে বাকি আট হাজার উদ্বাস্তু পরিবার আটকে পড়েন। মানা শিবিরে প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবার মাসে (৩ জন বয়স্ক ও ২ জন শিশু) ১১৫ টাকা করে নগদ ডোল পেয়ে থাকেন।" ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত মানা ক্যাম্পে থেকে যারা পুনর্বাসনের সুযোগ পায়নি, তারা কি অন্যত্র নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের চেষ্টা করতে পারবে না?

(৫) শ্রী জ্যোতি বসু আপনাকে লিখেছেন, তাঁরা সব সময়ে উদ্বাস্তুদের স্বার্থ দেখেন, এদেরও স্বার্থ দেখবেন। উদ্বাস্তুরা সংরক্ষিত বন এলাকার বন ধ্বংস করেছে বলেই, তাদের ওখান থেকে তিনি সরাতে চান। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন উদ্বাস্তুদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসনের জন্য পাঠান এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাতে থাকেন, তখন সি-পি-আইয়ের

উদ্বাস্তু সংগঠনের প্রচারপত্রে ছিল ঃ "উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ব্যর্থ এই সরকার উদ্বাস্তুদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ভীত ও সন্ত্রস্ত, তাহাদের বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের উপর এই আক্রমণ সানিয়াছেন।" এ থেকে প্রমাণ হয়, দলীয় শক্তি বাড়ানোর জন্যই তদানীন্তন কম্যুনিষ্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করেছে। ১৯৭৪ সালের ভিলাইতে এক জনসভায় জ্যোতি বসু উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "আমরা ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। আমরা ক্ষমতায় এলে সুন্দরবনের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি অবশ্যই পূরণ করব।" কিন্তু উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি সি-পি-এমের উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ-সি-আর-সির শাখা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে অস্বীকার করায় মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকার বর্বরোচিত ব্যবহার করছে।

আপনার চিঠির জবাব ঃ

(১) প্রতিনিধিদলের মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের কর্মসূচী বাতিলের জন্য জ্যোতি বসুর অনুরোধ, অরুণ শৌরী ও অন্যান্যের পরামর্শ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হয়েছে। অরুণ শৌরীর সঙ্গে আপনিও একমত যে, আপনার হাতে এমন তথ্য নেই, যা থেকে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করে মরিচঝাঁপির সংরক্ষিত বনে চলে যাওয়া ঠিক হয়েছে। আপনার চিঠি পড়ে সেই উদাহরণের কথা মনে পড়ে গেল—আপনি ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, তবে জল খাওয়াতে পারেন না। অরুণ ইচ্ছে করলেই ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে বোম্বের ইকনমিক উইকলিতে তিন সংখ্যায় প্রকাশিত দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও আমাদের CFD এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি শৈবাল গুপ্তের লেখা এবং লোকসভার এস্টিমেট কমিটীর সাম্প্রতিক রিপোর্ট পড়লেই জানতে পারতেন যে, দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনো সুযোগ নেই। জনতা পার্টির পার্লামেন্টের তিন সদস্যকে মরিচঝাঁপিতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের রিপোর্টের সাংরাশ ২৫ এপ্রিল সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। আপনি ও অরুণ শৌরী চিঠি লিখলেই জনতা পার্টির অফিস থেকে ঐ রিপোর্টের কপি পেতে পারতেন। আপনি আমাকে চিঠি লিখেছেন ২৯ এপ্রিল।

(২) অরুণ সমস্ত ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস প্রায় একবছর কোনো খবর ছাপেনি। ২৫ শে জানুয়ারি থেকে মরিচঝাঁপি দ্বীপ ঘিরে বে-আইনী ব্লকেড, ৩১ জানুয়ারি বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম গুলি চালনা, ব্লকেড করে দ্বীপের অধিবাসীদের পানীয় জল, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত করে শিশু থেকে নানা বয়সী ৩৭৫ জনকে মেরে ফেলা, খাদ্য সমেত ১০০টি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা,

মেয়েদের প্রতি পুলিশের ধর্ষণ, বহু মানুষকে গ্রেপ্তার—কোনো খবরই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ছাপেনি, বরং ঐ সব খবর পাঠানোর জন্য অরুণ কলকাতার প্রতিনিধিকে বকেছে। অরুণের মতে, এখন জ্যোতি বসুই আমাদের একমাত্র আশা, তাঁর ইমেজ নষ্ট হয়, এমন খবর যেন কলকাতা থেকে না পাঠানো হয়।

(৩) সি-এফ-ডি-কে তদন্ত দল পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল মরিচঝাঁপি দ্বীপের উদ্বাস্তুদের উপর বামফ্রন্ট সরকারের নির্যাতন, বে-আইনী ব্লকেড করায় খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে অনাহারে ও কুখাদ্য খেয়ে এবং পুলিশের গুলিতে ৩৪৫ জনের মৃত্যু, ৩১ জানুয়ারি কুমিরমারীতে গুলি চালিয়ে এক আদিবাসী রমনী ও শিশু সমেত অনেককে হত্যা, উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার ও পাশের গ্রামেও পুলিশী সন্ত্রাসের তদন্তের জন্য, সরকার কর্তৃক এই সব বর্বর কাণ্ডের তদন্তই নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংগঠনের কাজ। কোথা থেকে গিয়েছে, কেন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে এসব প্রশ্ন তদন্তের পরে উঠতে পারে। আপনি মানব অধিকারের ব্যাপারে আদৌ গুরুত্ব দেননি।

মরিচঝাঁপিতে বন নেই। আমি জ্যোতি বসুর চিঠির জবাবে প্রথম প্যারায় তা উল্লেখ করেছি।

জ্যোতি বসুর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে আপনি বলেছেন, উদ্বাস্তুরা বে-আইনীভাবে সংরক্ষিত বন এলাকা দখল করে আছে। জ্যোতি বসুর চিঠির জবাবের তৃতীয় প্যারায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আপনি বার বার মরিচঝাঁপিতে বে-আইনী ভাবে থাকার কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এ কথা বলার পিছনে আপনার রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক ও মানব অধিকার পদদলিত করা আপনার বিচার্য বিষয় হয়নি জেনে আমি মর্মাহত।

(৪) মরিচঝাঁপিতে না গিয়ে আপনি কী ভাবে মনে করলেন যে, ওখানে উদ্বাস্তুদের যাওয়া উচিত হয়নি? এবং আপনার প্রতিনিধিদল ওখানে গেলে তাদের ওখানে থাকার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হবে, আপনার এই মনোভাবের সঙ্গে নাগরিক অধিকার রক্ষার মহান সংগ্রামীর মনোভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

(৫) জ্যোতি বসুর সরকার বিরোধী দলের নেতা ও এম. এল. এ এবং সাংবাদিকদের মরিচঝাঁপি থেকে ফেরার পথে গ্রেপ্তার করেছেন। ২২ মার্চ জনতা পার্টির তিন এম. পি. কে মরিচঝাঁপির যেতে পুলিশ বার বার বাধা দিয়েছে। আপনার প্রতিনিধি দল মরিচঝাঁপি যেতে চাইলেও যেতে পারত না। জ্যোতিবসুর পুলিশ বাধা না দিলেও দ্বীপে যাওয়ার লঞ্চ মিলত না। তাই জ্যোতি বসু আপনাকে এই অনুরোধ করেছেন। জ্যোতি বসু চাপ দিয়ে বা অন্যভাবে এক স্টেটসম্যান ছাড়া কলকাতার সব কাগজে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের খবর ছাপানো বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।

দিল্লির প্রতিনিধিরা মরিচঝাঁপি যেতে পারলে বা না যেতে পারলে সারা ভারতের খবর হত, সেজন্য জ্যোতিবসুর এই অপচেষ্টা।

(৬) মরিচঝাঁপিতে যেতে গিয়ে আমি গ্রেপ্তার হয়েছি, এই খবর শুনে আপনি প্রতিনিধি দল নিয়ে মরিচঝাঁপিতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জেনে আমি আনন্দিত হতে পারছি না। কারণ ২৪৫ জনের মৃত্যু, সর্বব্যাপী নৃশংসতা আপনার নিকট তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমার বদলে শেষ মুহূর্তে 'রবিবার' সাপ্তাহিকের রাজকিশোর মরিচঝাঁপি গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাই আমার গ্রেপ্তার নিয়ে এই বিভ্রান্তি। মণি দাশগুপ্ত রাজ্য সরকারের একজন কর্মী। তিনি পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাশিস্ত শাসনের কথা বলে নিজের চাকরিটা খোয়াতে চাননি। তাই আপনাকে সব কথা জানাতে পারেন নি।

(৭) জ্যোতি বসু যখন আপনার প্রতিনিধি দলের মরিচঝাঁপিতে আসা বন্ধ করতে পেরেছেন, তখন পরে আপনার আসার সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ সরকার মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করতে বদ্ধপরিকর। মরিচঝাঁপির পাশের দ্বীপ কুমিরমারী বামফ্রন্টের অন্য দল আর-এস-পি'র শক্ত ঘাঁটি। তাঁরা সরকারের মরিচঝাঁপি নীতির বিরুদ্ধে, উদ্বাস্তুদের পাশে। জ্যোতি বসু আর-এস-পি দলের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফরোয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী কমল গুহকে পাঠিয়েছিলেন কুমিরমারীর আর-এস-পিকে সরকারী নীতির সমর্থনে আনতে। তাঁরা ব্যর্থ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু আর-এস-পি'র রাজ্য সম্পাদক মাখন পালের মাধ্যমে কুমিরমারীর দুই আর-এস-পি নেতাকে মহাকরণে ডাকিয়ে এনে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, "উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপিতে থাকতে দেওয়া হবে না। আপনারা বাঁধা দেবেন না।" আর-এস-পি'র দুই প্রতিনিধি উদ্বাস্তুদের সুন্দরবনের অন্য দ্বীপে পুনর্বাসন দেওয়ার অনুরোধ করেছেন।

এই চিঠি অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে আমার আশঙ্কা, এই চিঠি পড়ে আপনার আর প্রতিনিধি দল নিয়ে আসার ব্যাপারে আদৌ কোনো চিন্তা করার দরকার হবে না।

শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি

নিরঞ্জন হালদার

শ্রী ভি. এম. তারকুণ্ডে
বি-১৭ মহারাণী বাগ
নিউ দিল্লি-১১০০৬৫

পরিশিষ্ট—৫

দগ্ধ মরিচঝাঁপির অঙ্গার

মরিচঝাঁপি এখন জনশূন্য। কয়েক হাজার উদ্বাস্তু মানুষ, যারা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এসে সুন্দরবনের নিবিড় অভ্যন্তরে এই মরিচঝাঁপি নামের একটি স্থানে জীবননির্বাহের আশায় বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাউনির ঘর তুলে নিতান্ত রিক্ত চেহারার একটি বে-আইনী উপনিবেশ নির্মাণ করেছিল, তারা এখন আর সেখানে নেই। তারা আবার দণ্ডকারণ্যে ফিরে গিয়েছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এই প্রশস্তি দাবি করতে পারেন যে, তাঁদের ইচ্ছা উদ্দেশ্য ও চেষ্টা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা যেখানে ঠাঁই নিয়েছিল, সেখানে এখন অঙ্গার ছড়িয়ে রয়েছে বলে প্রচারিত সংবাদে বিবৃত হয়েছে। নিতান্ত দীনতাগ্রস্ত কুটিরগুলিকে কে বা কারা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করেছে, সেটা দেশবাসীর বেদনাহত চিত্তের একটি বিশেষ জিজ্ঞাসা হলেও প্রশাসনিক প্রবক্তা এবং একাধিক মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছেন যে, বাইরে থেকে আগত দুষ্কৃতকারীরা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উপনিবেশের ঘর পুড়িয়েছে। কিন্তু কারা এহেন নিতান্ত রাক্ষসীর হিংস্রতার অনুগত দুষ্কৃতকারী যারা রিক্ত-নিঃস্ব উদ্বাস্তুর দীনহীন চেহারার ঘরগুলিকে পুড়িয়ে তৃপ্তি লাভ করবে? খাঁটি দুষ্কৃতকারী এরকম লাভহীন কাজ করে না। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলীয়তার স্বার্থবাদ অবশ্য মনে করতে পারে যে, উদ্বাস্তুর ঘর পুড়িয়ে দেবার মতো অমানুষিক কৃতিত্বও তাদের পক্ষে লাভজনক। রাজ্য সরকার বলতে পারেন, তাঁদের প্রশাসনিক শৌর্য জয়ী হয়েছে। কিন্তু সমালোচক বলবেন, রাজ্য সরকার কাঙালী মেরে কাছারি গরম করেছেন।

মরিচঝাঁপি রাজ্য সরকারের সকল বিচার-বুদ্ধি অদ্ভুতরকমে উত্তেজিত হয়ে বহু অনাচার সাধিত করেছে, দেশবাসীর এই অভিযোগের কোন যুক্তিসহ খণ্ডন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এবং প্রশাসনিক প্রবক্তা মহাশয়ের বক্তব্যে সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। সংবাদপত্র এবং রাজনীতিক বিরোধী পক্ষের উপর অজস্র দোষারোপ করেও রাজ্যসরকারের নিরীহতার কোন সত্য প্রমাণিত হতে পারেনি। বাইরের মানুষকে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুর কাছে উপনীত হতে দেওয়া হয়নি। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুকে কোন প্রয়োজনে পানীয় জলের সন্ধান এবং সংগ্রহের জন্যও বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। বনবিভাগের প্রহরী দল, পুলিশের দল এবং সম্ভবত সরকারের অনুগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কিছু বেনামী কর্মিদল মরিচঝাঁপিকে কাঠোর অবরোধের পেষণে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট করেছে। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুকে 'বুঝিয়ে-সুঝিয়ে' দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে সম্মত করানো হয়েছে, সরকার পক্ষের এহেন সহৃদয় আচরণের কথা অলীক ও চতুর এক রূপকথার মুখরতা বলে সন্দিগ্ধ দেশবাসীর মনে হয়েছে। গুলি চলেছে,

উদ্বাস্তুরা হতাহত হয়েছে। ঘটনার সকল্ জ্ঞাত তথ্য বেসরকারী সুত্রে যতটুকু সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছে, তার সম্যক্ সিদ্ধান্ত শুধু একটিই হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের ভ্রূকুটি কুটিল উত্তেজনার অজস্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে উদ্বাস্তুরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা এই কয়েক হাজার উদ্বাস্তুর পক্ষে খুবই অনুচিত ও অবাঞ্ছিত আচরণের প্রয়াস বলে অবশ্যই নিন্দিত হবে। দণ্ডকারণ্য থেকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবৃত্ত উদ্বাস্তুকে সরকার স্বেচ্ছায় আশ্রয় দিলে সেটাও অত্যন্ত অবাঞ্ছিত পরিমাণবহ একটি সম্ভাবনাকে আহ্বান করবার প্রত্যক্ষ সংকেত না হয়ে পারে না। সেটা দণ্ডকারণ্যে আশ্রিত আরও হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসবার উৎসাহময় হাতছানি। দুঃখের বিষয় এই নীতির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য রাজ্য সরকার ও বিরোধী পক্ষের নেতাদের মধ্যে সুষ্ঠু সহযোগিতার কোন সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারেনি। রাজ্যের প্রশাসনিক ইতিবৃত্তের মধ্যে মরিচঝাঁপি ঘটনা যেন অন্ধকূপ-হত্যার সেই নির্মম ঘটনার চেয়েও অনেক বেশি বেদনাময় দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত একটি অপকীর্তি যার প্রতিক্রিয়া বামপন্থী ফ্রন্টের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বিচলিত করবে।

প্রসঙ্গত আরও দু'টি ঘটনার তথ্য স্মরণ করতে হয়। একদা অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টি এবং একাধিক অন্য বামপন্থী দল প্রচণ্ড বিরোধিতা আন্দোলিত করে পূর্ববঙ্গ হতে পশ্চিমবঙ্গে আগত শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন স্থানে পুনর্বাসিত করবার সরকারী চেষ্টাকে শতভাবে বাধা প্রদান করেছিল। দাবি ছিল সকল শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে পুনর্বাসিত করতে হবে। আজ সেই সব বাধাবিশারদ প্রতিবাদী রাজনৈতিক দলেরই আচরণে বিপরীত নীতির ক্রিয়া প্রবল হয়ে উঠেছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! একটি বড় আশ্চর্য এই যে, বামপন্থী ফ্রন্টের প্রতিনিধিত্বে গঠিত এই মন্ত্রিসভারই জনৈক মন্ত্রী স্বয়ং দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হয়ে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যেতে প্ররোচিত করেছেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী সেকেন্দর বখ্ত্ লোকসভাতে এই মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ প্রদান করেছেন। কিন্তু কই? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর এই সহকর্মীর অপকৃতিত্বে লজ্জিত হয়ে সমালোচনাসূচক মন্তব্য করেছেন? মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উপনিবেশের যত দগ্ধ কুটিরের অঙ্গার আগামী বর্ষার জলে হয়তো ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু নির্যাতিত উদ্বাস্তুর শত দুঃখের স্মৃতিচিহ্ন তো জনজীবনের অন্তর্লোকের মধ্যে বামপন্থীর কঠোর হৃদয়বৃত্তির বিরুদ্ধে অনপনেয় এক অভিযোগের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থেকেই যাবে।

সম্পাদকীয়

দেশ ৪৬বর্ষ ৩২ সংখ্যা

২৫জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, ৯ জুন ১৯৭৯

পরিশিষ্ট—৬

দণ্ডকারণ্যের বঞ্চনার ইতিহাস

শঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

দণ্ডকারণ্য ভারতের মধ্যস্থলে অতি পরিচিত বৃষ্টি বহুল অস্বাস্থ্যকর সুপ্রাচীন দুর্গম গভীর বনাঞ্চল।

ভারত সরকারের টাকায় ভারতের পিছিয়ে পরা অবহেলিত এই অঞ্চলের উন্নতি হোক এটা আমরা ভারতীয় হিসাবে নিশ্চয় চাইবো। তবে কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ঠকিয়ে তাদের মিথ্যা নাম দিয়ে তা করা হোক তা নিশ্চয় চাইবো না। এই প্রচেষ্টাকে সৎ বলতে পারবো না। সমর্থন করা অন্যায় হবে। বাল্মীকির দণ্ডকারণ্যে আজকের ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্রের ৮০,০০০ বর্গ মাইলের বেশী স্থান ছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সনে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি হল ওড়িশার কোরাপুট, মধ্যপ্রদেশের বস্তারের ২৫০০০ বর্গ মাইল অবহেলিত বন নিয়ে। ওড়িশা সরকার অনেক ভেবে চিন্তে কটক ভুবনেশ্বর থেকে, সব থেকে দূরে আদিবাসী প্রধান অবহেলিত অনুর্বর পাথুরে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত কোরাপুটের দুই প্রান্তে উমরকোট, রায়গড় আর মালকানগিরি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ছেড়ে দিলেন। সব থেকে পিছিয়ে বস্তারের কোটরীর পশ্চিম পাড়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে, একেবারে বিচ্ছিন্ন বিপদ সঙ্কুল পরিত্যক্ত অবহেলিত অস্বাস্থ্যকর পারালকোট আর জাতীয় রাজপথ ৪৩ ধরে পাথুরে অনুর্বর বন কোণ্ডাগাঁও, বোড়গাঁও, যুগানী। আরও মজার কথা ওড়িশার মালকানগিরি আর উমরকোটের দুরত্ব মাত্র ২২৫ মাইল, মধ্য প্রদেশের পারালকোট কোণ্ডাগাঁও, মধ্যে তফাৎ মাত্র ১৫০ মাইল। এই ২৫,০০০ বর্গ মাইল দণ্ডকারণ্যকে দেওয়া হলো উন্নতি করার জন্য আর এর মধ্যে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসেব মত পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য পেলেন ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯০৮৮৯ একর (বর্গ মাইল নয়) আর আদিবাসীরা পেলেন ২৪৫৮০৪ একর মাত্র।

বনপরিষ্কার হয়েছে	একর	গ্রাম	পরিবার
মালকানগিরি	৭৪৬২৩	২১৫	১৭৩৩২
উমরকোট	৪০০৭৯	৬৪	৭০৬৫
পারালকোট	৫০৩৯৯	১৩৩	১১২৪৮
কোণ্ডাগাঁও	১০,০০৮	১৬	১০২৭
		৪২৮	৩৬৬৭২

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ টাকা পায় ভারত সরকারের পুনর্বাসন বিভাগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে আর সরকারের নির্দেশে

খরচ হয়েছে ও হচ্ছে সেই টাকার প্রধান অংশ ওড়িশা - মধ্যপ্রদেশের ২৫০০০ বর্গ মাইল পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নতির জন্য, এটা কি অন্যায়, প্রতারণা নয়? পূর্ব পাকিস্তানের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নাম করে বিপুল টাকা এনে তাদের জমিছাড়া ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে পরিবার পিছু ৩০০০ (তিন হাজার) টাকারও কম টাকা, এটা কি প্রবঞ্চনা নয়? ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের সরকারের পছন্দ মত স্থানে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু গ্রামের থেকে অনেক দূরে অফিসের জন্য, কর্মচারীদের থাকার জন্য যে ছোট বড় ১২টি শহর ডিডিএ বানিয়েছেন তা দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বন্ধ হবার সময় উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করে না দেওয়া কি অপরাধের কাজ নয়? উদ্বাস্তুদের ঠকানো নয়? পূর্ব পাকিস্তানের ৩৬৬৭২ পরিবারের ৪২৮টি গ্রামের ৯০৮৮৯ একর জমির জন্য দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সব টাকা খরচ করেছেন তা বোধ হয় কেউ আর আজ বিশ্বাস করবেন না। আর তাই যদি না হয় তবে প্রতি একর জমির দাম কত হলো হিসেব করে দেখবেন কি?

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নেতারা দণ্ডকারণ্যের কোন খবর রাখেন না বলে দেশের শত্রুদের অপপ্রচারের কোন উত্তর দিতে পারেন না। ভারত সরকারের পুনর্বাসন বিভাগে খবর নিলেই জানতে পারবেন, ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের জন্য জমি ও ধার বাবদ যে টাকা খরচ করেছেন তার থেকে অনেক বেশী টাকা দণ্ডকারণ্যের পরিত্যক্ত অবহেলিত জমিতে ফসল ফলিয়ে জাতীয় ভাণ্ডারে জমা দিয়েছেন এটা সবাইকে ভালভাবে জানান।

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হিসেব মত ২৮৭ গ্রামের ১৫৭০০ বাঙ্গালী বাসিন্দা পরিবার সুষ্ঠু পুনর্বাসন পাবার আগেই ১৯৭১ সনে কেবল খারিফ ফসল ফলিয়ে জাতীয় ভাণ্ডারে জমা দিয়েছেন ঃ—

ধান	৯৭,০৭,৫০৮ টাকা
মেস্‌তা	৮৫,৯৪,১৩৭ টাকা
ভুট্টা	১৫,১৪,৫৫৫ টাকা
অন্য ফসল	১,৭৫,০৪১ টাকা
ডাল	৮,১৭,২২৬ টাকা
তৈল বীজ	৬,৪৩,১৩৭ টাকা

মোট ঃ ২,১৩,৭১,৬০৪ টাকা

এই অবহেলিত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা যে উন্নতির জোয়ার এনে দিয়েছেন তার সুফল পেয়েছেন সবাই। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা নিজেদের গুণে সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। আদিবাসীরা আধুনিক চাষ শিখে নিয়েছেন। স্বেচ্ছায় আদিবাসীরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন। জীবন যাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা

করছেন। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ বা উদ্বাস্তুরা আদিবাসীদের কোন আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কারে নাক গলায় নি। বন্ধুভাবে তাদের সঙ্গে মিশেছেন তাদের ও নিজেদের সব পরবে, সব অনুষ্ঠানে মিলিত ভাবে যোগ দিয়েছেন। দেশের শত্রুরা নিজেদের স্বার্থে এই বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে চাইছেন কখনও কখনও। দেশ প্রেমিকরা নিশ্চয় এই প্রচেষ্টাকে বাধা দেবেন।

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু আসার আগে এখানে শ্রমিক পাওয়া যেত না। ইংরেজরা জোর করে এখান থেকে শ্রমিক চালান দিতেন বলে আদিবাসীরা সভ্যদের কাছেও এগোতেন না। সভ্যদের কোন কাজে যোগ দিতেন না। বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব অভাবী বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আসার ফলে এই অঞ্চলে শ্রমিক পাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল। ডি বি কে রেলের যে কোন পুরোন কনট্রাকটারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন, আদিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ছিল তাদের প্রথম যুগের মজুর আর আমরা ছিলাম তাদের বিনা পয়সার ডাক্তার।

সোনাবেদায় বিমান তৈরি কারখানা হবে ঠিক হলো। ওড়িশা সরকার মানা থেকে নিয়ে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মজুর হিসেবে কাজ করাতে।

বাইলাডিলার প্রথম যুগে পাহাড়ের নীচে একটা ছোট নালার পাশে মানা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নিয়ে এসে ক্যাম্প খোলা হলো দরিদ্র অসহায় মজুর হিসেবে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার জন্য। উদ্বাস্তুদের দেওয়া হলো পাথর ভাঙ্গার কাজ, যা তারা জীবনে কখনও করেননি। পূর্ব বাংলায় পাথর নেই, চাষীরা জীবনে কখনও পাথর ভাঙ্গেনি তা দিল্লির কেউ বুঝতে রাজী হলেন না। বাঙ্গালী চাষী, দণ্ডকারণ্যে এসেছেন জমি পাবার আসায়, গ্রাম গড়ার নেশায়। তাকে দেওয়া হলো পাথর ভাঙ্গার কাজ। এটা কি শঠতা নয়? তারা পাথর ভাঙতে রাজী হলেন না, পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে চাইলেন। গোলমাল বাঁধলো। আমি কোরাপুটে থাকি। আমাকে অবস্থা দেখার জন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য পাঠান হলো। জীপে জগদলপুর হয়ে ১৪০ মাইল গিয়ে উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছে দেখলাম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অত্যন্ত খারাপ ভাবে বাংলাভাষী মৃতপ্রায় জীবগুলোকে রাখা হয়েছে। পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা তখনও করা হয়নি। তা ছাড়া উদ্বাস্তুদের ভাষা কেউ বোঝে না আর পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীরা হিন্দি জানেন না। আমি প্রকল্পের বড় সাহেবদের কাউকে পেলাম না। তাঁরা থাকেন অনেক দূরে, নিশ্চয় ভাল পরিবেশে। যাঁদের পেলাম তাঁদের আমার মনের কথা বললাম, খাবার জলের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিলাম, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম। বাংলাভাষী কাউকে এনে উদ্বাস্তুদের সমস্যা গুলো বুঝবার জন্য আবেদন জানালাম। উদ্বাস্তু ভাইবোনদের কথা দিলাম আমি তাঁদের করুণ অবস্থার কথা সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। আমার পক্ষে তাঁদের জন্য যা করা সম্ভব নিশ্চয় করবো। কোরাপুটে ফিরে দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যান

শ্রীশৈবাল গুপ্তকে সব জানালাম। তিনি দিল্লিকে সব জানালেন। তাঁর ক্ষমতায় যা যা ছিল তা তখনি করে দিলেন। বাইলাডিলা থেকে কোণ্ডগাঁয় আমাদের হাসপাতালে অসুস্থদের নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। দণ্ডকারণ্যের ডাঃ শিবসন্তোষ বোস চীফ মেডিক্যাল অফিসার হয়ে বাইলাডিলা চলে গেলেন।

আমরা যে ভাবে দণ্ডকারণ্যে সর্বহারা বাস্তুহারাদের বাস্তু দিয়ে বড় বসতি গড়তে চেয়েছিলাম তা পারি নি। যেমন গড়া সম্ভব হয়নি নেতাজীর অখণ্ড ভারত, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপ্লবী ভারত।

আজ আর কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসাবে আমরা সবাই চাইবো আমাদের যে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হাজার ভাইবোনের পরিবার দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন পেয়েছেন তারা সুখে শান্তিতে দণ্ডকারণ্যে বসবাস করুন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৬ই জুন ১৯৬০ সনে কথা দিয়েছিলেন ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর অন্য উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের কথা ভাবা হবে। কিন্তু এখনও তাদের জন্য কিছু করা হয় নি, যে দশ কুড়ি হাজার উদ্বাস্তু পরিবার যারা পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী উদ্বাস্তু নন অথচ দণ্ডকারণ্য গড়ার জন্য দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন চাকুরি করতে, ব্যবসা করতে, তাঁদের জন্য কিছুই করা হয় নি। এটা কি ছলনা নয়? এঁদের অনেকেই ছেলেমেয়েরা দণ্ডকারণ্যেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, লেখা পড়া করেছে, এখানেই বিয়ে করেছেন, অনেকে চাকুরি ব্যবসা করছেন। যদি সরকারী সাহায্য পান, তবে এঁরাও দণ্ডকারণ্যের সম্পদ হয়ে যাবেন। দণ্ডকারণ্যের বাসিন্দা হয়ে যাবেন। এদের অনেকেই ভোটার হয়েছেন। জমি কিনে মাথা গোঁজার স্থান করে নিতে চাইছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এঁদের কথা একটু ভাবেন, এঁদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেন তবে এরাও দণ্ডকারণ্যে থেকে যাবেন। এরা আর পশ্চিমবঙ্গে ভিড় বাড়াবেন না। পশ্চিমবঙ্গের এম পি, এম এল এ-রা দিল্লির নেতাদের কাছে এঁদের হয়ে তদারকি করে এদের ডিডি এর তৈরি বাড়ি, জমি দিয়ে দণ্ডকারণ্যের বাসিন্দা করে দিন এঁদের বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচান।

পরিশিষ্ট—৭

মানা ট্রানজিট ক্যাম্পে যা দেখেছি

অশোকা গুপ্ত

মানুষে নানা ভাবে কষ্ট পায় এবং তাদের পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ঘটে। কেন ঘটে? কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন বন্যা, ভূমিকম্প আবার কখনও যুদ্ধ বিগ্রহে। যেমন বর্মা থেকে Evacuate করে যাঁরা এসেছিলেন। হাজারে হাজারে মানুষ এসেছিলেন শুধু হাঁটা পথে। তার কারণ ছিল যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে '৪৫ পর্যন্ত বাংলা বিহার ছিল ইস্টার্ণ কমাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত আর সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। জাপান বর্মায় প্রবেশ করেছে। সেইরকম অবস্থায় একটা বিরাট দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। সেই দেশত্যাগীরা কখনও ভাবে নি বর্মা তাদের নিজের দেশ নয়। তারপর যখন যাত্রা আরম্ভ হল তখন কেউ শারীরিক এবং মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না। দীর্ঘ পথচলার সময় পয়সার কোন মূল্য ছিল না। শক্তি ক্ষয় হয়েছে, খাদ্যাভাব ঘটেছে, অচেনা এলাকায় নিগ্রহ হয়েছে। যুদ্ধের কারণে দেশ-ছাড়া সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আশ্রয় তারা পায়নি। সেই আমরা প্রথম বুঝলাম মানুষের তৈরি নিগ্রহ কিভাবে মানুষকে আক্রান্ত করে। এর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ আমরা দেখলাম ১৯৪৩ সালে, যেটাকে আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তর বলি। স্বাভাবিক কারণে নৌকা প্রভৃতি যানবাহণ সরকার অধিগ্রহণ করলেন। ঘরে ঘরে যা খাদ্য মজুত ছিল সে সমস্ত সীমানা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। খাদ্য রইল না, যানবাহন রইল না। এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, শুধু হাহাকার। বহু সহস্র লোক তাতে প্রাণ দিয়েছে। তার পরেই হঠাৎ শুরু হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এটা প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি। ছোট খাটো দাঙ্গা হাঙ্গামা আমরা আগেও দেখেছি কিন্তু নোয়াখালির দাঙ্গা বা কলকাতার 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' দাঙ্গাই সবচেয়ে বড়। পঞ্চাশ বছর আগে ঘটলেও এই দাঙ্গা, আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের চোখের উপর ভেসে আসে, আমরা তার আকৃতি প্রকৃতি দুটোই বুঝতে পেরেছি। এটা মানুষের তৈরি দাঙ্গা হাঙ্গামা। এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়—রাজনৈতিক কলাকৌশলের ফলে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যে পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রইল না। তাদের পরিচিতি হল তারা কে কোন সমাজের। হিন্দু-অহিন্দু, মুসলিম-অমুসলিম এটাই ছিল পরিচয়। এটা ঘটলো কলকাতায়, নোয়াখালিতে ও বিহারে। রাজনৈতিক কুশলীদের চেষ্টায় দেশটা ভাগের একটা কাঠামো তৈরি হচ্ছিল। যার মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভারও এক একটা ভূমিকা ছিল। এই একটা ভূমিকা আমরা এখন বুঝতে পারি কিন্তু তখন চলেছিলাম আবেগের বশে এবং কোথায় যাচ্ছি সেটা ভাবতে পারিনি। আবেগের ফলে দেশে

রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয় যার ফল হয় দেশ ভাগ এবং মানুষের অত্যন্ত দুর্গতি হল। যে দুর্গতির ফল আজও আমরা ভোগ করছি, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজের দেশ থেকে দেশান্তরী হতে হয়েছে। নিজেরা ছিন্নমূল হয়ে, শরণার্থী হয়ে দেশেরই অন্য আর এক অংশে বসতি গড়তে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই আগ্রহ বা আশা কি পূরণ হল ? পূর্ববাংলার শরণার্থীদের সে আশা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। কেউ গিয়েছেন আসামে, কেউ গিয়েছেন ত্রিপুরা, বহু লোক এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। যাদের আত্মীয় স্বজন ছিল তারা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু সরকারী অব্যবস্থার জন্য পূর্ব বাংলার শরণার্থীরা, যারা ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ভারতে এসেছে, তারা কোনখানে স্থায়ী শিকড় গাঁড়তে পারেনি। পশ্চিমবাংলা ক্যাম্প থেকে তাদের ১৯৫৯ থেকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা হয় আবার অল্প সংখ্যক আন্দামানে যায়। যারা দণ্ডকারণ্যে যায়, তাদের মধ্যে কিছু বাছাই করে বিহারের বেতিয়ায়, মহারাষ্ট্রে চান্দা, উত্তর প্রদেশের তরাই, প্রভৃতি জায়গায় পাঠানো হয়। যারা দণ্ডকারণ্যে ট্রানজিট ক্যাম্পে অস্থায়ী ক্যাম্পে থেকে যায়, তাদের তিনভাগে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় উমরকোট (ওড়িশা), পারলকোট্ (মধ্যপ্রদেশ) মালকানগিরি (ওড়িশা)। যারা শুরুতে ত্রিপুরা, আন্দামান বা আসামে গিয়েছিল তারা সেইসব জায়গায় রইল। কিন্তু কে কোথায় কিভাবে আছে, তা আমরা এই পঞ্চাশ বছর পরেও বলতে পারবো না। সুখে আছে, না দুঃখে আছে, না সেখান থেকে ছিন্নমূল হয়ে আবার কোথাও গেছে তা আমরা বলতে পারবো না। ত্রিপুরাতে এখন যা রাজনৈতিক অস্থিরতা সেখানে তারা অবাঞ্ছিত, আসামে বাঙালী শরণার্থী অবাঞ্ছিত। দণ্ডকারণ্যে যারা গিয়েছে তারা এই তিনটে পূনর্বাসন কেন্দ্রে মোটামুটি বসবাস করতে শুরু করেছিল। মাঝখানে শুধু একদল উদ্বাস্তু বহু কষ্টেপরে পশ্চিম বাংলায় চলে আসে এবং মরিচঝাঁপি নামক সুন্দরবনের একটা ছোট্ট দ্বীপে বসবাস করার চেষ্টা করেছিল। সে ইতিহাস অনেকেরই মনে থাকার কথা। কারণ সে ঘটনা বাইশ তেইশ বছর আগেকার। তবে যাদের কথা বলা হল তাদের সকলে শরণার্থী হিসেবে সপরিবারে গিয়ে নানান জায়গায় বসেছে। কিন্তু যারা ছিন্নমূল এবং পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন যেমন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অসহায় নারী, শিশু, পঙ্গু অশক্ত এক কথায় যাদের আমাদের সরকারী কাগজ পত্রে বলা হল PI অর্থাৎ Permanent Liability তারাই সবচেয়ে বেশী দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছে এবং তাদের ইতিহাস যে একটা অজানা ইতিহাস এবং জীবন যুদ্ধের সংগ্রামে তাদের হার হল, কি জিৎ হল, সেটা কেউ লিখে রাখেনি। প্রথম যারা এরকম ছিন্নমূল নারী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশু, পঙ্গু অশক্ত এসে ভিড় করেছিলেন, শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বাছাই করে মেয়েদের ক্যাম্পে পাঠানো হত কিংবা বৃদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠানো হত আবার এক এক এলাকায় বড় কলোনি করে তাদের একটা গ্রামের মত পত্তন করে দেওয়া হয়েছিল। এসব ক্যাম্পের আবাসিকরা পশ্চিমবঙ্গে ছিল বলে আমরা জানি।

কী ভাবে তারা সাহায্য পেয়েছিল তার ইতিহাস ছিল। কারণ ওই সব শিবির কী ভাবে চলে সে সব তথ্যানুসন্ধান করার জন্য মেয়েদের একটি কমিটি গড়া হয়েছিল। তারা পশ্চিম ভারতে এবং পূর্ব ভারতে মেয়েদের কী অবস্থা, তার তারতম্য এবং সমন্বয় ইত্যাদি রিপোর্ট লিখতে পেরেছিলেন। ১৯৬৩ সালে প্রবলবেগে জনস্রোত পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। তখন আরম্ভ হল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। বাংলা সরকার নীতি ঠিক করে ফেললো যে, পশ্চিমবাংলায় তারা ঢুকতে পারবে না এবং তাদের কোন বন্দোবস্ত করা হবে না। তার ফলে বর্ডার থেকে দণ্ডকারণ্য Special ট্রেনের পর ট্রেনে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলকে পাঠিয়ে দেওয়া হল রায়পুর। রায়পুর ষ্টেশন হল মানা ক্যাম্পের থেকে ৮ মাইল দূরে। এখানে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে বাছাই করা লোক ছিল না। এখানে যেমন ছিল সপরিবারে বাপ-মা, তেমনি ছিল ছিন্নমূল—পঙ্গু, অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা—যাদের PI বলা হয়। তখন আমরা মানা ক্যাম্পে একটা ভাল সমীক্ষা করে কতজন সত্যিকারের PI, আর কতজন পূনর্বাসন যোগ্য তা নির্ধারণের চেষ্টা করলাম। সে চেষ্টার জন্য অনেকটা দায়িত্ব আমার উপর পড়েছিল এবং পশ্চিমবাংলার কয়েকজন মহিলা অফিসার সাহায্য করেছিলেন। এই হল মানা ক্যাম্পের ইতিহাস।

দণ্ডকারণ্য অথরিটি স্থাপিত হয় ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে। পরিকল্পনা করা হয় তার একবছর আগে। প্রথম যারা ওখানে যায়, তারা যেতে আরম্ভ করে ১৯৫৯ থেকে। first phase শেষ হয় ১৯৬১ তে। ১৯৬১-৬২ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আবার দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ১৯৬২ র তেসরা আগস্ট নতুন ক্যাটাগরির সেট্‌লার আসছিল যারা পঃ বঃ ট্রানজিট ক্যাম্পে না থেকে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে সোজা চলে যাচ্ছিল দণ্ডকারণ্যে। পশ্চিমবাংলা তাদের কোনরকম সহায়তা দেয়নি। ঠিক হল তাদের পূনর্বাসন ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাতে তারা কোনরকম অস্থিরতা অনুভব না করে। পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত শিবিরগুলি যেখানে ভাতা বা ডোল বন্ধ করে দিয়েছিল, তাদের একরকম চাপ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন দণ্ডকারণ্যে যায়। কিন্তু চীনা যুদ্ধের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬১-৬২ সালে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়, তারা সোজা পাকিস্তান থেকে চলে আসে। তারা শিবিরে অবস্থিত উদ্বাস্তু নয়। তারা কোন অস্থায়ী শিবিরে থাকার সুযোগ পায় নি। তারা বাছাই করা উদ্বাস্তু নয়, তারা পশ্চিমবাংলার কোন ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকেনি। তারা প্রাণভয়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে চলে এসেছিল। এদেরই ইতিহাস মানা ক্যাম্পের ইতিহাস।

মানা ক্যাম্প ছিল একটা পুরাতন যুদ্ধকালীন অস্থায়ী সৈন্যদের ছাউনি এবং সেই শিবিরটা একটা খোলা জায়গায়। একেবারে রুক্ষ মরুভূমি বলা যেতে পারে আর মাটি ছিল মোরাম তার চারপাশে কিছু হতে পারে না। এরা যখন আসতে আরম্ভ করলেন তখন গরম পড়তে আরম্ভ করেছে। দুপুরবেলায় ১১৪° পর্যন্ত টেম্পারেচার। বড়

বড় দুটো হল ঘর ছিল সেখানে। প্রথমে ট্রেন থেকে নেমে শরণার্থীরা উঠতে পারতো এখানে। একটি হলই ওদের জন্য ছাড়া হয়েছিল।

হলটি বিরাট উঁচু সিলিং সেজন্য বোধহয় Multipurpuse Hall ছিল অর্থাৎ খাওয়া, নাচগান লেকচার, প্রভৃতি হতে পারে এমন বড় হল। মানা ক্যাম্পের কথাই বলতে বসেছি। ১৯৬৩ সালের শেষ থেকে যখন ট্রেনের পর ট্রেন রায়পুর স্টেশনে এসে পৌঁছতে থাকে তখন সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গুটিকয়েক ট্রাক, কিছু বাস, বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী উপস্থিত থাকতেন এবং তারা এসে পৌঁছলে ট্রেন থেকে নামলে তৎক্ষণাৎ খাবার জল, কিছু শিশু খাদ্য, শৌচাগার ও অন্যান্যরকম কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এত দ্রুত গতিতে লোক আসাতে, এগুলো সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব হয়নি। তবে উদ্বাস্তুরা যে আসছে এটা সারা ভারতে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন বাংলা সীমান্ত থেকে বিহার, ওড়িশা পার হয়ে মধ্যপ্রদেশে যখন প্রবেশ করে, রাস্তায় রাস্তায় যে কটা বড় রেল স্টেশন ছিল, যেমন বিলাসপুর, রায়গড়, জামশেদপুর,— সবকটা স্টেশনে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাদ্য জল নিয়ে ট্রেনগুলিতে সরবরাহ করেছে এবং যেখানে ট্রেন থেমেছে সেখানে যত্নের সঙ্গে শরণার্থীদের সঙ্গে সৎব্যবহার করেছে এবং খাবার দাবার দিয়ে সহায়তা করার চেষ্টা করেছে। প্রথম দিকে রায়পুর স্টেশনে ইণ্ডিয়ান রেডক্রস এবং দুটো একটি খ্রীষ্টান মিশনারি সংস্থা ছাড়া সহায়তা দেবার বেশী লোক ছিল না। সেইজন্য প্রথম দিকে যারা ট্রেনে এসেছিল তাদের অনেককেই খুব কষ্ট পেতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় বেশ কিছু সংখ্যক শিশু অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। এই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা পর পর গাড়ি আসার পর এমনভাবে বেড়ে যায় যে, সারা ভারতে এটা নিয়ে কাগজে কাগজে আলোড়ন ও আলোচনা হয়। ট্রেন থেকে নেমে রায়পুর স্টেশন এবং সেখান থেকে মানা ক্যাম্প আসার পথে যে আরও নানান রকম ব্যবস্থা দরকার ছিল বিশেষ করে একটি হল ছাড়া আর জায়গা না থাকায় বিশাল রেলওয়ে প্লাটফর্মের মত জায়গায় তাদের থাকতে হত। দিনের পর দিন প্লাটফরমের একপাশে খিচুড়ি রান্না করে উদ্বাস্তুদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। যথেষ্ট শৌচাগার ছিল না। খাবার জলও অপ্রচুর ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একের পর এক গাড়ি রায়পুর এসে পৌঁছাচ্ছিল। আমার স্বামী তখন দন্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান। প্রথমে তিনি ট্রেনের সংখ্যাধিক্য এবং জনস্রোত দেখে চেষ্টা করেন যাতে পশ্চিমবাংলা থেকে ট্রেনগুলি ধীরে পাঠানো হয় এবং যাতে এদের জন্য সুব্যবস্থা করতে পারার সময় পাওয়া যায়। কিন্তু তখন বনগাঁ সীমান্ত থেকে একের পর এক ট্রেন ছাড়তে শুরু করে এবং জনস্রোত বন্ধ করা যায় না। তখন অন্তত মাথার উপরে ছাদ দেবার জন্য বহু ছোট বড় তাঁবু সেনাবাহিনী থেকে আনানো হয়। প্রত্যহ অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ করে তাঁবু মানার

বিশাল প্রান্তরে বসানো হতো। সেখান থেকে প্রধান বড় হলখানাকে ট্রান্‌জিট হল বলে ধরা হয়। প্রথম দিকে খাদ্য তাঁবুতে পাঠানো হত। প্রথম দিকে এক একটা তাঁবুতে এক একটা পরিবার ছিল। পরে দুটো করে পরিবার রাখার ব্যবস্থা হয়। তখন বোঝা যায় যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মনে করে যদি এই জনস্রোতকে আশ্রয় দেবার সুব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে শিশুমৃত্যু, মহামারী ও মড়ক বন্ধ করা যাবে না। আরেকটি যে বড় হল ছিল, সে হলটিকে একটি শিশুহাসপাতালে পরিণত করার জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। মজার কথা হল অগণিত শিশু যখন খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে তখন ওখানকার পাঞ্জাবী কর্তৃপক্ষ এই যুক্তিতে বাধা দেন যে ঘরটা পোলট্রির জন্য রাখা হয়েছে। মুরগীগুলো সরানো হলে পোলট্রির ক্ষতি হবে। সে আলোচনা চক্রে আমিও ছিলাম। আমিও তাদের কথা শুনেছি। তা শুনে আমি বলেছিলাম, মুরগীর জীবনের থেকে শিশুর জীবনের সুরক্ষার বেশী প্রয়োজন এবং মুরগীগুলো স্থানান্তর করা হোক এবং এখানে শিশুদের আর তাদের মায়েদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। তারপর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মাদার টেরিসার কাছে আবেদন করি এবং তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার নিয়ে চলে আসেন। তার আগেই সমাজকল্যাণ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মিসেস জন মাথাই চারজন সেবিকাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই শিশু হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। রায়পুর শহরের লোকেদের তুলনা নেই। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, বেসরকারী প্রচেষ্টায় খাটিয়া, বিছানা অয়েল ক্লথ, হাসপাতালের অন্যান্য সরঞ্জাম, ওষুধ নিয়ে তারা হাত বাড়িয়ে এসেছিল। সেটা না হলে আরও বহু শিশুর মৃত্যু হত। মাদার টেরিসা যখন এলেন তিনি Sister Gertriua কে নিয়ে এলেন। তিনি সত্যিকারের সুব্যবস্থা করে হাসপাতালে পরিচালনা করলেন। চার সেবিকা, ডাক্তার তিনি নিজে এবং শিবিরের মধ্যে বড় মেয়েরা যারা ছিল তাদের মধ্যে বাছাই করে ট্রেনিং দেওয়া হতে লাগলো। সুশীলা নায়ার তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি আমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। প্লেন বোঝাই রেডক্রসের গুঁড়ো দুধ নিয়ে মানাতে পৌঁছিলেন এবং রেডক্রসের সিনিয়র নার্সকে নিয়ে আসেন যাতে তিনি মানা ক্যাম্পে মেয়েদের ট্রেনিং দিয়ে কিছু পরিমাণে রুগ্ন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বেসরকারী বা যাদের non governmental organization বলা হয় তাদের প্রচেষ্টায় হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের পুরো সহযোগিতা পেয়েছিলাম। এখানে আলাদা করে লিখে রাখা দরকার যে, সরকার যখন তথ্যানুসন্ধান করছেন কে বৃদ্ধ, কে অশক্ত, কে পূনর্বাসনের যোগ্য, তখন মানুষের দুর্দশা লাঘব করার জন্য এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। না হলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যেত। এখান থেকে ভিতরে পাঠানোর জন্য স্থায়ী জায়গা না হলে সেখানে পাঠানো খুবই অসুবিধে ছিল। যেমন Bhansi ক্যাম্পে কিংবা শবরী নদীর তীরে যে শিবির, সেখানে জল ছিল কিন্তু জলটা

তুলে আনার কোন পাত্র ছিল না এসব জায়গায় উদ্বাস্তুরা নানান অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছেন। ছাউনি আছে কিন্তু কোন শয্যা নেই যেখানে শুতে পারে। ডাক্তার আছেন কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পাত্র নেই। এই সমস্ত কারণে ছোট খাটো ঘটনাগুলো দেখতে পাদিয়া ক্যাম্প, Bhansi ক্যাম্প, প্রত্যেক জায়গায় আমি নিজে গিয়েছি। ছোট ছোট খুঁটিনাটি ব্যবস্থার অভাবে মানুষ কতখানি কষ্টের সম্মুখীন হয়, তা দেখেছি। মহাভারতে যেমন যুধিষ্ঠির জল আনতে গিয়ে পাত্র না থাকাতে কাপড় ভিজিয়ে মা ও ভাইদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন, এখানেও সেই একই অবস্থা। সকলেই বনবাসী। তাদের মাটির কলসী তৈরি করার জ্ঞান ছিল না। ওখানকার আদিবাসীদরা বাঁশের খোলার মধ্যে, লাউয়ের খোলায় জল রাখতেন। আমাদের মনে হয়েছিল বুঝি আমরা মুনি ঋষিদের আশ্রমে এসে পড়েছি, যেখানে কোন জলাধার নেই, জল পান করার পাত্র থাকে না, শয্যার জন্য বিছানা থাকে না। শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এত দ্রুত গতিতে উদ্বাস্তুরা এসে পড়েছিল যে তাদের ন্যুনতম চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। রায়পুর স্টেশনের একটা ঘটনা বলি। একটা প্রান্তে দুগ্ধ কেন্দ্র ও একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছে দুগ্ধবিতরণের জন্য, আর একটা প্রান্তে ওষুধের জন্য রয়েছে ডাক্তার, একটি ছোট ছেলে প্রথমে একটি কেন্দ্র থেকে দুধ খেয়েছে পরে আর এক কেন্দ্র থেকে দুধ খেয়েছে। একজন Social worker বললেন, ছেলেটি দুবার দুধ খেল কেন? আমি বললাম, ওর ক্ষিদে পেয়েছে তাই ও দুবার দুধ খেয়েছে। এতে আপত্তির কী আছে?

এটা বোঝানো গেল না যে আপনারা মেপে মেপে খাবার দিচ্ছেন আর এদিকে এদের পেটে দুমাসের ক্ষুধা। সে ক্ষুধা মেটানোর জন্য এক গ্লাসের জায়গায় দুগ্লাস দুধ ওরা খেতেই পারে। আর একটি ঘটনা বলি। একটি বউ আর তার স্বামী এসে বললো আমার ছেলের খুব জ্বর। আমরা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলাম। তারা হাসপাতালে গেল। পরে আমি যখন হাসপাতালে গেলাম, দেখলাম মেয়েটি হাতজোড় করে কাঁদছে আর স্বামী মুখ নিচু করে বসে আছে। তারা আমাকে বললো যে, নার্স ভর্তি করলেন না। নার্স বললো বাচ্চাটি মারা গেছে। অন্তত বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিশুরা dehydrationএ মারা গেছে। মায়েরা বুঝতে পারেনি। হাসপাতালে এসে বিচলিত হয়েছে। নার্স সেবিকাদের কিছু করার ছিল না। শিশুদের জন্য স্টেশনে জল মেলেনি। মানা ক্যাম্পে এসে তখন ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে। কিন্তু গা উত্তপ্ত দেখে বোঝা যায়নি। আবার প্রসবের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রসূতি মায়েদের তাঁবুতে রাখা গেছে কিন্তু ম্যাটার্নিটি হাসপাতাল করা হয় নি। যিনি ধাত্রী তিনি বহু কষ্টে তাঁবুতে পৌঁছে দেখেন প্রসব হয়ে গেছে। আমি প্রস্তাব করেছিলাম, রিক্সা ভাড়া করতে এবং প্রসব বেদনা উঠলে শিশু হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কর্তৃপক্ষ বললেন আমাদের জিপ আর অ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে সাতদিনের মধ্যে। কিন্তু সেই সাত দিনের মধ্যে অন্তত ৭০টি শিশুর জন্ম না হলেও তার অর্ধেক শিশুর জন্ম হয়েছে কিন্তু সকলকে

নিয়ে গিয়ে সুশ্রুষা করতে পারিনি পরিকল্পনার অভাবে। কর্তৃপক্ষ গাড়ির কথা ভাবছেন কিন্তু ভাবছেন না যে একটা সাধারণ রিক্সায় তাদের নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বিশাল প্রান্তরে কোথায় যে প্রসূতি হবে তার ব্লক খুঁজে বার করতে গিয়ে তিনটে ব্লক ঘুরে আসতে হয়েছে। এই বাস্তব অবস্থায় মানুষের কষ্ট খুবই হয়েছে।

ছিন্নমূল লোকে পালিয়ে এসেছে। দাঙ্গার ভয়ে পাকিস্তানে থাকা সম্ভব হয়নি। এখানে বহু কনট্রাক্টর মিস্ত্রি যারা অহিন্দু তারা বেশ কিছু লোক এসব শিবিরে যাতায়াত করতো এবং শিবিরের উপর তারা মেয়েদের উপরে অত্যাচার করেছে। এই সাহসটা কী করে হল তা আমিও বুঝতে পারিনি। এবং কর্তৃপক্ষ যেমন আমার স্বামী খুব বিচলিত হয়েছিলেন। একটি লোককে হাতে নাতে ধরা গিয়েছিল। তাকে যখন ধরা হয় তখন আমাকে বলা হল মেয়েটিকে প্রশ্ন কর। মেয়েটি বললো আমি রান্নার কাজ করি, আমার উপরে হামলা করে, আমায় ধর্ষণ করে এবং আমার সামনে কিছু নোট্ ফেলে দিয়ে চলে যায়। যারা তদন্ত করতে গিয়েছিল তারা বললে মেয়েটি ইচ্ছাকৃত ভাবে লোকটিকে ডেকেছিল। এটা প্রমাণ করা ভীষণ কঠিন ছিল। কারণ তাতে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার ভয় ছিল। মেয়েটি বললো, যেজন্য আমরা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। এখানে এসেও এদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। আশেপাশের তাঁবুর লোকেরাও বলতে লাগলো, কোন অহিন্দু Labour রাখবেন না। কাজেই মানা ক্যাম্পে বা যে কোন শিবির যে খুব নিরাপদ আশ্রয় ছিল সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। এখানে এমার্জেন্সিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন হয়নি। শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায় নি। প্রসবকালীন সব মেয়েরা চিকিৎসা পায়নি।

বৃদ্ধ কত মারা গেছে তার কোন হিসেব নেই। একদিকে রেশন বিক্রি করেছে অন্যদিকে কাঠ এনে রাখা হয়েছে যাতে লোক মারা গেলে দাহ করা হয়। প্রথমদিকে যেসব উদ্বাস্তু এসেছিল তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ছিল তারা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বললেন যে আমাদের জিনিসপত্র দিয়ে দিন। আমরা বিক্রি করবো। তাহলে ওরাও কাজ পাবে। আর এক একটা Sector -এ দোকান থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটার সুবিধে হবে এবং যারা নেবে তারা নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিসপত্র নিতে পারবে। এর মধ্যে কিছু উদ্যোগী পরিবার ৮—২০ কিলোমিটার দুর দুরান্তে চলে গিয়েছিলেন এবং প্রচুর মাছ তরকারী কিনে নিয়ে এরা এখানে দোকান পত্তন করেছিলেন। তারপরে জায়গাটা দেখতে দেখতে খানিকটা বসবাসের উপযোগী হতে লাগলো কিন্তু শিবিরের ভিতরে চেহারা সেরকম ছিল না। প্রথমতঃ গরম। দ্বিতীয়ত, জলাধার কিংবা খাবার বাসনপত্র নেই, শুয়ে পরবার মত মাদুর বা বিছানা কিছু নেই এবং মহিলাদের সকলেই প্রায় একবস্ত্রে থেকেছিলেন। প্রথম যারা এসেছিলেন তাদের দণ্ডকারণ্যের ভিতরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল। আগেই বলেছি যে কেউ গেল Bhansi, কেউ বা গেল পাদিয়া আর কেউ বা রইল ট্রানজিট ক্যাম্পে।

একদিনের ঘটনা বলি। এক একটা গাড়ি করে যখন লোক এসে পড়েছে তালিকা করে তাদের এক এক জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক ভদ্রলোক বললেন যে, সাতদিন আগে তার পরিবার চলে এসেছে। তিনি কাকুতি মিনতি করে বললেন তার পরিবারের হদিশ করে দিতে। ঘটনা ক্রমে বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিতরায় আমার কাছে ঘটনাটা বলেন। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, দুটি ছোট বাচ্চা ও একটি দশ বছরের ছেলেকে ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এত ব্যবস্থা ছিলনা যে সত্যি সত্যি এদের spot করা সম্ভব হত। কিন্তু আমারও জেদ চেপে গেল। ভূপেন্দ্রবাবু বললেন, দিদি চলুন, সাতদিন আগেই তো গেছে দেখি খোঁজ করে পাওয়া যায় কিনা। আমার মনে আছে আমারা বেলা এগারোটা বারোটা নাগাদ বেরোলাম। একটা ট্রানজিট্ ক্যাম্পের লিস্ট চেক্ করি আর একটা ট্রানজিট ক্যাম্পের লিস্ট চেক করি। এরকম করে চতুর্থ ক্যাম্পে যখন ঢুকছি, আমি জিপের সামনের সীটে বসে ছিলাম। ভদ্রলোক আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে নামবার চেষ্টা করলেন। একটি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, ওই তো আমার ছেলে। তখন তাঁর কি উল্লাস! স্ত্রী জ্বরে আক্রান্ত, অন্য দুটি শিশু অসুস্থ—তাদের এই মিলে যাওয়া সাতদিন দেরি হলে খুঁজে পাওয়া কষ্ট হত। এই একটি ঘটনা আমাদের আনন্দ দিয়েছিল। এদের মানা ক্যাম্প থেকে পাঠানো হচ্ছিল ট্রানজিট এবং অস্থায়ী শিবিরে কিন্তু এগুলি কোনটাই পূনর্বাসনের স্থায়ী কেন্দ্র নয়।

ম্যানা ক্যাম্পে তখন উদ্বাস্তুদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কেননা তাদের আগমনও বন্ধ হচ্ছে না এবং দণ্ডকারণ্যের ভিতরে পাঠানো তরান্বিত করা যাচ্ছে না। সেই সময় দিল্লি থেকে একটা টিম মানায় এলেন যাতে উদ্বাস্তুদের জন্য সুব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সেব্যাপারে আলোচনা করা যায়। চেয়ারম্যান পরিকল্পনা করছিলেন যে, উদ্বাস্তুদের অন্য কোথাও না পাঠিয়ে তাদের স্থায়ী পূনর্বাসনের জন্য এখানেই টাউনশিপ তৈরি করা হোক। যেমন ফরিদাবাদে, যমুনাপুর প্রভৃতি জায়গায় হয়েছে। একটি বৃহৎ টাউনশিপের ব্যবস্থা করলে অন্ততপক্ষে কয়েক সহস্র উদ্বাস্তু অতি স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। এই পরিকল্পনা দিল্লিতে গ্রাহ্য হবে কিনা সেটার নিশ্চয়তা ছিল না অথচ তাঁবুতেও উদ্বাস্তুদের রাখা খুবই অসুবিধে জনক ছিল। স্যানিটেশন, জল সরবরাহ পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু হাসপাতাল করা সত্ত্বেও রোগ এবং আন্ত্রিকে ভোগান্তি হচ্ছিল। এই সময় বিরাট পোলট্রিকে শিশুহাসাতাল করা হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা এলে আর্মি ক্যান্টিনে প্রথম দিনে খাবার ব্যবস্থা হোত। তারপর দিল্লি থেকে টিম এসে বললো, যে তাঁবুর বদলে করোগেটেড শীট দিয়ে ঘর তৈরি করা হোক। তারা কন্ট্রাক্টর ডেকে ডর্মিটারি তৈরি করার কথা বললেন যাতে এক একটা ডর্মিটারিতে দশটি করে, কি তার চেয়েও বেশী পরিবার থাকতে পারে। এই টাউনশিপ পরিকল্পনা দিল্লিতে পাঠানো হল। ইতিমধ্যে জিপগাড়ি ও টেম্পো ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হল। তখনকার সমাজকর্মীরা বললেন

জিপগাড়ির পরিবর্তে রিকশা কেনা হোক, তাতে উদ্বাস্তুরা কাজ করতে পারবে আবার কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। উদ্বাস্তুরা দোকান পসার করেছিল। তাই তাদের একটা করে ঠেলা রিক্সা দেওয়া হোক যাতে তারা দূরে জিনিস বেচা কেনা করতে পারে। যেমন মনিহারী দোকান কি কাপড়ের দোকান করে তারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারবে।

দিল্লি থেকে খবর এল, দণ্ডকারণ্য থেকে মানা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাগ করে দেওয়া হবে। সুতরাং দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যানের আর মানা ক্যাম্পে থাকার দরকার হবে না। এই প্রস্তাব দণ্ডকারণ্যের চেয়ারম্যানের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তিনি বললেন, এখানেই স্থায়ী পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। এখানেই তারা জীবিকা নির্বাহ করবে। এখানেই তারাও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একসঙ্গে থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যত উদ্বাস্তু এসেছিল তারা কিভাবে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন, তাদের রেজিস্ট্রি করা যাচ্ছিল না। কত পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কেউ কেউ মহারাষ্ট্রে চলে গিয়েছেন, কেউ বেতিয়া। এক একটা পরিবার খুঁজে পেত না আগের ব্যাচে আসা পরিবারের লোকদের। আগের ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে কোনমতেই পূনর্বাসন সুপরিকল্পিত ভাবে হতে পারছিল না। আমরা সমাজসেবীরা ভাঁসি ক্যাম্পে যাই। সেখানে জল আছে কিন্তু সংগ্রহ করার পাত্র নেই। চিকিৎসার কোন সুবিধে নেই। আমি ভাঁসি গিয়ে দেখি সবজায়গায় দূর দূরান্ত থেকে উদ্বাস্তুরা এসেছে। চাকমারাও এসেছে। এরা ফিরে যেতে চায় না। আগেকার মতন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চায়। বাঙালী উদ্বাস্তুরা এসেছিল জলা জায়গা থেকে। তাই জল কষ্টই তাদের সবচেয়ে বেশী বিপন্ন করেছিল। আর যারা ব্যবসায়ী লোক তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছিল। তারা রায়পুর বা ভিলাইতে গিয়ে অনায়াসে জীবিকার সংস্থান করতে পারতো। কিন্তু দিল্লিতে কর্তৃপক্ষের কোন স্থায়ী পূনর্বাসনের লক্ষ্য ছিল না। তারা কন্ট্রাক্টরকে টাকা দিতে চায় সমাজসেবী কর্মীদের সংস্থাকে কাজে লাগাতে চায়। সমাজ সংস্থাগুলি দাবি করলেন যে যারা চাষী গৃহস্থ তারা দণ্ডকারণ্যের ভিতরে থাক কিন্তু যারা তা নয় তাদের মানায় টাউনশিপ করে রাখা গেলে ভাল হয়। কিন্তু এই প্রস্তাব দিল্লি কর্তৃপক্ষের মনঃপুত হয়নি।

মানা ক্যাম্প থেকে ফিরে চেয়ারম্যান পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। এই দশমাসের ইতিহাস উমোরকোট, পারলকোট, মানা ক্যাম্পে। সেখান থেকে চলে আসার পর আবার গিয়ে উদ্বাস্তুদের দেখে আসা সম্ভব হয়নি। ভারত স্কাউট্স এ্যাণ্ড গাইড্সের সঙ্গে একবার যাওয়ার সুবিধে হয়েছিল। মানা ক্যাম্পের পরিবর্তিত চেহারা দেখলাম মানুষ হতাশ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। আবার ইয়ং ছেলেমেয়েরা জীবন গড়বার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিংএ যাচ্ছে। কিছু ছেলেমেয়ে কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে কাজের সংস্থান করতে পেরেছিল। কোণ্ডাগাঁওতে সমাজ কল্যাণ বোর্ড সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রমের জন্য

অমিয়া সেনকে আনতে পেরেছিলাম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে। অভিজ্ঞ শিক্ষিকা প্রকৃতি গুপ্ত এসেছিলেন। যে সমস্ত মেয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ করতে পেরেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই পারলকোটে গিয়ে বনসৃজন প্রকল্পে শিক্ষা লাভ করেছিল। বহু বছর পরে এদেরই একজনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়। তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বলতে এসেছিল যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রমে ট্রেনিং নিয়ে বনসৃজন প্রকল্প করে নিজেরা দাঁড়িয়েছে। আমার স্বামী বীরভূমে যে বনসৃজন প্রকল্প করেছিলেন তার নাম দিয়ে ছিলেন বনলক্ষ্মী। পাথুরে জমির উপর বনসৃজন প্রকল্প করেছিলেন। নানা বীজের চারা বিশেষ করে আখের চারা প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গা থেকে এসব গাছের চারা সংগ্রহ করেছিলেন।

আরও একটি মেয়েকে দেখেছিলাম ভারত স্কাউট্স এ্যাণ্ড গাইড্সের Teachers training পাশ করে শিক্ষিকার কাজ করছিল। এ ক্ষেত্রে দণ্ডকারণ্যের কর্তৃপক্ষ কোন আর্থিক সাহায্য করতে পারেননি। আর পরিকল্পনাও সমাজ কল্যাণ বোর্ডের। আমরা যখন চলে আসি তার পরের বছর ওখানে শেষ ব্যাচ পরীক্ষা পাশ করে এবং বেড়িয়ে যায়। পরে যখন দেখেছি তাদের মুখে কোন হতাশার ভাব নেই। তারা নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ানোর জন্য উৎফুল্ল হয়ে রয়েছে।

পরিশিষ্ট—৮

দেশে দেশে গণহত্যার বিচার চাই

অধ্যাপক সুজাত ভদ্র

"We want to send a clear message to the world's torturers and death squads that they cannot commit their crimes with impunity" —পিনোশেত মামলায় আইনজীবীর সওয়াল।

১৯৮০র দশকেই আন্তর্জাতিক আইনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, গণহত্যা অথবা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারের কোনো সময়সীমার নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। অবশ্য তারও আগে থেকেই নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের সাজা দেবার বন্দোবস্ত ছিল (নুরেমবুর্গ ও টোকিও ট্রায়াল) এবং আছে। আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে পৃথিবীর নানা দেশে মানবতাহরণকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল বা আদালত চলছে।

১৯৭৩ সালে চিলির আলেন্দে সরকারকে হটিয়ে মিলিটারি শাসন জারি করে সেনাপ্রধান জেনারেল পিনোশেত। ৩১৯৭ জন মানুষকে 'সংঘর্ষে' অথবা 'গুমখুন' করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শুধুমাত্র '৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যেই ৩২০ জনকে হত্যা করা হয়। এতদিন বাদে পিনোশেতের শাস্তির দাবিতে বিচার শুরু হয়েছে। অসুস্থ পিনোশেত চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে এলে স্পেনের আদালতে চিলিতে গণহত্যার জন্য পিনোশেতের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। স্পেনের আদালত পিনোশেতকে স্পেনে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। লণ্ডনের আদালত পিনোশেতের অসুস্থার জন্য ঝুঁকি নিতে রাজী হয় না। তাই অসুস্থ পিনোশেত দেশে ফিরতে পারেন।

১৯৬৮ সালের ২ অক্টোবর মেক্সিকোতে Tlatcloco Plaza 'য় ৩২৫ জনকে (তালিকা অসম্পূর্ণ?) কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে অধ্যাপক Sergio Aguayo -র মর্মস্পর্শী গ্রন্থ '1968 : Archives of Violence' -এর ভিত্তিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি Gustavo Diaz Ordaz সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গণহত্যার তিরিশ বছর পূর্তির দিনে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য কণ্টকিত শাসনের সময়ে কালো মানুষের ওপর অত্যাচারের এবং তাদের হত্যার ঘটনা নিয়ে বোথা সরকারের বিরুদ্ধে ট্রুথ রিকনসিলিয়েশন কমিটির বিচারের কয়েকটি পর্ব ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। '৯৬-এর মে মাসে বসনিয়াতে, '৯৬-র জুলাই মাসে রওয়াণ্ডায় শুরু হওয়া এবং আর্জেন্টিনাতেও ওয়ার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের তদন্ত ও বিচারের ঘটনার কথা অনেকেরই জানা।

'৮২ সালে হণ্ডুরাসে ১০ জন মিলিটারি অফিসার ৬ জন ছাত্রকে গুমখুন করে। ৯৫ সালের জুলাই মাসে সেই দেশের স্পেশাল প্রসিকিউটর ফর হিউম্যান রাইট্স এদের বিরুদ্ধে বেআইনী আটক ও হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন।

গুয়েতামালাতে '৮২ সালে Rio Negro তে ২০০ জন নাগরিককে গণহত্যার বলি হতে হয়—সেই ব্যাপারে আজকের গুয়েতামালা উত্তাল। সামরিক শাসনের অবসানের আগে সামরিক শাসকেরা ইমপিউনিটি অ্যাক্ট চালু করেছিল। যাতে তাদের অপরাধের বিচার না হয়। গুয়েতামালাতে প্রয়োজনে Impunity Act (অব্যাহতি আইন) বাতিলের দাবি উঠেছে।

ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য কেরালার দুই কনস্টেবলের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে নকশালপন্থী রাজনৈতিক নেতা ভার্গিসের হত্যাকাণ্ড এবং '৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে ওয়ারকালা বিজয়নের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় কেরালা হাইকোর্ট বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯৬০-র দশকের শেষার্ধে মিজোরামে 'সৈন্যবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন' জারি হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী নাগরিকদের ওপর যে অত্যাচার চালায় তা সুপ্রিম কোর্টের মামলায় শুধু যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাই-ই নয়, প্রায় ৩০ বছর বাদে মিজোরামের নাগরিক অধিকার রক্ষা সংগঠনের দায়ের করা মামলায় (প্রথমে গৌহাটি হাইকোর্ট পরে সুপ্রিম কোর্ট) সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩০,০০০ পরিবারকে মোট প্রায় ১৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ (২০/৩/৯৫ তারিখে) দেন। ভারত সরকার ১৯ মে, '৯৫ সরকারি নির্দেশনামার (4/1/92-MZ) মারফৎ সেই অর্থ মঞ্জুর করেছেন।

পঞ্জাবে '৮০ শেষ থেকে '৯৪ সাল পর্যন্ত ৫৮৫ জন চিহ্নিত, ২৭৪ জন আংশিক চিহ্নিত ও ১২৩৮ জন অজ্ঞাত পরিচয় নাগরিককে পুড়িয়ে মারার ঘটনার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট ১০ সেপ্টেম্বর, '৯৮ তারিখে (As Reported in JT 1998 (6) SC 338) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে, পৃথিবী জুড়েই বিগত ১৯৬০-৭০'এর দশকের উত্তাল সময়ের রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে একুশ শতকেও অত্যাচারীদের সাজা দেওয়ার দাবি জোরালো উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সত্তর দশক

সত্তর দশকের সেই উত্তাল ঝোড়ো সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছিল মানবতার বিরুদ্ধে জঘণ্যতম অপরাধ। শতশত প্রাণকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন যন্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল—মানুষ জানেন সেই সন্ত্রাসের কথা। কংগ্রেস সরকারের উর্দিধারী, উর্দিহীন খুনে বাহিনী একটি প্রজন্মকে বিকৃত, বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল। সশস্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে দৈহিকভাবে, বর্বরোচিতভাবে প্রায় শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। এ.পি.ডি.আর.

-এর গ্রন্থ 'ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ' (জরুরি অবস্থায় নিষিদ্ধ, সদ্য পুনর্মুদ্রিত) অথবা তৎকালীন বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুর স্মৃতিচারণায় ('নন্দন', জুন, '৯৪), কুমুদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ পালের গ্রন্থে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিশেষ প্রতিবেদন (১৯৭৯), দর্পণ, ফ্রন্টিয়ার সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কালো কালিতে ছাপানো রক্তে লেখা বেদনাবিদ্ধ ইতিহাসের দিনপঞ্জি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

শুধু তৎকালীন সি পি আই (এম এল)-এর প্রথম সারির নেতাদের হত্যা বা অত্যাচারই নয়—বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক কর্মীদের এবং নিরীহ তরুণ, যুবকদের ভুয়ো সংঘর্ষে, থানায়, জেলখানায় গণহত্যায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এ.পি.ডি.আর. সংকলিত (অসম্পূর্ণ) তালিকা থেকে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জেলখানার ওপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়—মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল, হাওড়া জেল, সিউড়ি জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, আলিপুর ও আসানসোল স্পেশাল জেল, হুগলী জেল, কৃষ্ণনগর জেল, প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯৭০ থেকে '৭৬-এর মধ্যে ৭৬ জনকে ভুয়ো সংঘর্ষে '৭০ থেকে '৭২-এর মধ্যে ১৩৭ জন নকশালপন্থীকে হত্যা করা হয়। '৬৯-'৭২, এই পর্বে—রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে ১০৪ জন সি পি আই (এম) কর্মীও নিহত হন।

১৯৭০-'৭১-এ গণহত্যাকাণ্ডে বারাসাতে ১১ জনকে, ডায়মণ্ডহারবারে ৬ জনকে, কোন্নগরে ৯ জনকে কাশীপুর বরানগর (১২/১৩ অগস্ট '৭১) ১৫০ জনকে, হাওড়ায় ২ জনকে .....নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

মহিলা রাজনৈতিক কর্মী অসীমা পোদ্দার, অর্চনা গুহ সহ আরো অনেকের ওপরে ভয়ংকর, বীভৎস অত্যাচার নথিভুক্ত ইতিহাসের অন্তর্গত।

১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সনদের ধারার পরিপন্থী ও দেশের প্রচলিত আইনের চরম লঙ্ঘনকারী উল্লিখিত অত্যাচারগুলি —হত্যা ও গণহত্যা —মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ। ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের Genocide (গণহত্যা) বিরোধী কনভেনশনের সংকীর্ণ সংজ্ঞাতে এগুলিকে Genocide' পর্যায়ভুক্ত না করা হলেও, পরবর্তী সময়ে বেন হুইটকারের প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুসারে এগুলিকে 'Political Genocide' বলা যায়।

এখন নতুন ক্যাটাগরির মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নীতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব। সেই বর্গের নাম " Crimes against humanity" বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

এই ধরণের অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে 'International Criminal Court গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। রোমে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে; ঘোষণাপত্রও ঘোষিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত ৪৫টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। ৬০টি দেশের মতামত / স্বাক্ষর পেলে উক্ত আদালত গঠন সম্ভব হবে। ভারত, চীন ও আমেরিকা এবং আরও কয়েকটি দেশ এই আদালত গঠনের প্রস্তাবে বাধা দিয়ে চলেছে।

সত্তর দশকের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রসঙ্গে 'বামফ্রন্ট' ঃ অতীত ও বর্তমান

সত্তর দশকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করে ও দোষীদের আদালতে শাস্তিদানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে '৭৭-এ ক্ষমতায় এসেছিল সি পি আই (এম) তথা 'বামফ্রন্ট'। '৭৭ -এর বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রকাশিত ইশতাহারের ('ন্যূনতম কর্মসূচী') ৩১ এবং ৩২ নং ধারায় তাঁরা বলেছিলেন জরুরি অবস্থা ও তার আগে "হেমন্ত বসু ও অন্যান্য নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা সম্পর্কে যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা ও দোষীদের শাস্তি প্রদান করা হবে" (ধারা ঃ ৩১) এবং "বামপন্থী ফ্রন্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর থানায়, জেলে ও অন্যত্র পুলিশের নির্যাতন ও জেলে রাজবন্দীদের হত্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠন করবেন" (ধারা ঃ ৩২ ক)।

বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তীর পরিচালনাধীনে একটি তদন্ত কমিশন গঠিতও হয়। যতদূর জানা যায় ৬৫০টি অভিযোগ জমা পড়ে (বিচারপতি হরতোষ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, পরিবর্তন, জুলাই, '৮৮)। এরপর তিনজন পুলিশ অফিসার কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে। মামলার রায়ে (সূত্র ঃ CWN 1984, Pg. 583-601) বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জি উল্লেখ করেন—কমিশনের কাছে প্রদত্ত তথ্যগুলি (২০মার্চ, '৭০ থেকে ৩১ মার্চ, '৭৫-র মধ্যেকার সময়ের সন্ত্রাসের অভিযোগ, বিবরণ) যা সরকার হলফনামায় উল্লেখ করেছিল, তা নিঃসন্দেহে নাগরিকের উদ্বেগ উদ্রেককারী ঘটনাসমূহ এবং অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত (প্যারা ৮)। কিন্তু কিছু আইনী বা পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য বিচারপতি ঐ কমিশন খারিজ করে দিলেও উক্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে পুনরায় তদন্ত কমিশন গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা যেতে পারে বলে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন (প্যারা ২৩)। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ঐ পদ্ধতিগত ত্রুটি সংশোধন করে নতুন কমিশন গঠন করেননি।

সালে নেতাজীর অন্তর্ধান (?) নিয়ে '৭৪ সালে ফের খোশলা কমিশন বসান। কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় পুনরায় তদন্ত কমিশন গঠনের রায় দিয়েছেন। ১৯৮২ সালের মীরাট দাঙ্গার বিষয়ে বসানো পারিখ কমিশনের রিপোর্ট উত্তর প্রদেশের কল্যাণ সিং সরকার লাগু না করার প্রতিবাদে দায়ের করা মামলার রায়ে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কল্যাণ সিং সরকারকে কমিশনের সুপারিশ লাগু করার জন্য দু'মাসের সময় দিয়ে যে রায় দিয়েছেন—সেই রায়ের খবর 'গণশক্তি'-তে (৫/১২/৯৮) ফলাও করে, সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে ছাপা হয়ে। বলা হয়—"মীরাটের দাঙ্গার বিষয়ে 'বাধ্য হয়ে' সরকার দুটো তদন্ত কমিশন গঠন করে, তবে এই দুই কমিশন গঠনের সার্থকতা কোথায় তা আজও জনসাধারণের অজানাই রয়ে গেল।'

প্রসঙ্গ ঃ জনস্বার্থ মামলা

বহু গণসংগঠন আবারও সত্তর দশকের অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে এবং সন্ত্রাসের ঘটনাবলীর তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, জনমত সংগঠিত করছেন। আদালত যাতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেন, সেজন্য হীরেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, বিভাস চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাপস সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং অজয় দাসের মতো বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, এই মামলায় উত্থাপিত বিষয় সমুহ " Marks a great Public inportance and relates to one such as violation of Human Rights *per se*. Moreover the aforesaid issue is still alive in Public mind despite a long passage of time.....We hope that the justice would prevail."

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের পথে প্রধান বাধা হিসাবে চিহ্নিত করার কোনো যুক্তি নেই। কারণ একই ধরণের প্রশ্ন জার্মানিতে উঠেছিল ১৯৬০ দশকে। ১৯৪১-৪২ সালে জার্মানিতে ইহুদী নিধনের অপরাধীদের ২৫/৩০ বছর বাদে বিচার করা সঠিক ছিল কিনা, তা নিয়ে সমীক্ষা পর্যন্ত হয়েছিল ১৯৬৫, ১৯৬৯ এবং '৭৯ সালে। প্রতিটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, জার্মানির ৬০ % - ৮১% মানুষ নাৎসী অপরাধীদের 'এতো' বছর পরেও বিচার করা উচিত বলে রায় দিয়েছেন।

জাপানেও যুদ্ধপরাধীদের ১০/১২ বছর পরে বিচার করে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে গ্রিসে সামরিক শাসনে কমিউনিস্ট ও সোশালিস্ট পার্টির কর্মীদের হত্যার ঘটনায় '৭৫ সালে গ্রীক সামরিক নেতাদের Torture Trial অনুষ্ঠিত হয়। এই বিচারে বে-আইনী নির্দেশ তালিম করার জন্য অধঃস্তন অফিসারদের শাস্তি হয়।

বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে) ১৯৭১ সালে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী পাকিস্তান সরকারের 'ঘাতক-দালাল' গোলাম আজমের বিচার ও শাস্তির দাবিতে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ঢাকার সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে হাজার হাজার মানুষের সামনে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়। অতি সম্প্রতি, মুজিব হত্যার প্রায় ২৪ বছর পরে, ঘাতকদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশে।

ইন্দোনেশিয়ার Aech প্রদেশে মবিল অয়েল ইন্দোনেশিয়া কারখানার জন্য যে বিশাল জমি কিনেছিল—সেখান থেকে পাওয়া গেছে শত শত নরকঙ্কাল। সন্দেহ করা হচ্ছে '৬০ এর দশকে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো কমিউনিস্ট নিধনের যে নৃশংশ যজ্ঞ চালিয়েছিল তারই সাক্ষী এই গণকবর। মানবতার বিরুদ্ধে এহেন অপরাধের বিচারের দাবি উঠেছে ইন্দোনেশিয়ায়। প্রেসিডেন্ট সুহার্তের চিকিৎসার জন্য জার্মানিতে

যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্পেনের আদালত চিলির পিনোশেভ্‌কে বিচার করতে চাওয়ায়, প্রেসিডেন্ট সুহার্তো জার্মানিতে বিচারের ভয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাননি।

গুয়েতামালায় Historical Clarification Commission (HCC) তাদের ঐতিহাসিক ৩৪০০ পাতার রায়ে (Guetamala : Memoirs of Silence, Feb, '99) সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৮২ অব্দি গণহত্যা (৬৩০), বলপূর্বক অপহরণ ও হত্যা (২লক্ষ) এবং সাজানো সংঘর্ষে হত্যার ঘটনার (মায়ান সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০ হাজার মানুষ যায় প্রধান শিকার) তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট তৎকালীন তাঁবেদার সরকার তথা অপরাধী-অত্যাচারীদের শাস্তির দাবিতে গুয়েতামালা আজ উত্তাল।

শ্রীলঙ্কায় জনমতের চাপে সিংহলী সরকার ১৯৮৮ থেকে '৯৪ পর্যন্ত সময়কালে ২৩ হাজার নাগরিকের 'নিখোঁজ' বা অপহরণের বিষয়ে যে তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিল, তার রিপোর্ট '৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টের ভিত্তিতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে শ্রীলঙ্কায় জনমত গড়ে উঠেছে।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিলোচেভিচকে যুগোশ্লাভিয়া থেকে হেগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসাবে কসোভাতে সংখ্যালঘুদের গণহত্যার অভিযোগে হেগের আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়েছে।

১৯৭৮ সালে খমের রুজ শাসনকালে কম্বোডিয়ায় গণহত্যার জন্য পল পট এবং তার সঙ্গীদের বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল টমাস হ্যামারবার্গ নিজে কম্বোডিয়াতে গিয়ে গণহত্যার মামলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। কম্বোডিয়াতে আলোচনা চলছে বিচার রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারালয়ে হবে, না কম্বোডিয়ার বিচারব্যবস্থায় হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে গণহত্যা হয়েছিল ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে।

৩০ এপ্রিল '৯৮ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টেরই দেওয়া রায় মেনে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজীর 'অন্তর্ধান' নিয়ে ফের বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। অথচ 'বামফ্রন্ট' সরকার সত্তরের গণহত্যার অপরাধীদের শাস্তি বা গণহত্যাকাণ্ডসমূহের তদন্তের বিষয়ে আদালতে ও আদালতের বাইরে চূড়ান্ত মীমাংসায় অনীহা প্রকাশ করে চলেছে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের ছুতো দেখাচ্ছে, সেই সরকারভুক্ত দলগুলো কিন্তু নেতাজীর 'অন্তর্ধান' বিষয়ে ফের তদন্ত কমিশন বসানোর দাবি এবং কমিশন বসানোর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ১৯৯৯ সালের ২৮ এপ্রিল, কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক আলোচনা সভায় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ১৯৪৯ সালে ২৭ এপ্রিল

পুলিশি গুলিচালনায় অমিয়া-প্রতিভা-লতিকা-গীতার হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন (সূত্র ঃ গণশক্তি ২৯ এপ্রিল, '৯৯) এবং তা ৪০ বছরের ব্যবধানে। জ্যোতি বসুর দাবিটি সঙ্গত। চারদশক আগের ঘটনার তদন্তের দাবি যাঁরা তুলছেন, তাঁরা আড়াই দশক আগের ঘটনাবলীর তদন্তের দাবিটিকে 'দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান' এর অজুহাতে এড়াতে চাইছেন কেন? কেন এই বিরোধিতা? সত্তরের দশকে সি.পি.আই.(এম).দের অনেক কর্মী খুন হয়েছে, সে কথা প্রতিটি নির্বাচনের সময়েই জনসাধারণকে মনে করান সি. পি. আই. (এম). তথা 'বামফ্রন্ট'এর নেতৃবৃন্দ। সেই কর্মীদের শহীদত্বকে নির্বাচনে পুঁজি করা অথচ হত্যাকারীদের শাস্তি না দিয়ে আড়াল করা মানবতার প্রতি জঘণ্য অপরাধ।

রাষ্ট্রীয় বর্বরতার স্মৃতিকে 'ভুলে যাওয়া', ঘাতকদের অব্যাহতি দেওয়া মানবতার বিরুদ্ধে জঘণ্য অপরাধ, একটা প্রজন্মের প্রতি তা এক চূড়ান্ত অপরাধ। ঘাতকরা এভাবে অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারে না।

'We are ripping up old wounds by demanding an end to impunity, on the contary, these wounds were never healed because of impunity' — ঘাতকদের অব্যাহতি (impunity) দেওয়ার ফলেই আমাদের ক্ষতগুলির কোনো নিরাময় হয়নি। হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো নয়—আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষতই রয়ে গেছে। 'অব্যাহতি' দেওয়া আর চলতে পারে না। ঘাতকদের শাস্তি চাই।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ-পি-ডি-আর)]

মরিচঝাঁপির দন্ডকত্যাগী উদ্বাস্তুদের উপর সন্ত্রাস ও গণহত্যার (১৯৭৮-১৯৭৯) অপরাধীদের নামের তালিকা, এদের বিচার চাই?

১. মুখ্যমন্ত্রী—জ্যোতি বসু,
২. সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর—কল্যাণ চক্রবর্তী
৩. ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা শাসক—নীরদ দাশ
৪. ২৪ পরগণার জেলা শাসক—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী
৫. ২৪ পরগণার পুলিশ সুপার—অমিয় সামন্ত, আই.পি.এস.
৬. বসিরহাটের এস.ডি.পি.ও.—অনিল কুমার, আই.পি.এস.
৭. বারাকপুরের এস.ডি.পি.ও.—জয়দেব চক্রবর্তী, আই.পি.এস.
৮. অফিসার ইন-চার্জ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ১ম ও ৮ম ব্যাটালিয়ান
৯. হাসনাবাদ থানার ও.সি.—
১০. সন্দেশখালী থানার ও.সি.—
১১. গোসাবা থানার ও.সি.—

পরিশিষ্ট—৯

দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু (১)
কেন এরা আসছে? খোঁজ নিন !

শৈবাল কুমার গুপ্ত

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং বন্যার স্রোতের মত দলে দলে বিভিন্ন পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীর ভিড়ে শিয়ালদহ, হাওড়া, খড়গপুর, বার্নপুর প্রভৃতি রেলওয়ে স্টেশন এবং হাসনাবাদ ও আরো কয়েকটা অঞ্চল গিস গিস করছে; পশ্চিমবঙ্গে এখন যারা প্রশাসনের কর্ণধার তারা যদি মনে করেন এটা কোন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারসাজি তবে সেটা হবে নিছক আত্মপ্রতারণা এবং উদ্বাস্তুদের গলাধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে পাঠাবার অজুহাত। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের কোন মুখপাত্র নাকি বলেছেন যে এই চলে আসবার পেছনে আছে উদ্বাস্তুদের শ্রমবিমুখতা এবং কিছু কিছু গ্রাম-সেবকের উস্কানি। এ দুয়ের কোনটাই ঠিক নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়। উদ্বাস্তুরা যে শ্রমবিমুখ নয় সেটা দণ্ডকারণ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসকের জবানিতেই প্রমাণ করা যাবে। আর গ্রামসেবকদের প্ররোচনা? উদ্বাস্তুরা ফিরে এলে তাদের কি স্বার্থ? গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে তারাও ত বেকার হবে — এমন আত্মঘাতী কাজকরে তাদের লাভ? আর রাজনৈতিক দলের কথাই যদি ওঠে তবে এটা কি ঠিক নয় যে এতদিন বামপন্থী দলগুলিই ছিল আন্দামান বা বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সেজন্য তাদের সর্বাধিক আস্থাভাজন? যাদের কাছে তাদের কৃতজ্ঞ হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই এককালে ক্ষমতাসীন কিন্তু বর্তমানে গদিচ্যুত দল বা দলগুলির উস্কানীতে স্থায়ী ঘরবাড়ী জমিজমা ছেড়ে তারা অনিশ্চিতের পিছনে ছুটবে তাদের প্রাক্তন সুহৃদদের বিব্রত করবার জন্যে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। হতে পারে যে বামপন্থী দলগুলির পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে তাদের আশা হয়েছিল যে এবার হয়ত তাদের অবস্থাটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত হবে— কিন্তু আসল কারণ কারুর উস্কানি বা প্ররোচনা নয়, সুষ্ঠু জীবনযাপন ও অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের তাগিদ। সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করেই যদি বর্তমান সরকার প্রত্যাগত শরণার্থীদের পত্রপাঠ বিদায় করেন, তবে এই কথাই প্রমাণ হবে যে ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোন তফাৎ থাকে না। দু পক্ষই ঘাড় থেকে আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচেন। ১৯৬৪ সনে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে সদ্য আগত অগণিত হিন্দু-বৌদ্ধ, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা শিশু দণ্ডকারণ্যের প্রবেশদ্বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তখনো প্রশাসনের চেহারাই দেখেছি।

আমি সবে দণ্ডকারণ্যের ভার নিয়ে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ফিরছি, পথে এই ব্যাপার দেখে টেলিফোনে বলেছিলাম আমাকে অন্তত এক সপ্তাহের সময় দেওয়া হোক, যাতে এই জনস্রোত সামলাবার জন্য শিবির ও রসদ সংগ্রহ করতে পারি। তদানীন্তন সরকার আমার এই সামান্য অনুরোধও রাখেন নি, তারা হয়ত ভেবেছিলেন যা শত্রু পরে পরে, আপাতত এই আপদ ঘাড় থেকে নামুক। বর্তমান

প্রশাসনও কি সেই পন্থাই অবলম্বন করবেন? একবারও কি সরেজমিনে তদন্ত করে জানবার চেষ্টা করবেন না কেন এত লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসে? সে জাতীয় তদন্ত এক বা একাধিক মন্ত্রীর ভূপাল বা রায়পুর বা কোরাপুটে গিয়ে সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডলী বা উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের সঙ্গে আলাপ করে হবে না। তার জন্য চাই প্রশাসনে অভিজ্ঞতা, সংবেদনশীল মানবতাবোধ এবং সত্য সন্ধিৎসু মানসিকতা। এই সব গুণ যার আছে তেমন একজন বা দুজন ব্যক্তি যদি মাসাধিককাল ধরে সমস্ত পুনর্বাসিত অঞ্চল ও উদ্বাস্তু শিবির পর্যটন করে, দণ্ডকারণ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে ও তাদের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তথ্যসংগ্রহ করেন তবে সে তদন্ত হবে বাস্তবধর্মী এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করবার সহায়ক। তা না করে যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গতানুগতিকতার আশ্রয় নেন তবে উদ্বাস্তুরা যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই থাকবে, তাদের সমস্যার কোন সুরাহা হবে না এবং হয়ত কয়েক দশকের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উদ্বাস্তু সমস্যা একটা মানবিক সমস্যা, একে রাজনৈতিক দাবাখেলায় পরিণত করলে শুধু ভুল নয়, অন্যায় হবে এবং সেই অন্যায়ের কোন মার্জনা নেই।

(২) দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা প্রথম কার মাথায় এসেছিল সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। মনে হয় এটা বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার সম্মিলিত ফল এবং সে চিন্তাধারার মধ্যে উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের পুনর্বাসনের ইচ্ছা যতটুকু জায়গা জুড়ে ছিল, তার চেয়ে বেশী জুড়ে ছিল অন্যান্য স্বার্থ যেটা এখন পশ্চাৎ দৃষ্টির সাহায্যে ক্রমশ উদঘাটিত হচ্ছে। জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে আর তিলধারণের স্থান নেই, অথচ বিভিন্ন ক্যাম্পে ডোলের উপর নির্ভর করে যারা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করা দরকার এবং সেটা হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, এই ছিল বাংলা সরকারের এবং খুব সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারেরও মনোভাব। হঠাৎ কোন উচ্চপদস্থ আমলার দৃষ্টি পড়ল এই ভূখণ্ডের উপর। কিন্তু আগে থেকেই এ, এম, পি, ও, নাম নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার অন্তর্গত ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ এলাকার খনিজ ও বনসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও শিল্পায়ণের পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন কিন্তু বাধা ছিল বিস্তর। বিরলবসতি অঞ্চলে শ্রমিক জোটে না, আদিবাসীরা সংখ্যায় অল্প এবং ওদের জীবনযাত্রার ধরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্পের অনুকূল নয়। অনগ্রসর অঞ্চলে পায়ে চলার পথ আছে, পাকা সড়ক নেই, যন্ত্রচালিত যানবাহন ত দূরের কথা। যদি যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বাস্তুদের এখানে এনে বসান যায় তবে এক ঢিলে অনেক পাখী মরে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করা হল বলে দাবি করা চলে, পরিকল্পনার রূপায়ণে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, শ্রমিক সমস্যার সমাধান হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের যে বিপুলসংখ্যক কর্মচারীর কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাদের পুনর্বাসনেরও একটা সুরাহা হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা। পশ্চিম পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য অকৃপণহস্তে অর্থ ব্যয় করার কাজে যারা ছিল তার প্রধান সহায়, হঠাৎ দণ্ডকারণ্যের মত একটা নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে

তাদের চাকুরির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনায় তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুঁটিয়ে দেখা হল না, যাদের এখানে এনে ফেলা হবে এখানকার আবহাওয়া তাদের সইবে কিনা, যে বৃত্তি দ্বারা তাদের জীবিকা অর্জন করতে বলা হবে সেই কৃষির পক্ষে এখানকার মাটি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল কিনা, যে ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে তাদের নতুন জীবনযাত্রা শুরু হবে সেখানে তাঁরা অবাঞ্ছিত বা অপাংক্তেয় কিনা। তাছাড়া আরও একটা নিগূঢ় মতলব যে অন্তত কারুর কারুর মনে ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। দণ্ডকারণ্যের যে কাল্পনিক সীমারেখা টানা হল, তার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ বাদ আছে। উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের দু-তিনটি অনগ্রসর থানা। যেসব জায়গায় জমি উচ্চাবচ, অনুর্বর ও বিরলবসতি সেখানে এই দুটি প্রাদেশিক সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জন্য কিছু জায়গা বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন এই শর্তে যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যোগাযোগের পাকা রাস্তা তৈরি করার দায়িত্ব, সেচের দায়িত্ব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দণ্ডকারণ্য প্রকল্প নিজ ব্যয়ে বহন করবে। এবং উন্নয়নের পর সিকি ভাগ জমি আদিবাসীদের স্বার্থে প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেবে। আপাতদৃষ্টিতে এতে আপত্তি করার কিছু নেই, জমি যখন বিনামূল্যে পাওয়া গেছে এবং রাস্তাঘাট যখন নিজের প্রয়োজনেই করতে হবে। কিন্তু উড়িষ্যা সরকারের নিগূঢ় মতলব ধরা পড়ল যখন দেখা গেল যে ছেড়ে দেওয়া জমিগুলি খন্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে বহু দূরে ছড়ান। উড়িষ্যা সরকারের এই চালে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মাথায় হাত বুলিয়ে বহু ব্যয়সাধ্য রাস্তাঘাট তৈরি করিয়ে গোটা এলাকাটাই সহজগম্য করা হল, অথচ ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্বাস্তু বসতির সম্ভাবনার গোড়ায় কুঠারাঘাত করে স্থানীয় রাজনৈতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে দেওয়া হল না। পরে দেখা যাবে যে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ বিপুল অর্থব্যয়ে যে দুটি সেচ পরিকল্পনার বাঁধ ও তার অববাহিকা তৈরি করেছেন তার প্রায় সমস্ত সুবিধাই স্থানীয় অধিবাসীদের ভাগে পড়েছে, উদ্বাস্তুদের জন্য যে ছিটেফোঁটা বরাদ্দ ছিল তাও প্রায় যাবার মুখে। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার এমন চমৎকার উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। আশ্চর্য এই যে উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ অর্থের বিপুল একটা অংশের এইভাবে উদ্বাস্তুবহির্ভূত স্বার্থে বিনিয়োগ কারুর চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। ষষ্ঠ প্ল্যান কমিশনের নোটে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পটি একটি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, পুনর্বাসন প্ল্যান নয়।

(৩) দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানকারী ডোল-নির্ভর উদ্বাস্তুদের শিবির থেকে সরিয়ে এনে তাদের কোন বৃত্তিতে স্বনির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছায়। পুনর্বাসন মন্ত্রকের ধারণা ছিল এইসব শিবিরের অধিবাসিদের মধ্যে অন্তত শতকরা নব্বই জন কৃষিজীবী, বড়জোর দশজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা ক্ষুদ্র শিল্পী। পরিকল্পনার কাঠামোও সেইভাবে তৈরি হল ক্ষুদ্রশিল্প বা ব্যবসায়ের জন্য বরাদ্দ হল যৎসামান্য টাকা, বাকীটা চাষী পরিবারের জন্য। যেখানে যেখানে যখনই একলপ্তে কিছুটা জমি পাওয়া গেছে, তখনই সেখানে গাছ উপড়ে জঙ্গল কেটে জমিটা চাষের উপযুক্ত মনে করে গ্রাম পত্তন করা হয়েছে এবং ৩০ থেকে ৫০টি পরিবার সেখানে পাঠিয়ে জমিতে বসিয়ে বলা হয়েছে যে তিন বৎসর তারা জীবনধারণের জন্য সামান্য কিছু ডোল পাবে, হাল

লাঙ্গল বলদের জন্য লোন পাবে এবং তিন বৎসরের মধ্যে স্বনির্ভর হতে হবে কারণ তার পরে আর ডোল মিলবে না। শিল্প বা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ব্যবস্থার কার্পণ্য আরো বেশী। তাদের বেলায় ডোলের মেয়াদ মাত্র তিন মাস। একথা কারুর মনে হল না যে গ্রামের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নীচের ধাপে সেখানে কাদের এমন ক্রয় ক্ষমতা আছে যাদের উপর নির্ভর করে একজন ব্যবসায়ী দোকান খুলতে পারে বা একজন শিল্পী নিজের শিল্পনৈপুণ্যের বলে জীবিকা অর্জন করতে পারে?

পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের বেলায় কিন্তু এরকম করা হয়নি, বলা হয়নি যে 'Once an agriculturist, always an agriculturist'. যে যেখানে যেভাবে পেরেছে পুরানো বা নতুন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার জন্য প্রাপ্য সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবার প্রশ্নই ওঠেনি। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে এই কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবীর জাতিভেদ অনড় হয়ে থাকার দরুন পুনর্বাসন বিঘ্নিত হয়েছে, ক্রমবর্ধমান দুর্দশার দরুন অসন্তোষ বেড়েছে এবং এই অসন্তোষের প্রকাশ হয়েছে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা প্রধান তাদের মুখে। দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ মনে করেন এই সব স্থানীয় নেতারাই যত অশান্তি ও আন্দোলনের মূলে। সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু গোড়ায় যেখানে গলদ, পুনর্বাসন যেখানে কাগজে কলমে কিন্তু কাজে নয়, সেখান অসন্তোষের মূলোচ্ছেদ না করলে এই পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না যদি ফ্রেচার বা সুকুমার সেনের পরামর্শ শুনতেন তবে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াত। পাঞ্জাব কেডারের করিৎকর্মা অফিসার ফ্রেচার খুব সুনামের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ করেছিলেন এবং এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুনর্বাসনের কাঠামোটা খাঁড়া করবার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার একটা মস্তবড় দোষ ছিল, সব সময়ে 'yes sir' বলতে জানতেন না—সুতরাং তাকে যেতে হল। কিছুদিন পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চাপে পড়ে শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সুকুমার সেনকে চেয়ারম্যান করে নিতে বাধ্য হলেন কিন্তু নানাদিকে তার ক্ষমতা সীমিত করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে বার বার রুদ্ধ দেওয়ালে মাথা ঠোকাই তার সার হল, শ্রীখান্নাকে দিয়ে কিছুতেই একথা মানাতে পারলেন না যে একান্তভাবে কৃষিনির্ভর দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, দ্রুত শিল্পায়ণ ছাড়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আর কোন পথ নেই। এই শ্রীখান্নাই কিন্তু ১৯৬৪ সনের বিপুল উদ্বাস্তু আগমনে ভড়কে গিয়ে আমাকে S.O.S পাঠিয়েছিলেন 'অবিলম্বে বহু শিল্প প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে রায়পুরে দেখা কর।' যেন বিভিন্ন শিল্পের পরিকল্পনা ও প্ল্যান এতই সহজ যে ম্যাজিসিয়ানের খরগোসের মত তা টুপি থেকে বার করা যায়।

(৪) আমি মোট দশ মাস দণ্ডকারণ্যে ছিলাম। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ পদত্যাগ করি। এই সময়ের মধ্যে পুনর্বাসনের যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে সেটা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তার বিস্তৃত বিবরণ বোম্বের Economic Weekly-র সম্পাদক শচীন চৌধুরীর অনুরোধে ওর কাগজে প্রকাশের জন্য লিখে পাঠাই এবং ১৯৬৫ সনের জানুয়ারী মাসে পর পর তিনটি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। তার খানিকটা চুম্বক নীচে তুলে দিচ্ছি।

১৯৬৪ সনের জুন পর্যন্ত পুরাতন শরণার্থী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭৫০০ যার মধ্যে ৭২৬১ টি পরিবারকে তথাকথিত কৃষি জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যিই কি

এদের সকলে একান্তভাবে স্বনির্ভর হয়ে পুনর্বাসিত হয়েছিল?

চাষের জমির উপর যাদের নির্ভর সে সব পরিবারের লোকসংখ্যা যদি সাড়ে চার জন বলে ধরা হয়, তবে হিসাব করে দেখা গেছে যে, জীবিকার প্রয়োজনে অন্তত ৬০ মণ ধান জমি থেকে তুলতে না পারলে জীবিকা নির্বাহ কঠিন—৩৫ মণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজনে, ৭ মণ বীজ ধানের জন্য ও ১৮ মণ ধান বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্য। একর পিছু ১৫ মণ ধান না হলেও অন্তত ১১ কি ১২ মণ ধান হওয়া দরকার। যদিও সমস্ত ৬ কি ৬.৫ একর জমিই ধানচাষযোগ্য ছিল না। একটু খতিয়ে দেখা যাক যে ১৯৬৪ সনের মাঝামাঝি যে ৭৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয় (কৃষি জমিতে ৭২৬৯, বাদবাকি ক্ষুদ্রশিল্পে) তার মধ্যে কত অংশ এই অবস্থায় পৌঁছেছিল।

(১) প্রথম যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয় সেটা ১৯৫৯ সনে ফরাসগাঁও অঞ্চলের তিনটি গ্রামে—কৃষিতে ২০৫ টি পরিবার, ক্ষুদ্রশিল্পে ৪৬টি। জমি অনুর্বর সুতরাং এক বছর প্রচুর রাসায়নিক সার সংযোগে ফলন ভাল হলেও গড়ে একর পিছু ৪/৫ মণের বেশী ফলন হয়নি। সর্বশেষ হিসাব থেকে দেখা যায় যে ৩২টি পরিবারের ভূমি একেবারে নিষ্ফলা, ১৩১টি পরিবারের ভাগ্যে জুটেছে সর্বসাকুল্যে ৩০ মণ ধান, ১৬টি পরিবারের ৩১ থেকে ৪০, ৫টি পরিবারের ৪১ থেকে ৫০ এবং ২১ টি পরিবারের ৫০ মনের উপর। এরা যে তবু বেঁচে ছিল সেটা পুনর্বাসনলব্ধ কৃষিজমি বা ক্ষুদ্রশিল্পের জোরে নয়, বোরগাঁও গ্রামে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্পের দৌলতে; সেখানে চাকুরি করে, অথবা দিনমজুরি খেটে অথবা অন্যত্র ফালতু কাজ যোগাড় করে। ছেচল্লিশটি শিল্পী পরিবারের অবস্থাও তথৈবচ—১২টি পরিবার শিল্প থেকেই কোন রকমে টিকে আছে, বাকি সব শিল্পগুলিই মুমূর্ষ অথবা মৃত। ওদের বেলাতে দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত দারুশিল্প ভরসা।

(২) তারপর পত্তন হয় উড়িষ্যার উমরকোট অঞ্চলের উমরকোট ও তার কাছে বা দূরের ২৪টি গ্রাম এবং বহু দূরে বিশ্লিষ্ট রায়গড় ও তৎসন্নিহিত বিভিন্ন স্থানে আরো ২৪ টি গ্রাম। উমরকোটে ১২৪০ টি পরিবার বসান হয়েছিল, আর রায়গড়ে ২৫৪৬ টি। উমরকোট অঞ্চলের গ্রামগুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মত ছিল এই যে ১৭৬ টি পরিবারের জমি একেবারেই ধান চাষের অনুপযুক্ত, ৫১ টি পরিবারের জমির মধ্যে এক একর মাত্র এই চাষোপযোগী, ১০৭ টি পরিবারের ২ একর, ১৭৬টি পরিবারের ৩ একর ইত্যাদি। যদি একর পিছু ফলন ১০ মণই ধরা যায় (যদিও সেটা দুষ্প্রাপ্য) তবে অন্তত ৪ একরে ধান না হলে একটি পরিবারের গ্রাসই চলে না, আচ্ছাদন তো দূরের কথা। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারীতে যখন পরিবার পিছু কত খাদ্যশস্য মজুদ আছে তার হিসাব নেওয়া হল তখন দেখা গেল ১২১ টি পরিবারের হাতে আছে ৫০ মণ, ১০৮টি পরিবারের ৪০ থেকে ৫০ মণ, ২১৯ টি পরিবারের আছে ৩০ থেকে ৪০ এবং ৪৫২ পরিবারের ৩০ মনের নীচে। তার মধ্যেও ১২১টি পরিবারে ভাড়ার একেবারের শূন্য এবং ১১১টি পরিবারের হাতে ১০ মণেরও কম। উমরকোটকে তখনকার মত বাঁচিয়ে রেখেছিল ভূট্টা, মুগ, মেস্তা, প্রভৃতি বিকল্প শস্যের চাষ এবং বিশেষ করে ভাস্কল বাঁধে মাটি কাটার দিনমজুরি কাজ। কিন্তু শেষেরটা ত

চিরস্থায়ী নয়। এই ভাস্কল বাঁধ শেষ হয় আমি চলে আসবার কিছু পরে, কিন্তু এর সম্বন্ধে একটা জিনিস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং উড়িষ্যার পুনর্বাসনের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বাঁধটা করা হচ্ছিল বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে। দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন প্রকল্পের বাজেট থেকে। আশা করা অন্যায় নয় যে এর বেশির ভাগ সেচের সুবিধাই পাবে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রামগুলি, যদিও স্থানীয় অধিবাসীরাও বঞ্চিত হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা গোড়া থেকেই ছিল অন্যরকম—সেচ প্রকল্প তৈরিই হয়েছিল এমনভাবে যে এর জল দ্বারা সিঞ্চিত ১১০০০ একর জমির মধ্যে মোট ১১০০ একর জমি ছিল উদ্বাস্তুদের, বাকি সবটা স্থানীয় অধিবাসীর। অর্থাৎ গোড়া থেকেই সেচ প্রকল্পের মাত্র এক দশমাংশ জল উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দ ছিল, বাকিটা অন্যের। যারা এই প্রকল্পের জন্মদাতা তারা দণ্ডকারণ্য প্রশাসনের অফিসার, উড়িষ্যা সরকারের নয়, কিন্তু পরিকল্পনা দেখে সেকথা মনে করা শক্ত। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়, আরও একটু পরিশিষ্ট আছে। ভাস্কল বাঁধের নির্মাণ শেষ হলে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন উড়িষ্যা সরকারের হাতে এবং তারাও সে সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি। সর্ব্বশেষ সংবাদ এই যে, ছিটেফোঁটা যেটুকু জল উদ্বাস্তুদের জমির ভাগ্যে জুটেছিল, খালের মুখ বন্ধ করে উড়িষ্যা সরকার সেটুকু থেকেও তাদের বঞ্চিত করেছেন। শুধু উমরকোটে দণ্ডকারণ্য পরিচালিত Experimental Farm এর জন্য যতটুকু জল দরকার সেটা বাদদিয়ে। রায়গড়ের গ্রামগুলির অবস্থা আরও খারাপ বলে আমার শোনা ছিল, কিন্তু তার সঠিক তথ্য আমার কাছে নেই।

(৩) উমরকোটের পর মধ্যপ্রদেশের পারলকোট অঞ্চলে বসতি হয়। এখানকার জমি মোটের উপর ভাল, মধ্যপ্রদেশ সরকারের ব্যবহারে দুমুখো নীতি নেই এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের অর্থে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার প্রবৃত্তি ও দেখা যায় নি। আমি যখন ছিলাম তখন সম্প্রতি ৪৫টি গ্রামে ২২৩৯ টি পরিবার বসান হয়েছে। তার মধ্যে সে বছর ৫১১টি পরিবার ৩০ মণের উর্ধে ধান পায়। বাকিরা পায় তার কম। আঞ্চলিক প্রশাসন এটাকে নৈরাশ্যজনক মনে করেননি এবং বলেছিলেন ওখানকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভাল। গ্রামগুলি খুব দূরে দূরে নয় এবং যে ক্ষুদ্র সেচপ্রকল্প আমার সময়ে পাখানজোড়ে শেষ হয়ে এসেছিল এবং অপর যে মাঝারি সেচপ্রকল্প সবে আরম্ভ হয়েছিল তার বারো-আনা সুবিধাই পাবে উদ্বাস্তু জমিগুলি।

(৪) সকলের শেষে পত্তন হয় মালকানগিরি অঞ্চল এবং এখানেই যত গোলমালের সূত্রপাত। এই স্থানটির নির্বাচন যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং উড়িষ্যা সরকার দণ্ডকারণ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে এই দূরবর্তী এবং একান্ত অনগ্রসর প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চলকে উন্নীত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। আমার সময়ে (১৯৬৪) মোট ১০২৩ টি পরিবার ২৩ টি নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রামে ছড়িয়েছিল এবং তাদের যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদির কোন বালাই ছিল না। পাথুরে জমিতে নলকূপ বসে না। উচ্চাবচ জমিতে বর্ষার জল গড়িয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মাটির আস্তরণের গভীরতাও হ্রাস পেয়ে চাষের অনুপযোগী হয়। তখন সবেমাত্র গ্রামগুলির পত্তন হয়েছিল। পরিবার পিছু জমি বিভাগ সম্পূর্ণ হয়নি। এক একটা গ্রাম যৌথভাবে চাষ করে যে ফসল পেয়েছিল, তার একটা হিসাব আমি করিয়েছিলাম। সেটা এই রকম—

৬৩১টি পরিবারের উৎপাদন পরিবার পিছু অনধিক ২০ মণ এবং ৪০টি পরিবারের উৎপাদন ২০ থেকে ৩০ মণ। ৩১থেকে ৫০ মণ উৎপাদনকারীর সংখ্যা ১৮০। অর্থাৎ পরিবার পিছু ৬০ মণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলে মালকানগিরির শতকরা ৮৫টি পরিবারে সেই সংস্থান ছিল না। মালকানগিরি সম্পর্কে পরে আরো কিছু বক্তব্য আছে—কিন্তু সেটা বর্তমান অথবা প্রাক বর্তমান সময়ের কথা।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১২ এপ্রিল, ১৯৭৮)

দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু (২)

কেন পুনর্বাসন হতে পারল না?

শৈবাল কুমার গুপ্ত

(৫) কৃষি ভিন্ন পুনর্বাসনের অন্য ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্রশিল্প বা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ অথবা দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিচালিত কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দিনমজুরী বা বেতনভূক কাজ। বোরগাও, জগদলপুর (ধরমপুরা),

উমরকোট,আম্বাগুদা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের নিজস্ব ছোট বড় কয়েকটি যন্ত্রচালিত কারখানা ছিল। কিন্তু তাদের উৎপাদন যৎসামান্য ও বরাবর ক্ষতির অঙ্কটা বেড়ে যাচ্ছিল বলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাতে যে সব উদ্বাস্তু কাজ পেয়েছিল তাদের সংখ্যা যৎসামান্য এবং তাদের মজুরিও আইনে বেঁধে দেওয়া রেটেরও কম। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, শধু এইটুকু বলা দরকার যে, বছরের পর বছর ক্ষতি স্বীকার করে এই যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি চালান হচ্ছিল, সেখানে কাজ নেওয়াকে আর যাই বলা হোক পুনর্বাসন বলা চলে না। যেদিন দণ্ডকারণ্য প্রকল্প গুটিয়ে ফেলা হবে অথবা তারও আগে যেদিন ক্ষতির পরিমাণে ভয় পেয়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুটিয়ে ফেলবেন, সেদিন এরাও বেকার হয়ে পড়বে।

আর যেভাবে পুনর্বাসন হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল, দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তার ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। সে হল দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মধ্যেই যে সব চাকুরী আছে বা খালি হয় বা নতুন সৃষ্টি হয়, তাতে উদ্বাস্তুদের বা তাদের পরিবারভুক্ত লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের পূর্ত কার্যগুলি ঠিকাদাদের হাতে না দিয়ে একটা রেট অনুসারে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বন্টন করা। শেষের পদ্ধতি, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, ততদিন চলেছিল। তিনি চলে আসবার পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্পের চাকুরিতে অগ্রাধিকার কোনকালেই মানা হয়নি এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আসতে হবে এই ছুতো দেখিয়ে তাদের চেষ্টা করে বাদ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোন কর্মখালি বা নতুন নিয়োগের সম্ভাবনা থাকলে ভিতরের খবর যারা জানেন, সেই সব অফিসার সুদূর প্রত্যন্তপ্রদেশ থেকে

নিজেদের কোন আত্মীয়কে আনিয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অফিসার নাম লিখিয়ে রাখেন এবং কলকাঠি এমন করে নাড়েন যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসার তারই নাম সুপারিশ করে পাঠান। সুদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেরা না করতে পারে নাম রেজিষ্ট্রি, না পারে জানতে কখন কোথায় নতুন নিয়োগ হবে।

গোড়া থেকেই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। তার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিমাতৃসুলভ মনোভাব এবং সহানুভূতির অভাব। অফিসারদের মধ্যে অনেকেই এটাকে অন্য সাধারণ কাজের মতই গ্রহণ করেছেন, মানবিকতাবোধ থেকে করেননি। অনেক অফিসার নিজেদের প্রাদেশিক সরকারে অবাঞ্ছিত হয়ে এইখানে আশ্রয় পেয়েছিল, সুতরাং টিঁকে থাকবার তাগিদে তাদের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। দরদ যে কোথাও ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা বেশীর ভাগ নীচের ধাপে, উপরতলায় নয়। উদ্বাস্তু বাঙালীর ভাষা ও ধাত বোঝে এমন বেশী বাঙালী অফিসার দণ্ডকারণ্যে নির্বাসনে যেতে চাননি। প্রায় সর্বোচ্চস্তরে যে দুটি বাঙালী অফিসার সেখানে গিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সাহস দেখিয়েছিলেন সেই নির্মল সেনগুপ্ত ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হল এবং বশংবদ অন্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। সবচেয়ে মর্মান্তিক হল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তিরোভাব এবং সুকুমার সেনের অকালমৃত্যু। ডাঃ রায় যদি বেঁচে থাকতেন, তবে মেহেরচাঁদ খান্না, সুকুমার সেনকে ঠুঁটো জগন্নাথ করবার সাহস পেতেন না এবং পদে পদে তার প্রস্তাবগুলি উপেক্ষা করতে পারতেন না। সুকুমার সেন বা আমি যদি ডাঃ রায়কে বোঝাতে পারতাম কোথায় গলদ এবং কী তার প্রতিকার তবে তার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের কাছে শ্রীখান্না কি ত্যাগী মাথা তুলতে পারতেন না। দুঃখের বিষয় তাঁর স্থলাভিষিক্ত যারা হলেন, তাদের প্রথম ও প্রধান চিন্তা হল কী করে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব এড়ান যায়। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের একবার ঘাড় থেকে নামিয়ে তারা সেদিকে নাক গলাতে চাইলেন না, মানবিকতা বোধের জন্যও না। আর উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক সচিব বা মুখ্য-সচিবের কথা না বলাই ভাল—তাঁরা দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে এতখানি নিস্পৃহ হয়ে উঠলেন যে, ত্রৈমাসিক মিটিংগুলিতে যোগদান করতে অনাবশ্যক মনে করে হাত গুটিয়ে রইলেন।

(৬) ১৯৬৪ সালে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আমি পদত্যাগ করে দন্ডকারণ্য থেকে চলে আসি এবং তারপর থেকে দন্ডাকারণ্য প্রকল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বর্তমান পরিস্থিতি ও তার কারণ সম্বন্ধে নীচে যা লিখেছি সেটা কতক সরকারী নথিপত্র ও রিপোর্টের নকলের উপর ভিত্তি করে লেখা, যার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সেগুলি বেশীর ভাগই মুখ্যপ্রশাসকের নোট যা তিনি বিভিন্ন সময়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক অধিবেশনের সময়

পেশ করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চান তবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি তারা অভিজ্ঞ, দরদী ও সত্যসন্ধিৎসু কোন অফিসার পাঠিয়ে আসল ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করেন।

দলে দলে গ্রাম বা শিবির ছেড়ে এই যে উদ্বাস্তুদের পলায়ন—এটা কিছু নতুন নয়। প্রতি বৎসরই এরকম হয়, কখনো কম, কখনো বেশী। ষষ্ঠ প্ল্যানিং কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত ৪২,২১৩টি উদ্বাস্তু পরিবার দণ্ডকারণ্য এসেছিল এবং তার মধ্যে ৩০১৫৯ টিকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক ত্রিশ হাজার পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮৮৩৬ টি পরিবার পলাতক এবং যে প্রায় বারো হাজার পরিবার শিবিরে পুনর্বাসনের প্রত্যাশায় দিন গুণছিল, তাদের মধ্যেও ৭৩৭৫ টি পরিবার শিবির ছেড়ে চলে গেছে। আগে আগে কোথা থেকে গেছে এবং কখন গেছে, তার একটা গাণিতিক হিসাব নীচে দিচ্ছি, যা থেকে বোঝা যাবে কেন এই প্রবণতা।

১৯৬৫ সনের শেষ তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা ১৪০০ যার মধ্যে শিবিরত্যাগী ১৬৩ জন, উমরকোট থেকে পলাতক ২৫৬ জন এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক ৯৫৭। কোণ্ডাগাঁও এবং পারলকোট থেকে পলাতকের সংখ্যা নগণ্য।

১৯৬৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পলাতকের সংখ্যা ২১৭০, যার মধ্যে শিবিরবাসী ২৩৩, উমরকোট থেকে পলাতক ৩৮৪ এবং মালকানগিরি থেকে পলাতক ১৪৮২ এ সময়েও কোণ্ডাগাঁও ও পারলকোটের পলাতকের সংখ্যা নগণ্য।

১৯৬৭-র প্রথম তিন মাসে পলাতকের সংখ্যা বেশী নয়-মোটে ৩৭৩। শিবির থেকে কেউ পালায়নি, কিন্তু উমরকোট থেকে পালিয়েছে ১২৩ এবং মালকানগিরি থেকে পালিয়েছে, ১৮৯টি পরিবার। এবারেও কোণ্ডাগাঁও ও পারলকোটের রেকর্ড ভাল।

অর্থাৎ ওড়িশার অন্তর্গত যে দুইটি অঞ্চলে বেশী পরিমাণে উদ্বাস্তু বসান হয়েছিল, পলায়নের হিড়িক সেখানেই বেশী আর মধ্যপ্রদেশের দুটি অঞ্চল থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি খুব স্তিমিত। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার।

এর পেছনে যে রাজনৈতিক দলবাজী আছে বা গ্রামসেবকদের উস্কানী আছে, সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকল্পের কোন একজন অফিসার নাকি বলেছেন, উদ্বাস্তুরা শ্রম-বিমুখ তাই পালায়। একথাও যে অবিশ্বাস্য তা মুখ্য-প্রশাসকের বিভিন্ন সময়ের উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। ১৯৬৬ সনের ১৫ আগষ্টের নোটে তিনি স্বীকার করেছেন ঃ "The settlers are putting in excellent efflorts in all zones".

এবং যে বোরগাঁও ও যুগানী অঞ্চলে ধানচাষ বিফল হয়েছে, সেখানে দো-আঁশলা ভুট্টা বুনে প্রচুর ফসল ফলিয়েছে। তার আগের বছরগুলিতে অজন্মার দরুন

যখন ফসল ফলল না বললেই চলে, তখনো উদ্বাস্তুরা যে যেখানে পারে শ্রমের কাজ জুটিয়ে নিয়াছে এবং প্রকল্পের পাথরভাঙ্গা, মাটিকাটা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজে ৫০০০ থেকে ৮০০০ উদ্বাস্তু হাড়ভাঙ্গা খাটনি খেটেছে, যার বাজার মূল্য অন্তত কুড়ি লক্ষ টাকা (২০-১-৬৬ তারিখের নোট)।

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৩ এপ্রিল ১৯৭৮)

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু (৩)

তাহলে এখন করণীয় কী?

শৈবাল কুমার গুপ্ত

তাহলে কেন এই গৃহত্যাগ? উত্তর অতি সোজা এবং মুখ্য প্রশাসকের বিভিন্ন সময়ের নোট থেকেই তা প্রমাণিত হয়। পলায়নের কারণ অজন্মা, খাদ্যাভাব, অর্থাভাবে ও অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা; নিদেনপক্ষে দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার ইচ্ছা।

বিভিন্ন উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রামে এবং অনুর্বর জমিতে উৎপন্ন ফসল যে কী রকম অপ্রচুর এবং অভাব কী রকম নিদারুণ তা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে একটি গ্রামের বধূ আমাকে বলেছিল "খিদে কাকে বলে, ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় ছটফট করলে কী রকম লাগে, তা আপনারা জানেন না, আমরা জানি"। ১৯৬৫ সনের একটি মেডিক্যাল রিপোর্ট উল্লেখ করে মুখ্য-প্রশাসক লিখছেন যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ পুরুষের ওজন যেখানে ১৩১ পাউণ্ড, একজন উদ্বাস্তু পুরুষের ওজন সেখানে মাত্র ৮৩ পাউণ্ড। সাধারণ মেয়েদের বেলায় ওজন যেখানে ১২০ পাউণ্ড, উদ্বাস্তু মহিলার ওজন সেখানে ৭৪ পাউণ্ড। ১৯৬৬ সনের জুন মাসে অন্নাভাব সত্ত্বেও আগে গোলমাল হয়নি, বিক্ষোভ হল তখন, যখন শোনা গেল যে জগদলপুরে অনাহারে একটি মৃত্যু ঘটেছে।

দণ্ডকাণ্যের উদ্বাস্তুদের কৃষি জমির উপর আগে থেকেই শনির দৃষ্টি ছিল এবং কর্তৃপক্ষ উন্নয়ণের জন্য যা করেছেন তা অপ্রচুর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত ফলপ্রসূ। বর্ষানির্ভর জমিতে ধান ফলে না; চাই তার জন্য সেচের জল এবং জমির অম্লতা নিবারণের জন্য রাসায়নিক সার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি সুকুমার সেনের চেষ্টায় সমস্ত এলাকা সার্ভে করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে তারা স্পষ্ট চেয়েছিলেন বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা না ফেঁদে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত প্রত্যেকটি বিভিন্ন গ্রামে ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনার প্রবর্তন। তাতে সেচের সমস্ত জলটাই উদ্বাস্তু গ্রাম পাবে এবং সময় ও অর্থ দুই-ই সংক্ষেপিত হবে। কিন্তু দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ঝোঁক Grandiose Scheme-এর দিকে। তবে যিনি সেচ বিশেষজ্ঞ তার অভিজ্ঞতা বড় বড় বাঁধ তৈরী করানো, সুতরাং ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা বানচাল হল। বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার কথা

ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়, কিন্তু ভাস্‌কল বাঁধের বেলায় দেখা গেছে যে, তার ষোলআনা সুবিধাই গেছে স্থানীয় অধিবাসীদের অনুকূলে।

সুকুমার সেনের সময় থেকে ঠিক ছিল যে, প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবার ৭ একর জমি পাবে, সাড়ে ৬ একর চাষের জমি ও আধ একর ঘড়বাড়ি তৈরি ও সব্জীবাগান করার জন্য। সেচের জল পেলে এই পরিমাণ জমিতে গ্রাসাচ্ছাদন ভালভাবেই চলতে পারে। কিন্তু আমি যখন চলে আসি, তখন শোনা গেল কর্তৃপক্ষ ভাবছেন ৭ একরকে কমিয়ে ৫ একরে দাঁড় করান যায় কিনা, কারণ তাহলে সমপরিমাণ জমিতে বেশী করে উদ্বাস্তু বসান যাবে। শেষে তাই হল। সর্বশেষ খবর এই যে, পাঁচ একরও বড় বেশী, ওটা কমানো দরকার। তা না হলে নবাগত উদ্বাস্তুদের জায়গা দেওয়া যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল যে, যে সব জায়গায় সেচের জল পাওয়া যাবে, সেখানে পরিবার পিছু তিন একরের বেশী জমি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়,' সুতরাং মালকানগিরিতে কবে পাঁচ-ছয় বৎসর পরে, পটেরু বাঁধের জল পাওয়া যাবে, সেটা অনুমান করে এখন থেকেই সেই ভবিষ্যৎ সেচখালের আওতায় পড়ে এমন সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট হল মাত্র তিন একর জমি এবং সেখানেই তাদের বসান হল।

অভাব এবং অজন্মা যে কীরকম নিদারুণ সেটা বার বার মুখ্য-প্রশাসকের নোটে প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রতিকারে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত হস্ত-সঙ্কোচনের নীতি শিথিল করে যে অপেক্ষাকৃত উদার হস্তে সাহায্য দেওয়া দরকার, সেটা করতে অনেকদিন তার সাহস হয় নি। ১৯৬৬-এর ২৬ জানুয়ারী তিনি স্বীকার করেছেন যে, খাদ্যপরিস্থিতি আশংকাজনক এবং সেটাই উদ্বাস্তু পলায়নের প্রধান কারণ। সাত মাস পরে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে বলা হল., যেহেতু দণ্ডক ত্যাগের পিছনে দুই-তৃতীয়াংশই হল ক্ষুধার তাড়না, সেহেতু মুখ্য-প্রশাসক চেষ্টা করেন, যাতে উদ্বাস্তুরা সেচের জল পায়। কোত্থেকে জল আসবে সে প্রশ্নের ধারকাছ দিয়েও তারা গেলেন না। তখন পর্যন্ত পটেরু সেচ পরিকল্পনা ভবিষ্যতের গর্ভে এবং শক্তিগুদা ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনা সবে শুরু হয়েছে।

দশ বছর পরেও অবস্থা যথাপূর্বং। ১৯৭৭-এর ১৯ আগষ্ট মুখ্য-প্রশাসক লিখছেন ১৯৭৬ সনে অনাবৃষ্টিতে মালকানগিরি অঞ্চলের দুর্দশার সীমা ছিল না। কাগজে কলমে ৩৩৮৩৮ একর জমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য দেওয়ার কথা থাকলেও অনাবৃষ্টির দরুন এর সিকি ভাগে আদৌ চাষ হয়নি এবং বাদবাকী যেটুকু চাষ হয়েছে, সেটা প্রায় না হওয়ারই সামিল। যেখানে ১৯৭৫ সনে একর পিছু ৫.১৮ কুইন্টাল ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে ১৯৭৬ সনে পাওয়া গেল মাত্র ১.৯৫ কুইন্টাল। অন্যান্য আয়ও এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে যে একটি পরিবারের বার্ষিক আয় ২৫৩৫ টাকা থেকে কমে হয়েছে ১৪৪১ টাকা। এদিকে দ্রব্যমূল্য উর্ধমখী বিশেষ করে চাল ও গমের দাম।

আর পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ তাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি হবে। দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত মালকানগিরির বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে অনাবৃষ্টি ও অজন্মা প্রায় নিত্যসাথী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, উদ্বাস্তুদের দলে দলে গ্রাম ও শিবির ত্যাগের সেইটেই হচ্ছে আসল কারণ। কিন্তু আরও একটা কথা বলার দরকার, কারণ 'গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার' মত এখানে রাজনীতি এসে মাথা গলিয়েছে।

উদ্বাস্তুদের মালকানগিরি ত্যাগের আর একটা কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রকাশ্যে-ঘোষিত আপত্তি এবং জোর করে জমি বেদখল। উমরকোটের ভাস্‌কল বাঁধের কথা আগেই বলেছি, আর পুনরাবৃত্তি করব না। মালকানগিরিতে উড়িষ্যা সরকার তার চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠেছেন। ক্ষুদ্র শক্তিগুদা বাঁধ দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে থাকুক, বৃহত্তর পটেরু সেচ পরিকল্পনা রূপায়ণ পুরোপুরিভাবে উড়িষ্যা সরকারের হাতে থাকবে এবং তার ৩০ কি ৪০ কোটি টাকার ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করবেন দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ।

বংশবদ দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজি হলেন। শুধু বললেন, সেচলব্ধ উপকারের ছিটেফোঁটা যেন তাদের ভাগ্যে জোটে এবং হাজার চল্লিশেক একর জমি উদ্বাস্তুদের জন্য দেওয়া হয়। উড়িষ্যা সরকার বললেন, "তথাস্তু", কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল তার বিপরীত। ৪০,০০০ একরের প্রথম কিস্তি জমির দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল যে, আগে থেকেই আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীরা লাঙ্গলের দাগ কেটে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলে গেছে। সত্য-মিথ্যা জানি না, উড়িষ্যার প্রথম সারির একজন লোকবিশ্রুত নেতা ১৯৭৪ সনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, কোরাপুট কুরুক্ষেত্র হবে যদি এখানে মানা শিবির থেকে কোন উদ্বাস্তু পাঠান হয়। মানা থেকে আসতে গররাজি উদ্বাস্তুদের ইমারজেন্সীর সুযোগে রাতের অন্ধকারে মালমানগিরিতে এনে ফেলা হল, কিন্তু তারা জমি পেলেন না, মাথা গুজবার সাহায্য যেটুকু পেলেন, সেটা নামমাত্র। ১৯৭৭ সনের অক্টোবর মাসে উড়িষ্যার রাজস্বমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমান সমান বন্টন না করলে মালকানগিরি অঞ্চলে আর কোন উদ্বাস্তুকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীও নাকি কেন্দ্রের কাছে এই সুপারিশ করেছেন। যে সব জমিতে লাঙ্গলের দাগ কেটে স্থানীয় লোকেরা উদ্বাস্তুর জমির উপর অনধিকার প্রবেশ করেছিল, সে সম্বন্ধে উড়িষ্যার চীফ সেক্রেটারী যদিও বলেছেন, তাদের তুলে দেওয়া হবে, তার সহকর্মী রিলিফ সেক্রেটারী বলেছেন, 'তা কী করে হয়? সাধারণ জবরদখলকারীদের না হয় তুলে দিলাম, কিন্তু আদিবাসীদের গায়ে হাত দি কি করে?

১৯৭৪ সালে কোরাপুটের জনসভায় বিষোদগারের পর এবং ১৯৭৭ সনের মন্ত্রীদের উক্তির পর উদ্বাস্তুরা যদি মালকানগিরিতে না যায় বা যারা গেছে তারা ফিরে আসে, তবে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি?

(৭) তাহলে করণীয় কি? দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? না যদি থাকে, তবে যারা ফিরে এসেছে এবং যারা ভবিষ্যতে ফিরে আসতে পারে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা কী?

এর পরিষ্কার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া শক্ত, কিন্তু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুপুনর্বাসনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কয়েকটা কথা মনে হয়।

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের গোড়াতেই যে গলদ ছিল সেটা এখন স্বীকার করা উচিত। অহল্যাকে হলকর্ষণোপযুক্ত না করে এবং আর কৃষিজমি না বাড়িয়ে দেখা উচিত মানা, কাঁকেব, জগদ্দলপুর, নারায়ণপুর, বাজোর মাইন্স প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিল্পনগরী গড়ে তুলে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিয়ে সেই সব শিল্পে নিয়োগ করা যায় কিনা। কিছু কিছু শিল্পের কাঁচা মাল দণ্ডকারণ্যেই পাওয়া যাবে, বাকীটা আনতে হবে — কিন্তু এখন যাতায়াতের সড়ক ও রেলপথ তৈরি হওয়াতে অবস্থা আগের মত সঙ্গীন হবে না। কিন্তু সেই শিল্পে উদ্বাস্তুরা হবে শ্রমিক বা বেতনভুক কর্মচারী — নিজেরা ইনডাষ্ট্রী শুরু করবে এ মুরদ তাদের নেই, হবেও না। কারণ শিল্পে নৈপুণ্য আর শিল্পোদ্যোগের দক্ষতা আলাদা জিনিস। উড়িষ্যার কোন স্থানেই যে উদ্বাস্তুরা টিকে থাকতে পারবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না — কুড়ি বছর পরেও নানা রকম টালবাহানা করে তারা জমিতে পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুদের পাট্টা দেয়নি, যদিও ১৯৬৪ সনে পাট্টা দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় স্থির, শুধু সই করার অপেক্ষা। হিন্দী এবং উড়িষ্যায় ভাষার উগ্র প্রচারে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন ক্রমশ লোপ পেতে পারে, এই আশঙ্কা অমূলক নয়। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে যত লোক নিয়োগ হবে, তার একটা বৃহৎ অংশ উদ্বাস্তুদের জন্য নির্ধারিত থাকা দরকার। কাগজে দেখলাম চীফ সেক্রেটারি দণ্ডকারণ্যের মুখ্য-প্রশাসকের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন, প্রত্যাগত উদ্বাস্তু পরিবারের একজনকে ঐ প্রকল্পে চাকুরি দেওয়া হবে। এই সুবুদ্ধি আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু যারা ফিরে আসবে না, তাদের গতি কি? জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে কি তাদের জায়গা হবে? না হলে তারা কোথায় যাবে? বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ থেকে খানিকটা অংশ আপোষে কেটে নিয়ে যারা একটা স্বতন্ত্র স্বপ্ন দেখেন ধারণায়, সেটা অবাস্তব কল্পনা। জায়গা আছে কি? হয়ত নেই, কিন্তু জনাব সিকান্দর বকতের কি এক্তিয়ার আছে বলবার যে, তিনি একটি উদ্বাস্তুকেও আন্দামানে যেতে দেবেন না। আন্দামান কি তার পৈত্রিক সম্পত্তি? উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া? সেই সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাসা করা চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন আইনের বলে ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের জোর করে ট্রেনে তুলে পাঠান? তারা যদি বেআইনী কাজ করে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে, পরের জমিতে বা সরকারী জায়গায় আস্তানা গড়ে, তবে তারা দণ্ডার্হ। কিন্তু তা যদি না করে তবে অন্য সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের মত তাদেরও কি অধিকার নেই যেখানে খুসী যাবার, যেখানে খুসী থাকবার?

(আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৮)

শ্রীশৈবাল কুমার গুপ্ত, আই.সি.এস. (অবসরপ্রাপ্ত), কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং দন্ডারণ্য উন্নয়ন অথরিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।